বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জীবিত সমালোচক,

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়কে

এই বইখানি উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সুরু হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ৪০।৪৫ বছর তার প্রত্যূষপর্ব। তার পরে দেখা দিয়েছে তার ভাস্বর দ্বিপ্রহর। এই দ্বিপ্রহর-পর্বের আদিতে রয়েছেন বিদ্যাসাগর-তারাশঙ্কর (তর্করত্ন) আর অন্তে রয়েছেন বনফুল-তারাশঙ্কর (বন্দ্যোপাধ্যায়)। এঁদের মাঝখানে আছেন রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য দিক্‌পাল সাহিত্যরথিবৃন্দ। এই পর্বটি প্রায় একশো বছর—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এর পরে আমাদের সাহিত্যের উপর অপরাহ্ণের ম্লানিমা সঞ্চারিত হতে সুরু করেছে বলে আমার মনে হয়। অবশ্য আমার এই ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে আমি সুখীই হব।

এই বইটির উদ্দেশ্য অল্প পরিসরের ভিতরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই দীর্ঘদীপ্ত দ্বিপ্রহর-পর্বের কিছু পরিচয় দেওয়া। এর মধ্যে এই পর্বের প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখকদের সমালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এতে এই সব লেখকদের মধ্যে সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদেরও সম্বন্ধে সব কথা বলা সম্ভব হয়নি। এঁদের বিশেষ বিশেষ রচনারই বিচার করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই রচনাগুলির একটি বিশেষ দিকেরই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও লেখা সম্বন্ধে এই বইয়ের ভবিষ্যৎ সংস্করণে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। যাঁর প্রতিভা এই পর্বকে সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ করেছে, সেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ এই বইয়ে নেই; তার কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার লেখা সব কটি প্রবন্ধই ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ' (১৯৬০) বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এই বইয়ে আমি বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক (objective and analytical) সমালোচনা-পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় যথেষ্ট বিপদ আছে। এই পদ্ধতিতে যে আলোচনা করা হয়, তার মধ্যে উচ্ছ্বাস, কল্পনা ও ভাবাবেগের কোন স্থান হয় না বলে একমাত্র বিদগ্ধ সাহিত্যরসিকগোষ্ঠী

ভিন্ন অন্যদের কাছে তার সমাদর পাবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না। আবার, নতুন কথা না বলতে পারলে বিদগ্ধ সাহিত্যরসিকগোষ্ঠীর সমাদরও পাওয়া যাবে না। শুধু এ'ই নয়, বিপদ অন্য দিক দিয়েও আছে। আজকের দিনে এই ধরনের সমালোচনার পাংক্তেয় হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। এ সম্বন্ধে একটু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করছি।

দীর্ঘকাল ধরে আমি বাংলা সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে নিযুক্ত আছি। এতদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটা কথা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এখন আমাদের সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা-রীতির নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছে। কারণ এদেশের সাহিত্য-সমালোচকদের অধিকাংশই বর্তমানে অন্য ধরনের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

এঁদের মধ্যে অনেকে নির্বিশেষ সাহিত্য-সমালোচনায়—অর্থাৎ কোন বিশেষ লেখক বা লেখা সম্বন্ধে নয়, সাহিত্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্রতী। এই জাতীয় সমালোচনার উপযোগিতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের সাহিত্যে এই শ্রেণীর আলোচনার প্রবর্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র; তারপর রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে এই ধারা পূর্ণপরিণত রূপ লাভ করে: এর পরে মোহিতলাল মজুমদার এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত এই ধারাকে সার্থকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। এই জাতীয় সমালোচনার মধ্যে এঁরা সত্যকার মননশীলতা, রসগ্রাহিতা এবং বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনভিজ্ঞ লোকদের হাতে পড়ে এই ধারাটি একটি বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। এঁরা সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বসে রাশি রাশি অস্পষ্ট ও অসার্থক বাক্যের বিস্তার ছাড়া আর কিছুই করেন বলে মনে হয় না। এই জাতীয় ধোঁয়াটে ও অসংলগ্ন আলোচনা নিত্যই অজস্র পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে; এবং তার ফলে লেখক-দের আত্মপ্রসাদ লাভ ছাড়া আর কারও কোন উপকার হচ্ছে বলে মনে হয় না। সাধারণ পাঠকেরা এই জাতীয় লেখাগুলি পড়ে, পড়ে কিছুই বোঝে না, কিন্তু না বুঝেও প্রশংসা করে, কারণ প্রশংসা না করলে তাদের "ইনটালেকচুয়াল" বলে গণ্য না হবার আশঙ্কা আছে।

আর এক শ্রেণীর সাহিত্য সমালোচক আছেন, যাঁরা বিশেষ বিশেষ লেখক ও লেখা সম্বন্ধেই আলোচনা করেন, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণের পথে তাঁরা পা বাড়ান না। তার বদলে তাঁরা নিজেদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকেই ফলাও

করে বর্ণনা করেন এবং সে বর্ণনাও আবার আত্মগত কল্পনা, আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসের রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। এই জাতীয় সমালোচনার বিশেষ কোন মূল্য নেই। ভালো ভাষায় লেখা হলে এগুলি পাঠকের মনে একটা মাদকতার আবেশ সৃষ্টি করে, এবং তার ফলেই পাঠকরা এদের আদর্শ সমালোচনা মনে করে বিভ্রান্ত হয়।

আরও এক রকমের সাহিত্য-সমালোচনা এখন এদেশে প্রাধান্য লাভ করেছে; তাকে বলা যায় 'পল্লবগ্রাহী সমালোচনা'। এই জাতীয় সমালোচনা প্রধানত সৌখীন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কলম থেকে বেরোয়। সমালোচনা-পদ্ধতি যে সাধনা দ্বারা আয়ত্ত করতে হয় এবং তার জন্য যে দেশবিদেশের সাহিত্য ও সমালোচনা-শাস্ত্র সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা চাই, সে কথা এই জাতীয় সমালোচকেরা স্বীকার করেন না। কোনরকম অধ্যয়ন অনুশীলন ছাড়াই এঁরা মনের সাধে যা খুশী লিখে যান, তার মধ্যে তীক্ষ্ণতা বা গভীরতা তো থাকেই না, কোন নতুন বক্তব্যও থাকে না। থাকে শুধু খানিকটা কথার ফুলঝুরি। এ যেন সাহিত্য নিয়ে রকবাজী করা। অথচ আমাদের দেশে এখন এই জাতীয় সমালোচকরাই দলে ভারি এবং এঁরাই প্রধান প্রধান সাময়িকপত্রগুলিকে হাত করে আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। সত্যকার সাহিত্য-সমালোচনাকে এঁরা "অ্যাকাডেমিক সমালোচনা" বলে তাচ্ছিল্য করেন এবং নিজেরা যখন সমালোচনার বই লেখেন, তখন তার বিজ্ঞাপনে গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে এতে "অ্যাকাডেমিক সমালোচনা" করা হয় নি। কিন্তু সার্থক সমালোচনামাত্রই যে "অ্যাকাডেমিক" হবে, তার মধ্যে যে সমালোচকের বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচয় থাকবে, সে কথা বোঝবার মত বুদ্ধি এই নাবালকদের নেই। কিন্তু এঁদের সংখ্যাধিক্যের দরুণ এঁরা একটা জিনিস করতে পারছেন—বাঙালী পাঠকদের রুচি এবং সাহিত্যবোধকে এরা অনেক পরিমাণে বিকৃত করে দিচ্ছেন। সেইটেই এঁদের সম্বন্ধে প্রধান ভয়ের কথা।

কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার জাত যাঁরা সবচেয়ে বেশী নষ্ট করছেন, তাঁদের কথা এখনও বলা হয়নি। লজ্জার কথা এই যে, এঁরা আমাদেরই সহকর্মী, অর্থাৎ সাহিত্যের শিক্ষক। এঁরা বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী সমালোচনার বই লিখে থাকেন। এইসব বইয়ে কোন মৌলিকতা বা গভীরতা থাকে না, থাকে শুধু চর্বিতচর্বণ ও লঘুকরণ। আগেকার দিনে যখন এইসব

বই প্রকাশিত হত না, তখন আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা মূল পাঠ্য বইগুলি ও তাদের সার্থক সমালোচনাগুলি সযত্নে পড়ত। কিন্তু আজকাল রাশি রাশি সাহিত্যের "মেড ইজি" বার হচ্ছে, এমন কি বাংলার অনার্স ও এম. এ, পরীক্ষার জন্যও "সহায়ক" প্রকাশিত হচ্ছে। এইগুলি পড়লে সহজে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়া যায় বলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই এখন আর প্রকৃত সমালোচনাগুলি পড়ার কষ্ট স্বীকার করে না। এর ফলে তাদের সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যবোধ গড়ে উঠতে পারছে না। আমাদের দেশের যারা ভবিষ্যৎ, তাঁদের কী বিরাট ক্ষতি যে এইসব "মেড ইজি"-রচয়িতারা করছেন, তা বলবার নয়।

এই সব কারণের জন্য আমি এদেশে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত নৈরাশ্য বোধ করছি। এই ধারার মুষ্টিমেয় কয়েকজন সার্থক সমালোচক এখনও এদেশে রয়েছেন। এই বইয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছি। এঁরা চলে গেলেই এই ধারাটি লোপ পাবে বলে আশঙ্কা হয়। প্রার্থনা করি আমার আশঙ্কা মিথ্যা হোক্।

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। অবশ্য এক জায়গায় এর গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সবশেষে যে প্রবন্ধটি আছে (বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা: 'বাসুদেবচরিত') সেটি কালানুক্রমের বিচারে বইয়ের প্রথমেই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধটি যখন লেখা হয়, তখন বইয়ের অনেকখানি অংশ ছাপা হয়ে গেছে। তাই এটিকে বাধ্য হয়েই সবশেষে দিয়েছি। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধন করা হবে।

এই বইটির রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে আমি অনেকের কাছেই সাহায্য পেয়েছি। আমার তিনজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর অধ্যাপনার প্রভাব এই বইয়ের কোন কোন প্রবন্ধে পড়েছে। তেমনি পড়েছে স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদারের কোন কোন লেখার প্রভাব। এঁদের ঋণ চিরদিনই আমি অবনত-মস্তকে স্বীকার করব। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস এই বইটি প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন বলেই এটি এমন সুন্দরভাবে ছাপা হয়েছে। এ জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। আমার ছাত্র শ্রীমান গুরুসদয় ঘোষ এবং ছাত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত কোন

কোন প্রবন্ধের প্রেসকপি তৈরী করে দিয়েছেন। আমার আর একজন ছাত্রী শ্রীমতী রীতা ধরও আমায় কিছু সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক প্রীতি জানাচ্ছি।

এই বইয়ের নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল "বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর"। পৃষ্ঠাগুলির মাথায় এই নামই ছাপা হয়েছে। কিন্তু পরে সব দিক বিবেচনা করে বইটির নাম "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর" রাখা হল।

শান্তিনিকেতন,
২১ এপ্রিল, ১৯৬০

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন'

খেলাঘরে শিশুরা যে ঘর-সংসার বাঁধার খেলা করে, তাকে পরিণত জীবনের সাংসারিক অভিজ্ঞতার পূর্বসূচনা হিসাবে গ্রহণ করলে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের অক্ষম অপটু হাতের নাটক-রচনার প্রচেষ্টাগুলিকে বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম সূচনা বলে স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকে না। এই প্রথম স্তরের নাটকগুলি রচনার পিছনে কোন সত্যকার সাহিত্যিক বা শিল্পগত প্রেরণা ছিল না, কলাসৃষ্টির অন্তর্লক্ষণ বা বহির্লক্ষণের ভগ্নাংশও তাদেব মধ্যে ফুটে উঠতে পারেনি, পরবর্তীকালেব শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের উপর তাদের ক্ষীণতম প্রভাবেরও নিদর্শন মেলে না। এইজন্য শৈশবের খেলার মতই তাদের শুধুমাত্র স্মৃতির মল্য আছে, আর কোন মূল্য নেই।

এদের আবির্ভাবের ইতিহাসও অতি বিচিত্র। নাটক শুধুমাত্র পাঠ্য সাহিত্য নয, অভিনযের মধ্য দিয়ে তাকে রূপায়িত না করলে তার রস সর্বসাধারণের আস্বাদ্যমান করে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশে আগে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয়ের প্রথা ছিল না। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত গীতবহুল যাত্রার মধ্য দিয়েই আগে এদেশের লোকের নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ হত। কিন্তু বিদেশীদের দৃষ্টান্ত দেখে বাঙালীরা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াব দিকে রঙ্গমঞ্চের উপব সাজসজ্জা সহকারে নাট্যাভিনয করতে উৎসাহী হযে উঠল। অথচ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী বাংলা নাটক তখন একটিও ছিল না। সেইজন্য কয়েকজন ·· ধক মঞ্চাভিনয়ের আঙ্গিক অনুসরণ করে অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি বাংলা নাটক রচনা করলেন। এইসব লেখকরা সৃষ্টির প্রেরণায় নাটক রচনায় ব্রতী হন নি, হলে তাঁদের নাটক-গুলি আন্তর-সম্পদে এতখানি রিক্ত হত না এবং পরবর্তী নাট্যধারার উপর প্রভাব বিস্তার করতেও তারা অক্ষম হত না। রঙ্গমঞ্চে তাঁদের নাটক অভিনীত হবে, এই আশাই এইসব নাট্যকারকে নাটক লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তার ফলে এই নাটকগুলি সৃষ্টি হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হয়েছে এবং বর্তমান যুগের সাহিত্যরসিকদের কাছে তাদের আর কোন আকর্ষণই নেই। আজ তাদের নামটুকু মাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন রকমে বেঁচে আছে।

এই নাটকগুলির অন্যতম তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে

প্রথম প্রকাশিত)। প্রথম মুদ্রিত দুটি বাংলা নাটকের অন্যতম (অপরটির নাম 'কীর্তিবিলাস', এটিও ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়) বলে এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সেইজন্যে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই নাটকটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

এই নাটকের মুখবন্ধে তারাচরণ শীকদার লিখেছেন যে, তিনি ইউরোপীয় নাটকের আদর্শ অনুসরণ করে এই নাটকটি লিখেছেন ("এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইযাছে, এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয বিষয়ে ইওরোপীয নাটক প্রায হইযাছে,....এই গ্রন্থ ইওরোপীয নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিযা প্রকাশ করিলাম")।

কিন্তু আসলে 'ভদ্রার্জুনে'র উপর ইউরোপীয নাটকের* আদর্শের প্রভাব বিশেষ নেই। ইউরোপীয নাটকের সঙ্গে এর একমাত্র মিল যে, এই নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অঙ্ক আবার কযেকটি দৃশ্যে বিভক্ত। তারাচরণ দৃশ্যগুলিকে "দৃশ্য" বা "গর্ভাঙ্ক" না বলে "সংযোগস্থল" বলে কেন অভিহিত করেছেন, তার কারণ বোঝা যায না।

'ভদ্রার্জুনে'র মুখবন্ধে তারাচরণ এও লিখেছেন, "সংস্কৃত নাটক সম্মত কযেকজন নাট্যকারকের ক্রিযা গ্রহণ করি নাই, যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি।" কিন্তু সংস্কৃত নাটকের আদর্শের প্রভাব তিনি 'ভদ্রার্জুনে' সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার প্রমাণ, তিনি নাটকে নান্দী সন্নিবেশ না করলেও নাটকের উপক্রমে পযারছন্দে নাটকের কাহিনীর পূর্ব-ইতিহাসের "আভাস" দিযেছেন। 'ভদ্রার্জুনে' তিনি স্বতন্ত্রভাবে কোন বিদূষক-চরিত্র সৃষ্টি না করলেও একটি দৃশ্যে মাতাল, বাতুল এবং পথচারীদের অসংলগ্ন সংলাপ দিযে হাস্যরস সৃষ্টির প্রযাস পেযেছেন।

ঐ মুখবন্ধে নাট্যকার যাত্রাওযালাদের অপসৃষ্টি সম্বন্ধে তীব্র ভাষায কটূক্তি করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করে এবং সংলাপে পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করে তারাচরণ যাত্রার আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

* 'ভদ্রার্জুন'-এর মুখবন্ধের এক জাযগায তারাচরণ ইউরোপীয নাটক সম্বন্ধে বলেছেন, "ইওরোপীযদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রযোজন থাকে না।" এ কথার তাৎপর্য বোঝা গেল না। ইউরোপীযদের "স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রযোজন" না থাকলে তাদের 'গ্রীনরুম' থাকে কেন?

যাহোক্, এখন নাটকটির বিচার করা যাক্। প্রথমে কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। 'ভদ্রার্জুনে'র কাহিনীর উৎস কাশীরামদাসের মহাভারত। কাহিনীটি সকলের কাছে এতই পরিচিত যে, সাধারণভাবে এটি পাঠক বা দর্শকের কাছে নতুন কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। তবে এই কাহিনীর মধ্যে নাটকের উপাদান যে কিছু আছে, তাতে কোন সংশয় নেই। কুশলী নাট্যকার এই উপাদানগুলি সার্থকভাবে ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করতে পারেন। তারাচরণের রচনা কতদূর সার্থকতা লাভ করেছে, তা নীচের আলোচনা থেকে প্রমাণ হবে।

ঘটনা-সংস্থান নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নাটকের ঘটনা-প্রবাহ এমনভাবে বিন্যস্ত হওয়া চাই, যাতে পাঠক বা দর্শকের কৌতূহল আদ্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে; তার গতি শান্ত নিস্তরঙ্গ হলে চলবে না, পরস্পর বিপরীত-ধর্মী পরিস্থিতির ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তা ক্রমশ পাঠক ও দর্শকদের ঔৎসুক্য বর্ধিত করবে; উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে সেই ঔৎসুক্য একটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে আবার ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে শেষ পরিণতির মধ্যে পর্যবসিত হবে। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে যেভাবে ঘটনা-সমাবেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে নাটকের এই বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদী সহবাস সম্বন্ধে সর্তে আবদ্ধ হওয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্জুনের সেই সর্ত ভঙ্গ ও বনবাসে গমন, তারপর দ্বারকায় উপনীত হওয়া প্রভৃতি ঘটনা পরপর নিতান্ত সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কিছু অভিনব জটিল পরিস্থিতিও সৃষ্টি করা হয়নি, যাতে পাঠক বা দর্শকের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়। অবশ্য দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়া এবং অকস্মাৎ সুভদ্রার মনে অর্জুনের প্রতি প্রণয় সঞ্চার হওয়াতে নাটকে কৌতূহলজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তার ঠিক পরেই আকস্মিকভাবে কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার গান্ধর্ব বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের সমস্ত আগ্রহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এর পরে কাহিনীর পরিণতি কী হবে, সে সম্বন্ধে কারও আর কোন সংশয় থাকে না, এমন কি সুভদ্রাকে অর্জুন কীভাবে স্নানের সময়ে কুলরমণীদের মধ্য থেকে হরণ করে নিয়ে যাবেন, তাও নাট্যকার আগে থেকে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে কোন দিক দিয়েই আমাদের আর কোন কৌতূহল অবশিষ্ট থাকে না। এই নাটকের গৌণ

ঘটনাগুলির বিন্যাসেও অনুরূপ ক্রটি লক্ষিত হয়। ভীম তার চিরশত্রু দুর্যোধনের বিবাহে বরযাত্রী হয়ে এসেছে, এই বিষয়টি নিয়ে এই নাটকে একটি চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার সুযোগ ছিল। কিন্তু নাট্যকার সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন নি। ভীম অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার পরিণয়ের কথা জেনে রঙ্গ দেখতে এই বরযাত্রায় যোগদান করছে, তা জানবাব পর আমাদের আর এ সম্বন্ধে কোনই ঔৎসুক্য থাকে না। অ্যারিস্টটল নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নাটকে তিনটি বিষয়ের ঐক্য থাকা চাই—স্থানের ঐক্য, কালের ঐক্য এবং ক্রিয়ার ঐক্য। এর মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্যের নীতি বর্তমান যুগের নাট্যকাররা অনুসরণ করেন না। 'ভদ্রার্জুন' নাটকেও এই দুটি নীতি পালিত হয়নি। তবে এই নাটকের প্রথম অঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে বার বৎসরের ব্যবধান দেখা যায়। এতে আমাদের সঙ্গতিবোধ আহত হয়। ক্রিয়ার ঐক্য এখনও পর্যন্ত নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ বলে গণ্য হয়। 'ভদ্রার্জুনে' এই ঐক্য মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে, তবে এই নাটকের প্রথম অঙ্কে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মূল কাহিনীব বিশেষ কোন যোগ নেই; এইজন্যে তাকে নাটকে স্থান না দিলেই ভাল হত বলে মনে হয।

তারপরে আসে চরিত্র-চিত্রণের কথা। নাটকের চরিত্র হবে নানা বিভিন্ন-মুখী প্রবৃত্তির সমাবেশে জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সংক্ষোভে বিচিত্র বিভঙ্গময়। কিন্তু 'ভদ্রার্জুন' নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে এই দিক দিয়ে আমাদের নিরাশ হতে হয়। নায়ক অর্জুনের চরিত্রে কোন অভিনব বৈশিষ্ট্য নেই, সে যেন সদ্‌গুণরাশির সমষ্টি, কর্তব্যপালনের যন্ত্রমাত্র। সুভদ্রার সঙ্গে মিলনের সঙ্কটময় গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটিতেও তার অন্তরে ক্ষণেকের জন্য কোন আলোড়ন উপস্থিত হতে দেখা যায় না। সুভদ্রা কৃষ্ণের ভগ্নী জানবার পর তার মনে সংঘাতের একটি স্ফুলিঙ্গ চকিতের জন্য জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সত্যভামার আশ্বাসের ফুৎকারে তা তক্ষণি নিভে গেল। এই নাটকের নায়িকা সুভদ্রার চরিত্রেও বিশেষ কোন আকর্ষণীয় উপাদান নেই, ছাদ থেকে অর্জুনকে দেখে এক নিমিষে প্রেমে পড়া ও সত্যভামার কাছে নির্লজ্জভাবে মনোভাব প্রকাশ করার পরে তার চরিত্রের আর কোন বিকাশ হযনি। এর পরেও বিবাহ না হওয়ার আশঙ্কা এবং অর্জুনের প্রতি গভীর প্রেম, এই দুই অনুভূতির টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে সুভদ্রার চরিত্র সার্থকভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারত।

কিন্তু সত্যভামা সমস্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করায় এবং অবলীলাক্রমে সব সমস্যার সমাধান করায় নাটকে সুভদ্রার চরিত্র শেষ পর্যন্ত গৌণ ও অস্ফুটই রয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ খেদোক্তির মধ্য দিয়ে সুভদ্রার অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা আদৌ শিল্পোচিত হয়নি। এই নাটকে একমাত্র বলদেবের চরিত্রেই খানিকটা সজীবতা আছে; সকলের প্রতিকূল মতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার জন্য তার অদমনীয় প্রচেষ্টা আমাদের মনে রেখাপাত করে, পরিশেষে ব্যর্থমনোরথ হবার ফলে তার আশাভঙ্গও আমাদের মনকে স্পর্শ করে। কিন্তু এই চরিত্রটিকে নাটকে আরো পূর্ণাঙ্গ, জীবন্ত ও দ্বন্দ্বজটিল করে আঁকবার সুযোগ ছিল, নাট্যকার সে সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেননি। সত্যভামা ও ভীমের চরিত্রে মাত্র একটি দিকই ফুটেছে। পার্শ্ব-চরিত্র হিসাবে এদের অপূর্ণতা তেমন চোখে লাগে না। কিন্তু নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি অঙ্কনে নাট্যকারের চরম ব্যর্থতা আমাদের মনকে পীড়িত করে।

অতঃপর এই নাটকের সংলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংলাপ সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতগর্ভ হওয়া উচিত, তার মধ্যে সজীবতা ও গতিশীলতা থাকা চাই; নাটকের সংলাপ যথেষ্ট পরিমাণে বাগ-বৈদগ্ধ্যে ভূষিত না হলে তার আকর্ষণীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়। 'ভদ্রার্জুনে'র পাত্রপাত্রীদের সংলাপে সাহিত্যিক গুণ নেই বললেই চলে, উপরন্তু সংলাপগুলি দীর্ঘ হওয়ার ফলে নাটকের গতি মন্থর হয়েছে। তা ছাড়া আর একটি বস্তুও 'ভদ্রার্জুনে'র অপকর্ষের হেতু হয়েছে, তা হচ্ছে এর সংলাপে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার। কবিতা মানব-মনের সূক্ষ্ম ভাবাবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাহন; কিন্তু নাটকের সাধারণ কথাবার্তায় কবিতা ব্যবহৃত হ'লে তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভূমিকায় তারাচরণ লিখেছেন, "এদেশে....কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে"। এইজন্য তিনি নাটকের দু'একটি স্থান ভিন্ন কোথাও সঙ্গীত দেন নি; এইভাবে তিনি 'ভদ্রার্জুন'কে গানের প্রভাব থেকে মুক্ত করেছেন, কিন্তু কবিতার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারেন নি; পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। নাটকের সংলাপ-রচনায় পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ একেবারে অনুপযোগী, কারণ ঐ দুই ছন্দের গঠন দৃঢ়সংবদ্ধ নয় এবং তাদের মধ্যে প্রতি চরণের শেষে পাঠককে থামতে হয়।

যে সব ছন্দের গতি নদী-প্রবাহের মত অব্যাহত নয়, সেগুলি নাটকের সংলাপের বাহন হবার উপযুক্ত নয়।

'ভদ্রার্জুন' নাটকে তারাচরণ কয়েক জায়গায় হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। এর মধ্যে সুভদ্রার বিবাহ-সম্বন্ধ নিয়ে রোহিণী, দেবকী ও প্রতিবাসিনীর রসালাপ এবং বসুদেবের মত অভিজাত ব্যক্তির প্রতি সামান্য একজন দূতের শ্লেষোক্তির মধ্য দিয়ে যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আদৌ উচ্চাঙ্গের হয় নি। তবে দু' এক জায়গায় উপভোগ্য হাস্যরসের নিদর্শন মেলে। যেমন প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অর্জুন ও ধেনুহারা ব্রাহ্মণের সংলাপ :

"অর্জু ক্ষণেক বিলম্ব কর প্রভো।

ব্রাহ্ম। বিলম্ব করিলে দস্যুগণ পলায়ন করিবে, তখন গোধন কোথায় পাইব।

অর্জু। মহারাজ যুধিষ্ঠির গৃহমধ্যে আছেন।

ব্রাহ্ম। তাহাতে কি?

অর্জু। এ সময় সে স্থলে প্রবেশ করিতে পারিব না।

ব্রাহ্ম। সে স্থলে প্রবেশের প্রয়োজন কি। সে স্থানে আমার গো নাই এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও চোর নহেন।

ব্রাহ্মণের সবশেষ উক্তিটির মধ্য দিয়ে যে হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে, তার মাধুর্য উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু নাটকের অন্যত্র নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র একটি দৃশ্য নাটকের মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন, সেখানে তার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি; ঐ দৃশ্যে মাতাল, বাতুল ও নির্বোধ পথিকদের অসংলগ্ন উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে তিনি যে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, তা অত্যন্ত স্থূল। এই ধরনের হাস্যরস 'ভদ্রার্জুন' নাটকের আবহাওয়াকে নিতান্ত লঘু করে তুলেছে। এই দৃশ্যে যে দু'টি গান আছে, তাদেরও নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতি নেই।

'ভদ্রার্জুন' নাটকের সংলাপে শব্দালঙ্কারের বিশেষত যমকের উৎকট আধিক্যও বিরক্তিকর এবং নাটকের গতিকে তা অনেকখানি মন্দীভূত করেছে।

আলোচনা আর বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। 'ভদ্রার্জুন' বইখানির বিশদ বিচার করবার পরে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে, 'ভদ্রার্জুন' নাটক হিসাবে পূর্ণাঙ্গও নয়, সার্থকও নয়। এর রচয়িতা আগেকার যুগের যাত্রাগুলির বিস্তর নিন্দা করেছেন, কিন্তু 'ভদ্রার্জুন' সৃষ্টি হিসাবে সেগুলির তুলনায় উন্নত স্তরের নয়। আসলে 'ভদ্রার্জুন' যাত্রারই ঈষৎ-পরিবর্তিত সংস্করণ।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'

বহু শতাব্দী ধরে বাংলা কবিতা রচিত হয়ে এলেও বাংলা গদ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই আবির্ভূত হয়েছে। বাংলা গদ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে সাহিত্যের মণ্ডপে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। তার আগে ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে আমাদের ভাষায় কিছু কিছু গদ্য রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের পরিমাণ খুবই অল্প। এইসব বিক্ষিপ্ত গদ্যরচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তাদের মধ্যে সাহিত্যরসের বিন্দুবাষ্পও পাওয়া যায় না।

প্রকৃত বাংলা গদ্যের সূচনা-পর্ব দেখি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের রচনার মধ্যে; এদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাতে পড়ে বাংলা গদ্য অনেকখানি উন্নতি লাভ করল। তারপর রামমোহন। তাঁর গদ্য সরল ও সুবোধ্য; বাংলা গদ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রকেও রামমোহন অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু রামমোহনের গদ্য-রীতি কতকটা কৃত্রিম এবং তার মধ্যে সাহিত্যরসের নিদর্শন খুব বেশী পাওয়া যায় না। রামমোহনের পরে যে সব লেখক আবির্ভূত হলেন, তাঁরা বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি ও শ্রী অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন। নানা ধরনের রচনায় ব্যবহৃত হওয়ার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা গদ্য একটি নমনীয়তা লাভ করল। অবশ্য তার মধ্যে তখনও শিল্পগুণের স্ফূর্তি খুব বেশী দেখা যায়নি। শিল্পগুণসমৃদ্ধ বাংলা গদ্যের প্রথম রচয়িতা বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে বাংলা গদ্য অনুপম দীপ্তি ও লাবণ্যে মণ্ডিত হল। তাঁর গদ্যের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ খুব বেশী। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বিদ্যাসাগরের গদ্যকে দুর্বোধ্য বা আড়ষ্ট করে তোলে নি, তার বদলে তাকে একটি অপূর্ব আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য দান করেছে। খাঁটি বাংলা শব্দ ও অভারতীয় শব্দ বিদ্যাসাগর খুব বেশী ব্যবহার করেন নি। সহজাত শিল্পবোধ থাকার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃতশব্দবহুল গদ্যের মধ্যেও প্রসাদগুণ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন; তার মধ্যে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগও পাঠকের মনকে এতটুকু পীড়া দেয় না।

বিদ্যাসাগরের এই রচনারীতি অচিরেই বাংলা গদ্যের রাজসিংহাসন অধিকার করল। তার সাক্ষাৎ প্রমাণ মিলল অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী বহু শক্তিমান লেখকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। তারাশঙ্কর তর্করত্ন এ দেরই অন্যতম। গদ্য রীতির দিক দিয়ে তারাশঙ্কর বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ শিষ্য। আর এক দিক দিয়ে তারাশঙ্কর বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রধান প্রধান বইগুলি অনুবাদগ্রন্থ এবং অনুবাদের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রথম প্রবেশ করেন। আর তারাশঙ্কর তিনখানি মাত্র বই লিখেছিলেন—'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা,' 'কাদম্বরী' এবং 'রাসেলাস'. তার মধ্যে দু'টি অনুবাদগ্রন্থ। এদের ভিতরে 'কাদম্বরী' সম্বন্ধে আজ আমরা আলোচনা করব।

তারাশঙ্করের কাদম্বরী' সংস্কৃত সাহিত্যের অমর গদ্যকাব্য বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র* সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ। এই বইটি লিখেই তারাশঙ্কর বাংলা গদ্যের সার্থক স্রষ্টাদের মধ্যে আসন লাভ করেছেন। এই বইটির রচনারীতিকে পরবর্তীকালের বহু লেখক আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। 'কাদম্বরী'র ভাষার উপর বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু তার মধ্যে তারাশঙ্করের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেরও যথেষ্ট পরিচয় মেলে। 'কাদম্বরী'তে তারাশঙ্কর বিদ্যাসাগরের চয়ে বেশী সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃত অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। ফলে 'কাদম্বরী'র ভাষাকে বিদ্যাসাগরী ভাষার তুলনায়ও বেশী গুরুগম্ভীর বলে মনে হয়। কিন্তু তারাশঙ্করের ভাষার এই গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তার প্রসাদগুণ অসামান্য। তারাশঙ্করের ভাষায় উচ্চস্তরের শিল্পগুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনায় তারাশঙ্করের ভাষায় ছন্দোহিল্লোল কম। বিদ্যাসাগর প্রথম শ্রেণীর ছন্দশিল্পী ছিলেন, তিনি ধ্বনির আরোহ এবং অবরোহগুলিকে ধরতে পারতেন এবং তাঁর রচনায় তিনি ধ্বনিঝঙ্কার অনুসরণ করে উপযুক্ত স্থানে যতিচিহ্ন স্থাপন করে বাক্যাংশগুলিকে শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্ব অনুসারে সাজাতেন, তার ফলে তাদের ছন্দঃস্পন্দ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত। বাংলা ভাষায় গদ্যচ্ছন্দের আবিষ্কার তিনিই প্রথম করেছেন এবং তাঁরই হাতে পড়ে এই ছন্দ সুললিত ও সুমধুর হয়ে দেখা দিয়েছে। তারাশঙ্কর বাংলা গদ্যের

---

* বাণভট্ট কাদম্বরী'কে অসম্পূর্ণ রেখে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট বইটি সম্পূর্ণ করেন। তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ 'কাদম্বরী'রই অনুবাদ করেন।

অন্তর্নিহিত ছন্দকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলে মনে হয় না, তবে সহজাত শিল্পবোধ থাকার জন্য তিনি তাঁর ভাষাকে কোথাও ছন্দোভ্রষ্ট হতে দেন নি।

'কাদম্বরী'র ভাষার বিচার করতে হবে দু'দিক দিয়ে। প্রথমত, বাংলা গদ্যের গঠন-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষার মধ্যে কতখানি শক্তি ও অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়; দ্বিতীয়ত, অনুবাদের ভাষার আদর্শ তার মধ্যে কতখানি রক্ষিত হয়েছে।

প্রথম দিকটির বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, 'কাদম্বরী'র ভাষা শুধু গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর নয়, তার মধ্যে তারাশঙ্কর পূর্ববর্তী লেখকদের তুলনায় উন্নততর বাক্যগঠনকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এই দুই অংশের মধ্যে তিনি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। 'কাদম্বরী'র একটি অংশ উদ্ধৃত করে আমরা এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

"পথের দুই ধারে উন্নত পাদপসকল বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা দ্বারা গগন আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় যেন, বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল পান করিবার নিমিত্ত ডাকিতেছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন ও লতামণ্ডপ, মধ্যে মধ্যে মসৃণ ও উজ্জ্বল শিলা পতিত রহিয়াছে। নানাবিধ রমণীয় প্রদেশ ও বিচিত্র উপবন দেখিতে দেখিতে কতক দূর যাইয়া বারিশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণস্পর্শে (চন্দ্রাপীড) বিগতক্লম হইলেন।"

বাক্যগঠননৈপুণ্য ছাড়া এই ভাষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মত। এতে সংস্কৃত শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু সব শব্দগুলিই সুকুমার ও শ্রুতিমধুর। এর মধ্যে দু'টি মাত্র দীর্ঘ ও গুরুগম্ভীর সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়—'বারিশীকরসম্পৃক্ত' ও 'বিগতক্লম'। কিন্তু এদের প্রয়োগেও অনুচ্ছেদটির ধ্বনিবৈচিত্র্যই সাধিত হয়েছে, ভাবপ্রবাহ খণ্ডিত বা ক্লিষ্ট হয় নি। সুনির্বাচিত ও সুললিত শব্দরাজির ব্যবহার অনুচ্ছেদটিতে একটি অপূর্ব লাবণ্য সঞ্চার করেছে। এর মধ্যে তারাশঙ্কর অযথা বিশেষণ ব্যবহার করে বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি।

যাহোক্, তারাশঙ্করের বাক্যগঠনকুশলতাই বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির বাক্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে সবত্র লেখকের অভ্রান্ত পরিমিতিবোধের পরিচয় রয়েছে। রামমোহন রায় প্রভৃতি

আদিযুগের বাংলা গদ্যরচয়িতাদের ভাষা প্রায়ই ভারকেন্দ্রচ্যুতি-দোষে দুষ্ট, তার কারণ তাঁরা যে বাক্য নির্মাণ করতেন, তা কতখানি ভারবহনে সক্ষম, সে সম্বন্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু তারাশঙ্কর জানতেন একটি বাক্যের দৈর্ঘ্য কতখানি হওয়া উচিত এবং তা কতটুকু ভার বহন করতে পারে। তাই তাঁর বাক্যগঠন সার্থক হয়েছে এবং তার ফলে তার গদ্য সূক্ষ্ম শিল্পবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে তাঁর বাক্যগঠন যে নির্দোষ সে কথা বলা চলে না। তার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিও স্থানে স্থানে দেখা যায়। যেমন, 'কাদম্বরী'র বাক্যগুলিতে অনেক সময়ই দেখা যায় ক্রিয়াপদের কর্তা অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছে।

এখন অনুবাদগ্রন্থের আদর্শ ভাষা 'কাদম্বরী'র মধ্যে কতখানি পাওয়া যায়, তার বিচার করতে হবে। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সাহিত্যরসিকদের কাছে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর ভাষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ। এর সৌন্দর্য আমাদের মনোহরণ করে বটে, কিন্তু এই ভাষা গ্রন্থের কাহিনীর গতিকে যে অত্যন্ত মন্থর করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মধ্যে অজস্র দীর্ঘ যুক্তাক্ষরবহুল বাক্য, সমাসবহুল পদ, নানা গুরুগম্ভীর বিশেষণ ও অলঙ্কারের নিদর্শন মেলে। তারাশঙ্কর 'কাদম্বরী'র সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করেছেন। তার অনুবাদের মধ্যে তিনি একদিকে যেমন মূলগ্রন্থের ভাষার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন, অপর দিকে তেমনি কাহিনীর বর্ণনায় গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চার করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অনুবাদ-সাহিত্যের একটি দোষগুণমিশ্রিত বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে লেখকের স্বাধীন চিন্তা বা মৌলিক অনুভূতির পরিচয় থাকে না। এতে লেখক নিজের ভাব ও চিন্তার পরিবর্তে অপরের ভাব ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করেন বলে তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে একটা কৃত্রিমতা এসে যায়। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যশিল্পীও তাই অনুবাদের ভাষায় বক্তচলাচলের উষ্ণতা সঞ্চার করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হন না। এইটি অনুবাদ-সাহিত্যের একটি বড় ত্রুটি। কিন্তু এতে একটা সুবিধাও আছে। মৌলিক সাহিত্যে লেখকদের বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করার চেষ্টায় অনেক সময় ভাষা অমসৃণ, রচনারীতি জটিল এবং প্রকাশভঙ্গী দুর্বোধ্য হয়ে যায়। অনুবাদ-সাহিত্যে অনুবাদকের নতুন কোন বক্তব্য প্রকাশের দায়িত্ব নেই বলে তিনি ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর দিকে নিজের শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করতে পারেন।

তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'কে অনুবাদ-সাহিত্য হিসাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, তারাশঙ্কর বাণভট্টের সন্ধি-সমাস-বিশেষণ-অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষার রাজবেশ মোচন করে গ্রন্থের ভাববস্তুকে ন্যূনতম ভাষার আচ্ছাদন দিয়েছেন। মূল 'কাদম্বরী'র সঙ্গে তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র সূচনাংশের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। মূলে বাণভট্ট প্রতিটি প্রধান বিষয় ও ব্যক্তির উপমাজালমণ্ডিত বর্ণনা দিয়ে অত্যন্ত ধীর মন্থর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, কাহিনীর গতি ত্বরান্বিত করার দিকে তার কোন আগ্রহ দেখা যায় না। এই অংশে যে প্রতিহারীর উল্লেখ আছে, কেবলমাত্র তাকে ঘিরেই বাণভট্টের অকৃপণ কবিকল্পনা অজস্র বর্ণনার ইন্দ্রজাল রচনা করেছে কিন্তু তারাশঙ্কর সমস্ত ব্যাপারটি এইভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করেছেন,

"একদা প্রাতঃকালে আপন অমাত্য কুমারপালিত ও অন্যান্য রাজকুমারের সহিত (রাজা) সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! দক্ষিণাপথ হইতে এক চণ্ডালকন্যা আসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপক্ষী আছে। কহিল, মহারাজ সকল রত্নের আকর, এই নিমিত্ত এই পক্ষিরত্ন তদীয় পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দ্বারে দণ্ডায়মান আছে অনুমতি হইলে আসিয়া পাদপদ্ম দর্শন করে।'

এই অংশটিকে মূলের সঙ্গে মেলালে আমরা দেখতে পাই, মূলের যে সমস্ত শব্দ, বিশেষণ ও বাক্যাংশ বর্ণনার পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়, সেগুলি তারাশঙ্কর পরিত্যাগ করেছেন, অথচ বর্ণনা যাতে সৌন্দর্যহীন শুষ্ক কঙ্কালে পর্যবসিত না হয়, সেদিকে তিনি সযত্ন দৃষ্টি রেখেছেন। এই সুনিপুণ বর্জনকর্মের মধ্য দিয়েই তারাশঙ্করের শিল্পবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি তার অনুবাদের মধ্যে সর্বত্র কেন্দ্রীয় ভাবকে আনুষঙ্গিক ভাবব্যূহের মধ্য থেকে উদ্ধার করে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। ভাষার অলঙ্কারবাহুল্যের মধ্যে ভাবের রাজকীয় অজস্রতা সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতির অনুকূল, কিন্তু বাংলা ভাষায় তা শোভন ও স্বাভাবিক নয়। এ সত্য যে তারাশঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর এই অনুবাদগ্রন্থটি থেকে ভালভাবেই পাওয়া যায়।

মূল 'কাদম্বরী'র মধ্যে নানা জাতীয় বর্ণনার নিদর্শন মেলে। তার অনেক জায়গায় প্রকৃতি ও মানুষের বিভিন্ন রূপ ও অবস্থার বিবরণ পাই, কোন কোন

জায়গায় পাই ঘটনার বর্ণনা, আবার কোথাও পাই বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর প্রেমের রূপায়ণ। এই সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় অংশের অনুবাদে তারাশঙ্কর কতখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সে সম্বন্ধেই এখন আমরা আলোচনা করব।

মূল 'কাদম্বরী'তে অনেক জায়গায় বর্ণনার ঘনঘটায় বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছে। তারাশঙ্কর মূলের এই আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা-রীতি অনুসরণ করেন নি, তার বদলে সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জিত ভাষায় তিনি বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন এবং এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি স্থানে স্থানে ভাবকে সূক্ষ্মভাবে ব্যঞ্জিত করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন, 'কাদম্বরী'তে ব্যাধের আগমনে অরণ্যবাসী পশুদের সন্ত্রস্ত হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, সেই বর্ণনার শব্দসম্পদ তারাশঙ্কর তাঁর অনুবাদে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেন নি, তার বদলে তিনি সঙ্কেতধর্মী বর্ণনার মধ্য দিয়ে ত্রস্ত পশুদের ভয়ব্যাকুলতার ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছেন এবং তার ভাষার ভিতর দিয়ে তাদের পলায়নের ছন্দটিকেও অনেকখানি ধরে দিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বিলাসবতীর গর্ভধারণের বর্ণনার যেভাবে অনুবাদ করেছেন, তা-ও তাঁর শক্তির পরিচয় দেয়। এখানে তিনি মূলের সুন্দর উপমাগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বলে বর্ণনাটি অনবদ্য হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরাম কালকেতু-জননীর গর্ভাবস্থা বর্ণনায় খুব বেশী কবিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি, তার মধ্যে উপমা বা অনুরূপ কোন অলঙ্কারের নিদর্শন মেলে না। সংস্কৃত কাব্যের কবিরা গর্ভাবস্থাকে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যবৃদ্ধির একটি স্তর বলে মনে করতেন, তাই তার বর্ণনা তাঁরা যথাসম্ভব সুন্দরভাবে দিতেন। এর মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর তাদেরই পন্থা অনুসরণ করেছেন।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে তারাশঙ্করের বর্ণনা সুন্দর ও সার্থক হয়েছে, তা নয়। প্রভাতের বর্ণনা তিনি যেভাবে করেছেন, তার ভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতগন্ধী হওয়ার জন্য তার মধ্যে প্রভাতের মনোরম স্নিগ্ধতার ইঙ্গিত ফুটে ওঠেনি। একটি প্রভাত-বর্ণনায় তারাশঙ্কর প্রভাতের সঙ্গে সম্মার্জনীর উপমা দেওয়াতে প্রভাতের মনোহারিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সন্ধ্যার যে সমস্ত বর্ণনা তার অনুবাদে পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে আমরা কতকগুলি কষ্টকল্পিত উপমা মাত্র পাই, সন্ধ্যার রূপ ও ভাবাবেদনের ব্যঞ্জনা তাদের ভিতরে মেলে না।

আখ্যানকাব্যের মধ্যে বিবৃতিধর্মী বর্ণনার পরিমাণ অন্যান্য বর্ণনার চাইতে অনেক বেশী হয়। এই বর্ণনায় লেখকের দক্ষতার উপরেই আখ্যানকাব্যের

কাহিনীটি পাঠকদের কাছে কতখানি আকর্ষণীয় হবে, তা নির্ভর করে। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে কাব্যধর্মী অলঙ্কারবহুল বর্ণনার আধিক্য থাকায় তার মধ্যে বিবৃতিধর্মী বর্ণনা যতটা প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পায়নি। তারাশঙ্কর তাঁর অনুবাদে বিবৃতি-পরম্পবাব মধ্য দিযে কাহিনীটি সহজভাবে ও স্বচ্ছন্দভাবে বর্ণনা কবে গিয়েছেন। তাঁর হাতে পড়ে বিবৃতিগুলি অনেক জাযগায ব্যঞ্জনাধর্মী হযেছে। মূল 'কাদম্বরী'র সঙ্গে তাঁর অনুবাদের বর্ণনা-বীতির দিক দিযে একটি পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায়। মূলে বাণভট্ট কাহিনী শেষ হযে যাবার পর তার বিবরণ দিযেছেন, কিন্তু তারাশঙ্কব ঘটনাস্রোতের অনুকরণ করে গিয়েছেন।

'কাদম্বরী'ব বিমর্ষ-প্রধান অংশের অনুবাদে তাবাশঙ্কব সম্পূণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা সেই অংশটি স্মরণ করতে পারি, যেখানে চন্দ্রাপীডের প্রতি মহামন্ত্রী শুকনাশের উপদেশ লিপিবদ্ধ হযেছে। সেখানে আমরা পাই কতকগুলি মামুলী উপদেশেব তালিকা এবং একজন লোকের সংসার-জ্ঞান ও সাধারণ অভিজ্ঞতাব সারসঙ্কলন। এই অংশটির মধ্যে সাহিত্যরসের নিদশন বিশেষ মেলে না, এটি অ্যাডিসন এবং স্টীলের প্রবন্ধের মত তথ্যসবস্ব বচনা তবে এই অংশটিব ভাষা খুবই সুন্দর হযেছে : এই ভাষাব মধ্যে লেখকের শিল্পজ্ঞান ও পবিমিতিবোধের উজ্জ্বল নিদশন পাওযা যায, এখানে তিনি সংস্কৃত ভাষার আদশানুগ বচনারীতিকে পরিহার করে, জটিল বাক্য বর্জন করে লক্ষ্যণীয মৌলকতাব পরিচয দিযেছেন। এই অংশটিব দু' একটি বাক্য বাদ দিলে সমগ্র অংশটিকে আধুনিক বাংলা গদ্য-বীতির লক্ষণা-ক্রান্ত বলা যেতে পারে। এব মধ্যে কতকগুলি বিম্ব-প্রতিবিম্ব অলঙ্কারের নিদর্শন মেলে ; যেমন, "উর্বরাভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না ?" "দিবাকবের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে ?" পরবর্তীকালে মধুসূদন তাঁর কাব্য ও নাটকে এই জাতীয বহু অলঙ্কাব প্রযোগ করেছেন, এ বিষযে তারাশঙ্কর তাঁকে খানিকটা প্রভাবিত করে থাকতে পারেন। 'কাদম্বরী'র আলোচ্য অংশটিতে প্রকাশভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয ; এর মধ্যে একমাত্র 'বৈরূপ্য' শব্দটি 'রূপের অভাব' অর্থে প্রযোগ করায খানিকটা অসঙ্গতি হযেছে ; এটুকু বাদ দিলে এই অংশটির ভাষাকে সবাঙ্গসুন্দব বলা যেতে পারে।

'কাদম্বরী'র যে সমস্ত স্থানে প্রেমের বর্ণনা করা হযেছে, সেগুলির অনুবাদে তাবাশঙ্কর ব্যর্থতা বরণ করেছেন। এইসব ক্ষেত্রে মূলের অসামান্য সৌন্দর্যের

প্রায় কিছুই তারাশঙ্করের অনুবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। ভারতবর্ষের প্রণয়-সাহিত্যে 'কাদম্বরী' একটি নতুন ধারার সূচনা করে। এদিক দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যে Romance of the Rose বইয়ের যে স্থান, ভারতীয় সাহিত্যে 'কাদম্বরী'র সেই স্থান। মূল 'কাদম্বরী'র ভাববিলাসপূর্ণ বর্ণাঢ্য কাব্যময় প্রণয়-বর্ণনা তারাশঙ্করের হাতে পড়ে নীরস প্রথানুগত কৃত্রিম গদ্যাত্মক বিবৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের একটি বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় এই যে যদিও তিনি মূল 'কাদম্বরী'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ* করেছেন এবং যদিও প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে বাণভট্টের সঙ্গে তাঁর আমূল পার্থক্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও মূল 'কাদম্বরী'র চরিত্র-গুলির বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁর অনুবাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। তাঁর আর একটি কৃতিত্বের বিষয় এই যে, এই অনুবাদে তিনি প্রাচীনকালের আবেষ্টনী ও আবহাওয়াকে বহুলাংশে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন; সংস্কৃত শব্দের সুনিপুণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তিনি এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করেছেন।

'কাদম্বরী'র আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি কথা বলা দরকার। পরবর্তীকালে যে গদ্যরীতি বাংলা ভাষার আদর্শ গদ্যরীতি হয়ে দাঁড়ায়, সেই বঙ্কিমী রীতির গঠনে 'কাদম্বরী'র ভাষা অনেকখানি উপাদান জুগিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাসের ভাষা প্রায় সম্পূর্ণভাবে 'কাদম্বরী'র ভাষার সগোত্র। তার পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'কাদম্বরী'র ভাষা এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষার সমন্বয়সাধন করে আদর্শ বাংলা গদ্যের ভাষা সৃষ্টি করেন।† এই দিক দিয়ে তারাশঙ্করের এই বইখানির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

* কোন কোন জায়গায় তারাশঙ্করের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত নয়, তার বিপরীত, অর্থাৎ সটীক। যেমন, কপিঞ্জলের অন্তর্ধানের পর মহাশ্বেতার বিলাপোক্তির একটি বাক্য—"আশয়া হি কিমিব ন ক্রিয়তে"—অনুবাদ করতে গিয়ে তারাশঙ্কর পাঁচটি বাক্য রচনা করেছেন এবং বাণভট্টের উক্তির সঙ্গে নিজের মন্তব্য যোগ করে দিয়েছেন।

† এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি স্মরণীয়:

"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'

বহুশত বছরের বহু ঐতিহ্যবিজড়িত বাংলা কাব্য সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একটি নবতন রূপ লাভ করল। এই যুগে সে দৃপ্ততর ও মহত্তর প্রাণধর্ম এবং নবীনতর লাবণ্য লাভ করে অজস্র বৈচিত্র্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, শান্ত গ্রাম্য নদী যেন সাগরসান্নিধ্য লাভ করে মহাকায়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হল। এই নতুন ও সমৃদ্ধ সাহিত্যের আবির্ভাবে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য ও কবিগানের ধারা ম্লান হয়ে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল, বাঙালী কবি এই নতুন কাব্যের অমৃত-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন।

এই নবযুগের নতুন কাব্যের সূচনা দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় নবযুগের লক্ষণগুলি খুব দানা বাঁধতে পারেনি। তাঁর কবিতায় আধুনিকতার বাষ্পরাজি সঞ্চিত হয়ে মেঘের রূপ নিয়েছে, কিন্তু তাতে সেই শীতল বাতাসের স্পর্শ লাগেনি যার ফলে বর্ষণ নামে এই মেঘে-বাতাসে মিলন প্রথম দেখতে পাওয়া যায় রঙ্গলালের রচনায়। প্রকৃত পক্ষে রঙ্গলালই এই নবযুগের প্রথম সার্থক পথিকৃৎ। অবশ্য রঙ্গলাল যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ধারাকেই অনেকখানি অনুসরণ করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর যমক-অনুপ্রাস প্রীতি, পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, এ' সমস্তই প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন, কিন্তু তাঁর কাব্যের অভিনবত্বের পরিমাণও অল্প নয়।

রঙ্গলালের কাব্যের অভিনবত্ব কোথায়, সে সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে রঙ্গলালের কাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে একটি নতুন সুর দেখা যায়। তিনি প্রকৃতিকে বাইরের সামগ্রী বলে মনে করেননি, তাকে মানুষের মনের সঙ্গে সূক্ষ্ম সূত্রে সম্পৃক্ত বলে অনুভব করেছেন। স্কটের প্রকৃতি-বর্ণনার মত রঙ্গলালের প্রকৃতি-বর্ণনাতেও প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা দেখতে পাই। চলমান পরিবর্তনশীল প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন এবং বর্ণবৈচিত্র্য-সম্পাদন রঙ্গলালের রচনায়ই প্রথম দেখা গেল। অবশ্য রঙ্গলালের কবিদৃষ্টি খুব গভীর স্তরে পৌঁছোয় নি। প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা, স্বাধীন প্রাণময় রূপ তাঁর অনুভূতির অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে নি।

তারপর, রঙ্গলালের কাব্যেই দেশাত্মবোধের প্রথম সার্থক বিকাশ দেখতে পাই। অবশ্য এর আগেই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেশাত্মবোধ অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু পরাধীন জাতির অন্তরে যে তীব্র দেশাত্মবোধের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, তার সামান্য একটি শিখামাত্র গুপ্তকবির কবিতায় জ্বলে উঠেছে। রঙ্গলালের সামনে ছিল এক দিকে গুপ্তকবির কবিতা, অপরদিকে রাজপুত চারণদের গীতি। তিনি এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর অকৃত্রিম দেশাত্মবোধই তাঁর কাব্যপ্রেরণায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। তাঁর সমস্ত কাব্যেই তার পরিচয় মেলে।

তৃতীয়ত রঙ্গলালের কাব্যে অতীত কালের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সামন্ততান্ত্রিক ক্ষাত্রযুগের প্রথা-পদ্ধতির খুব সুন্দর ছবি দেখতে পাই। প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোলের সূত্র অবলম্বন করে তিনি তাঁর কাব্যগুলিতে দেশের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যকে মহানবর্ণে চিত্রিত করেছেন।

ছন্দের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল কোন নতুনত্ব দেখাতে পারেন নি, প্রাচীন পয়ার-ত্রিপদী ছন্দেরই তিনি অনুসরণ করেছেন একথা সত্য, কিন্তু তাঁর পয়ার-ত্রিপদী প্রাচীন বাংলা কাব্যের পয়ার-ত্রিপদীর মত শিথিল নয়, জমাট ভাবের চাপে ঘনসন্নিবিষ্ট। তার মধ্যে শিল্পিসুলভ সংযমের, দৃঢ়সংবদ্ধ চিন্তার, সংক্ষিপ্ত অর্থগূঢ় বাক্যবিন্যাসের নিদর্শন মেলে। রঙ্গলালের কাব্যের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব তাঁর ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান কারণ। বিষয়বস্তু যুক্তিপ্রধান ও তথ্যপ্রধান হলে ছন্দ আপনার থেকেই সংহত হয়ে আসে। রঙ্গলালের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

পয়ার ছন্দ একটি দীর্ঘায়ত বর্ণনা রূপায়িত করার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। আর ত্রিপদী ছন্দে ভাবের প্রগাঢ়তা ও তীব্রতা সুষ্ঠুভাবে ফুটে ওঠে। রঙ্গলাল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তাঁর কাব্যে সার্থকভাবে এই দুই ছন্দ ব্যবহার করতে পেরেছেন। তিনি দু'এক জায়গায় নতুন ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হয় নি।

রঙ্গলালের কাব্যগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের ধারা এবং বস্তুনিষ্ঠ আধুনিক কাব্যের ধারার একটি সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের ধারা—যেমন দেবদেবীর স্তুতি ও অলৌকিক ঘটনাবিন্যাস আর বস্তুনিষ্ঠ কাব্যের ধারা—যেমন যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা সামাজিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষভাবে রূপায়িত করে তোলা। রঙ্গলালের কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্যের আধুনিক সংস্করণ বলতে পারা

যায়। এদের মধ্যে অলৌকিক উপাদানের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার গ্রান্থবন্ধন করা হয়েছে। তবে মঙ্গলকাব্যে দৈবই প্রধান, পুরুষকার গৌণ—কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যে পুরুষকারেরই বিজয় ঘোষণা করা হয়েছে। রঙ্গলালের কাব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—তাদের মধ্যে সবপ্রথম পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিপূর্ণ স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহু দিনের অভ্যাস।'

রঙ্গলালই প্রথম আমাদের কাব্যের প্রাসাদের পশ্চিমদিকের জানালা খুলে দিলেন। সেই খোলা জানালা দিয়ে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার বাতাস প্রবেশ করতে লাগল। রঙ্গলালের কবিতায় স্কট, মুর ও বায়রনের প্রভাবই সবচেয়ে প্রধান।

রঙ্গলাল অনেকগুলি কাব্য লিখেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে তাঁর প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বইখানির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলা যায়। কারণ এরই মধ্যে নবযুগের বাংলাকাব্যের লক্ষণগুলি প্রথম ফুটে উঠেছে। তার আগে প্রস্তুতির উদ্যম, জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের আয়োজন, বিদেশী ভাবধারার স্বীকরণের প্রচেষ্টা পূর্ণ বেগে চলছিল, কিন্তু তার মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্ফুরণ হয় নি। মন্দির গড়ে উঠছিল, কিন্তু তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তখনও প্রতিষ্ঠিত হন নি। 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'ই এই দেবীর প্রথম বোধন ধ্বনিত হল। তারপর মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ' কাব্য, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিহারীলালের কবিতা—এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেবী পূর্ণ মূর্তিতে দেখা দিলেন।

'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র উপর স্কট ও বায়রনের পদ্য-আখ্যায়িকার প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু এই কাব্য পাশ্চাত্ত্য কাব্যের অনুকরণ মাত্র নয়। যে স্বদেশপ্রীতি, দৃপ্ত তেজে পরিপূর্ণ ক্ষাত্রশক্তি ও দুঃসাহসিকতার আকর্ষণ স্কট ও বায়রনের কাব্যের প্রেরণা, রঙ্গলাল তাকেই দেশীয় কাব্যের রীতিনীতি ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে রাজপুত-ইতিহাসের এক মহিমান্বিত কাহিনীর উপর স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাব ও সুরের দিক দিয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তার কোন আভাসই পাওয়া যায় না। এই কাব্যের ছন্দ ও অলংকার কৃত্রিমতাদুষ্ট; এবং সর্বত্র ত্রুটিহীন নয়। যেমন,

রাজ্য নাহি চায়, ধন-পিপাসায়
না করে এ ঘোর রণ।
শুধু সুলোচনে, তব চন্দ্রাননে
নিরখিতে আকিঞ্চন।

এখানে শেষ ছত্রে ছন্দপতন হয়ে গিয়েছে। তেমনি,

যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টির পতনে।
ফলফল দলে দলে দলিত সঘনে॥

গোলাবর্ষণের এই উপমা সুষ্ঠু হয়নি। এই কাব্যের ভাষাতে মাঝে মাঝে গুরুচণ্ডালী দোষের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,

পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।
দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ?

কয়েক জায়গায় রঙ্গলাল কবিওয়ালাদের মত শ্লেষ—যমকের বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন,

আজ্ঞামাত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল।
সঙ্গিনী-কুলের কুল খাইতে আকুল॥
কবি কহে এত নহে, নারীকেলী কুল।
কুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল॥

কয়েক জায়গায় রঙ্গলাল অবশ্য বর্ণনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাব্যের সূচনার এই অংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

দেখিলেন অজামীল-পুরী আজমীর।
যশস্মীর যোধপুর আর বিকানীর॥
কোটা বুন্দি শিকাবতী নীমচ সাবয়ে।
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥
জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ।
যার শোভা মনোলোভা, বৈকুণ্ঠবিশেষ॥

এই অংশটিতে কয়েকটি স্থানের নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু তার মধ্যেও উপভোগ্য কাব্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর, যুদ্ধের এই বর্ণনাটি বেশ সুন্দর হয়েছে,

ছুটিল ভুবঙ্গী সেনা করবাল করে।

যেন উৎস বদ্ধ ছিল শিখরগহ্বরে।
পর্বতের বক্ষ ভেদি ধাইল সত্বরে॥
উড়ে পর শুভ্রতর টোপর উপর।
স্রোতোমুখে ফেনরাশি যেন অগ্রসর॥
কভু উর্দ্ধে কভু নীচে হয় চয় ধায়।
তরল তরঙ্গ-রঙ্গ শোভা হইল তায়॥
কোষ-মুক্ত অসি-পুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে।
দিনকর-কর যেন জাহ্নবীর জলে॥

বিখ্যাত "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" ইত্যাদি কবিতাটি উদ্দীপনা-স্ফূর্তির দিক দিয়ে অতুলনীয়। তবে এই কবিতাটির কোন কোন অংশ মুরের দু'টি কবিতার অংশবিশেষের অনুবাদ। রঙ্গলাল এখানে এমন সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন যে তাকে অনুবাদ বলে মনেই হয় না। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' একখানি আখ্যানকাব্য। কিন্তু আখ্যানকাব্যের কাহিনীতে যে নাটকীয় ক্রমবিকাশ থাকে তা এই কাব্যে দেখা যায় না। চরিত্রগুলির মধ্যেও কোনটি জীবন্ত হয় নি। নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য স্থান অধিকার করে থাকবে। কারণ এর মধ্যে দেশাত্মবোধদীপ্ত বীররসের প্রথম সার্থক বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রথম স্বাক্ষরের দিক দিয়েও এই কাব্য অবিস্মরণীয়।

'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র মধ্য দিয়ে রঙ্গলাল সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের বীরযুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করেছেন। এই দ্বার খুলতে গিয়ে তিনি হয়ত স্থূল অস্ত্র ব্যবহার করেছেন যার ফলে দ্বারের সূক্ষ্ম কারুকার্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি যুগপ্রবর্তক কবি হিসাবেই স্বীকৃত হবেন। তিনি যে বাংলা কাব্যের মোড় এক নতুন দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তা অবিসংবাদিত সত্য। প্রথম যিনি পথ তৈরী করেন, তিনি সব সময় সে পথকে ঋজু ও মসৃণ করতে পারেন না। রঙ্গলালও তা পারেন নি। কিন্তু তিনি উত্তরসাধকদের কর্তব্য সহজ করে দিয়েছেন। রঙ্গলালের কাব্যের স্থূল বীররস মধুসূদনের সূক্ষ্ম ও উন্নত বীররসের অগ্রদূত

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'

মধুসূদনের কবিজীবনের সঙ্গে তুলনা করা যায় একটি সিংহদ্বার তোরণের। 'মেঘনাদবধকাব্য' এই তোরণের শীর্ষ। অন্যান্য কাব্যগুলির স্থান তার নীচে, কিন্তু তোরণের বিচিত্র কারুকার্য ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য তাদের মধ্যেও দেখা যায়, অবশ্য কারও মধ্যে কম, কারও মধ্যে বেশী। এদিক দিয়ে 'মেঘনাদ-বধকাব্যে'র পরেই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নাম করা যেতে পারে।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নামকরণ ও পরিকল্পনার জন্য মধুসূদন যীশুখ্রীষ্টের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক রোমান কবি ওভিদের (সম্পূর্ণ নাম Pudlium Ovidius Naso—জীবৎকাল ৪৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—১৭ খ্রীষ্টাব্দ) কাছে ঋণী। ওভিদের The Heroides বা Epistles of the Heroines নামে পত্রিকা-কাব্যখানিতে একুশখানি পত্রিকা আছে। তার মধ্যে প্রথম পনেরোখানিতে গ্রীক বা রোমান পুরাণের পনেরোজন নায়িকা তাদের স্বামী বা প্রেমাস্পদের কাছে প্রেম নিবেদন করেছে। অবশিষ্ট ছ'খানির মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পত্রিকা নায়িকার প্রতি নায়কের পত্র এবং বাকী তিনটি নায়কের প্রতি নায়িকার। বিশেষজ্ঞেরা এই ছ'টি পত্রিকা জাল বলে মনে করেন। ওভিদ যেরকম নায়িকামাত্রকেই "Heroine" আখ্যায় অভিহিত করেছেন, মধুসূদনও তেমনি 'বীরাঙ্গনা'র নায়িকাদের "বীরাঙ্গনা" নামে অভিহিত করেছেন, তাঁদের উক্তির মধ্যে বীরভাব থাকুক বা না থাকুক। ওভিদের মত মধুসূদনের কাব্যেও পৌরাণিক নায়িকারা তাদের স্বামী বা প্রেমাস্পদের কাছে চিঠি লিখেছে; বলা বাহুল্য, এরা সকলেই ভারতীয় পুরাণের নায়িকা। ওভিদের কাব্যের নায়িকাদের মত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেরও অধিকাংশ নায়িকাই চিঠির মধ্য দিয়ে প্রেম-নিবেদন করেছে, কয়েকজন নায়িকা অবশ্য অন্য কথা লিখেছে। The Heroides-এর মত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও একুশটি পত্রিকা থাকবে—মধুসূদনের এই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু শেষ অবধি তিনি এগারটি পত্রিকা সম্পূর্ণ করতে পেরে-ছিলেন। এই এগারটি পত্রিকা দিয়েই তিনি 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশ করেন।*

* এই এগারটি পত্রিকা ছাড়া মধুসূদন আরও পাঁচখানি পত্রিকা লিখতে সুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। এই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি পরে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির নাম—

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের বহু অংশের ভাব ও ভাষায় ওভিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। The Heroides কাব্যের Bristeries to Achilles নামক পত্রিকা-খানির অনেক অংশ মধুসূদন 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' ও 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা' পত্রিকায় প্রায় হুবহু তর্জমা করেছেন। 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' এবং 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'র অনেকগুলি ছত্র Ariadne to Theseus-এর অনেক ছত্রকে স্মরণ করিয়ে দেবে। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার পরিকল্পনাটিই Phaedra to Hipploytus পত্রিকার অনুরূপ। তারা যেমন তার স্বামীর শিষ্য সন্তান স্থানীয় সোমকে প্রেমনিবেদন করেছে, ফেদ্রাও তেমনি তার সপত্নীপুত্র হিপ্লোতাসকে নির্লজ্জভাবে প্রণয়জ্ঞাপন করেছিল। দুই নায়িকার উক্তির ভাষাতেও অনেক জায়গায় হুবহু মিল আছে। ওভিদের Phyllis to Demophone এবং Sapho to Phaon পত্রিকার অনেকগুলি ছত্র যথাক্রমে 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' এবং 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' পত্রিকায় অনূদিত হয়েছে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে ওভিদের কাব্যের প্রভাব যে কত গভীর, তা এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বোঝা যাবে।*

কিন্তু এই সমস্ত প্রভাব সত্ত্বেও একটি বিষয়ে 'The Heroides'-এর সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পার্থক্য আছে। ওভিদের কাব্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তার ভাবজগৎ আগাগোড়াই কবির কল্পনার সৃষ্টি এবং গ্রীক-রোমান পৌরাণিক কাহিনীর স্মৃতিতে অনুরঞ্জিত। এই কারণে তার মধ্যে কৃত্রিমতা অনুভব করা যায়। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পরিবেশটির মধ্যে আমাদের নিত্যপরিচিত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি পড়েছে।

---

* 'ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী,' 'অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা', 'যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা', 'নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী' এবং 'নলের প্রতি দময়ন্তী'। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি'-তে লিখেছেন যে এ ছাড়া মধুসূদন 'ভীমের প্রতি দ্রৌপদী' নামে আরও একটি পত্রিকা লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি এটি প্রকাশ করেন নি। এই অধুনালুপ্ত অসম্পূর্ণ কবিতাটি সম্ভবত কোন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি যখন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে পড়তাম (১৯৪৯-৫০), তখন সেখানকার বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাধারমণ দাস মহোদয় আমায় বলেছিলেন যে তিনি কবিতাটি দেখেছেন। তিনি কবিতাটির একছত্র স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সেটি এই— "মুক্তকেশী আজো আমি দ্রুপদনন্দিনী।" কিন্তু কোথায় কবিতাটি দেখেছিলেন, তা অধ্যাপক দাসের তখন আর স্মরণ ছিল না।

ওভিদের কাব্যের মধ্যে আমরা দেখি অলঙ্কারের খেলা, বীরাঙ্গনা কাব্যে কিন্তু পাই জীবনের স্পন্দন।

[ওভিদের কাব্যের সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা'র বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনার জন্য করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Bengali Literary Review-এ (Vol. 3, No 2, pp 27-34) প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসানের Madhusudan's indebtedness to Ovid প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

'বীরাঙ্গনা' কাব্যকে একাধিক দিক দিয়ে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের পরিপূরক বলা যায়। মধুসূদন গ্রীক ও ল্যাটিন উভয় ভাষার সাহিত্যেই সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু 'মেঘনাদবধ' কাব্যে বিশেষভাবে গ্রীক কাব্যের প্রভাবই সক্রিয়। আর ল্যাটিন কাব্যের ভাবরস ও বাণীসম্পদকে স্বীকরণ করে তাকে মধুসূদন প্রতিফলিত করেছেন এই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। তারপর, শৈশব থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামদাসী মহাভারত মধুসূদনের প্রিয়তম বাংলা গ্রন্থ। কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি অধ্যায়কেই তিনি "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে ও পাশ্চাত্য কাব্যের ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত রত্নরাজিতে সাজিয়ে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। আর কাশীরামদাসের "অমৃত সমান কথা'কে তিনি নিজের পাত্রে ঢেলে বিচিত্রতর স্বাদ ও সৌরভ সঞ্চার করে পরিবেশন করেছেন "বীরাঙ্গনা' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়।

কিন্তু এই পরিপূরকতা সবচেয়ে প্রকট হয়েছে ছন্দের ক্ষেত্রে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মধুসূদন তার অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষায় চরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু এই কাব্যে বিশেষভাবে গম্ভীর ও সংহত ভাবগুলিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়ে উদাত্ত অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কিন্তু একান্ত কোমল ও কমনীয় চিত্তবৃত্তিগুলিকে এবং নারী-হৃদয়ের সুকুমার মৃদু অনুভূতিগুলিকেও যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়ে ললিতমধুর রূপে প্রকাশ করা যায়, মধুসূদন তা প্রমাণ করেছেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। 'মেঘনাদবধকাব্য' পড়ে মনে হয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কেবল সমুদ্রের নির্ঘোষই ধ্বনিত হয়, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে যে মুরলীর রাগিণীও মূর্ছিত হতে পারে, তা বোঝা যায় 'বীরাঙ্গনা' পড়লে।

'বীরাঙ্গনা' কাব্য একটি বস্তু প্রমাণ করছে যে বাংলা কাব্যে অভিনব form

বা আঙ্গিক প্রবর্তনে মধুসূদন যতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, এমন আর কেউ পারেন নি। এই কাব্যে তিনি পত্রের কাঠামোর মধ্যে নারীহৃদয়ের অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসকে আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। আমরা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে ব্যক্তিত্ব-দ্যোতনা ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাট্যরস সৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন পাই। এই দিক দিয়ে ব্রাউনিঙের diamatic monologues এবং রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা'র তুলনা চলতে পারে। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে এদের সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা'র পার্থক্য অনুভব করা যায়। ব্রাউনিঙের monologue গুলিতে একটি লোকের উক্তি সন্নিবিষ্ট হলেও শ্রোতার অদৃশ্য উপস্থিতি ও প্রভাব দ্বারা বক্তার বলার ভঙ্গী ও সুর নির্ধারিত হতে দেখতে পাই। 'বীরাঙ্গনা'য় এর দৃষ্টান্ত খুব কমই মেলে। "নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতায় আমরা নীলধ্বজের অদৃশ্য উপস্থিতির প্রভাব আদৌ অনুভব করি না।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির নাটকীয় গুণ 'বীরাঙ্গনা'র তুলনায় অনেক কম যদিও তাদের আঙ্গিক নাটকের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যগুণ আনবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব নাট্য-কবিতায় আখ্যায়িকার স্বাভাবিক গতি ফোটে নি, তার বদলে নাট্যরসবিরোধী গীতিধর্মিতাই অবাধ স্ফূর্তি লাভ করেছে। 'বিদায় অভিশাপ' 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' প্রভৃতি রচনা কাব্য হিসাবে প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু তাদের মধ্যে নাট্যরসের একান্ত অভাব। দীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড সংলাপ ও উক্তি-প্রত্যুক্তিতেই নাট্যরস বেশী জমে নাটকের তীব্র উত্তেজনা ও সংঘাতের মধ্যে বক্তার দৃষ্টি অবাধে প্রসারিত হবার সুযোগ নেই। সংলাপের অতি সুচিন্তিত ভাগবণ্টনের মধ্য দিয়ে নাটকের সুষমা ফুটে ওঠে, তার মধ্যে আকস্মিক উচ্ছ্বাসের অনধিকারপ্রবেশ ঘটলে রসহানি হয়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতা-গুলির মধ্যে এই দোষ রয়েছে, কিন্তু 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে এই বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদন পত্রের কাঠামোর মধ্যে যেভাবে সুপরিচিত পৌরাণিক ঘটনাগুলি বিন্যস্ত করেছেন, তাতে উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের কাছে সমস্ত পুরাণের রাজ্যই উন্মুক্ত ছিল।

তিনি ইচ্ছা করলে 'বীরাঙ্গনা'র সর্গগুলিকে অসংখ্য পৌরাণিক প্রসঙ্গে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারতেন। কিন্তু পত্রের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে যতটুকু পৌরাণিক প্রসঙ্গ স্বচ্ছন্দভাবে প্রবেশ করানো যায়, তার এতটুকু কম বা বেশী মধুসূদন গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদন পত্রের আঙ্গিক গ্রহণ করে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছেন, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পত্রের ভাষা সাহিত্যের ভাষা ও কথোপকথনের ভাষার মধ্যবর্তী। মৌখিক ভাষার অসংলগ্নতা তার মধ্যে থাকে না, কিন্তু তার ভিতর এমন একটি ঋজু প্রত্যক্ষতা থাকে, যা খাঁটি সাহিত্যিক ভাষাতে পাওয়া যায় না। পত্রের ভাষার সমস্ত সাহিত্যিক সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটি স্পষ্টতা থাকবে, যাতে আমরা মনে করতে পারি এই ভাষা মৌখিক ভাষা হলেও হতে পারত। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা'র ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার দূরতম সগোত্রতাও নেই।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের অন্তর্গত পত্রিকাগুলিতে পত্র-বিনিময়ের মৌলিক প্রেরণা খানিকটা ফুটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদের ভিতর মধুসূদন চিঠি-লেখার আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, তাতে নাটকীয় উপাদানের বীজ খানিকটা নিহিত রয়েছে। কিন্তু চিঠির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে যে চিঠি লেখে শুধু তার নয়, যাকে চিঠি লেখা হয় তার চরিত্রও প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন লোককে আমরা বিভিন্নভাবে চিঠি লিখি। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পত্রিকাগুলিতে লেখিকাদের চরিত্রের ছায়া বেশ স্পষ্টভাবেই পড়েছে এবং তাঁদের চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন পত্রিকার ভাব ও ভাষার বদল হয়েছে। কৈকেয়ী, জনা প্রভৃতি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্ত্রীলোকদের পত্রের সঙ্গে রুক্মিণী, শকুন্তলা, উর্বশী প্রভৃতি শান্তগুণসম্পন্ন স্ত্রীলোকদের পত্রের ভাষাগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। কিন্তু যাদের চিঠি লেখা হয়েছে, তাদের চরিত্রের প্রভাব এইসব পত্রিকার মধ্যে আদৌ পড়েনি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের মধ্যে সংহতি ও সমগ্রতার অভাব। কারণ 'মেঘনাদবধকাব্যে' কবি প্রতিবেশসৃষ্টিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এখানে তা দিতে পারেন নি। তারপর এর বিভিন্ন পত্রিকাগুলির

মধ্যেও কোন যোগসূত্র নেই বলে মনে হয়, যদিও কবি পত্রিকাগুলিকে 'সর্গ' আখ্যায় অভিহিত করেছেন।

কিন্তু এইভাবে বিচার করলে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের মূল সৌন্দর্য চোখে পড়বে না। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য 'মেঘনাদবধকাব্যে'র মত বস্তুপ্রধান নয়, অনুভূতিপ্রধান, এই কারণে তাতে প্রতিবেশসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তত বেশী নয়। আর, এর বিভিন্ন সর্গের মধ্যে কার্যকারণগত যোগ না থাকলেও ভাবগত যোগ রয়েছে। এদের মধ্যে নারীর বিভিন্ন মুহূর্তের বিভিন্ন অনুভূতি ও চিত্তবৃত্তিগুলিকে আলোক-চিত্রের মত স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একই সুন্দরীর বিভিন্ন ভঙ্গিমার চিত্রে ভরা এলবামের যে সমগ্রতা, 'বীরাঙ্গনা'র সমগ্রতাও সেই ধরণের। এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে উপলব্ধি করা যাবে, 'বীরাঙ্গনা' একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাব্য।

চতুর্থ সর্গ বাদে 'বীরাঙ্গনা'র প্রথম ছয়টি সর্গ ও দশম সর্গের বিষয়বস্তু নারীর প্রেম। কিন্তু এই প্রেমেরও প্রকারভেদ আছে। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রিকায় একজন বনবালা এক চক্রবর্তী সম্রাটের কাছে প্রেম নিবেদন করছে, এ প্রেমকে অসমান স্তরের প্রেম বলতে পারি। কিন্তু এ প্রেম পরকীয়া নয়, স্বকীয়া, এর পর্যায় বিপ্রলম্ভ। হতাশ্বাস প্রতীক্ষাব্যাকুল বিরহিণীর দীর্ঘনিঃশ্বাস এই পত্রিকার প্রতি ছত্রে অনুভব করা যায়,

> হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী।
> হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে,
> পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে,
> অমনি চমকি ভাবি—মদকল করী,
> বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
> পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
> কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
> প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে;
> নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা:
> কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে।

কালিদাসও শকুন্তলাকে দিয়ে দুষ্মন্তের কাছে চিঠি লিখিয়েছিলেন, কিন্তু সে চিঠি মিলনের আগে লেখা। মধুসূদন মিলনের পরে আশাহতা শকুন্তলাকে দিয়ে

এই করুণ-মধুর পত্রটি রচনা করিয়েছেন। রাজার ক্ষণিকের প্রেম যে মিলন-লগ্নের অবসানে স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তা উপলব্ধি করে শকুন্তলা তাঁর প্রেয়সী হতে না চেয়ে কিঙ্করী হতে চেয়েছেন। প্রেমের এই পরাজয় পত্রিকাটির মধ্যে একটি ট্র্যাজিক সুর ধ্বনিত করে তুলেছে।

'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকারও বিষয়বস্তু প্রেম। গুরুপত্নী ও শিষ্যের এই প্রেম অসমান স্তরের তো বটেই, উপরন্তু সমাজ-বিগর্হিত। এটি চরম স্তরের পরকীয়া প্রেম, এর পর্যায় পূর্ববাগ। এই পত্রিকায় তারা তার সমস্ত অবরুদ্ধ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হৃদয়াবেগকে এক মুহূর্তে যে রকম উন্মুক্তভাবে নিঃশেষে প্রকাশ করেছে, তাতে তীব্র নাটকীয়তা সৃষ্ট হয়েছে। তারার এই অনুরোধ যেমন ভাবাবেগপূর্ণ, তেমনি দুঃসাহসিক,

> কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
> কব আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
> তারানাথ। নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
> এস, হে তারার বাঞ্ছা। পোড়ে বিরহিণী,
> পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শৈবলিনী চরিত্রের উপর মধুসূদনের তারার খানিকটা প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়।

'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রিকায় আর এক ধরণের প্রেম রূপায়িত হয়েছে। এ প্রেমেরও পর্যায় পূর্বরাগ। কিন্তু এ প্রেম সমান স্তরের, সমাজ-সম্মত, স্বকীয়া প্রেম। রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সহস্র সহস্র কবির কবিতায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর প্রেমও মাধুর্যের দিক দিয়ে অতুলনীয় এবং এই প্রেমের সার্থকতা লাভের কাহিনীটি অত্যন্ত নাটকীয়তাপূর্ণ। পরকীয়া প্রেম নানারকম বাধানিষেধে কণ্টকিত বলে তার তীব্রতা অত্যন্ত বেশী, তাই তারই মধ্যে বেশী কাব্যসম্ভাবনা থাকে। এই কারণে রাধার প্রেমই যুগে যুগে কবিদের আকর্ষণ করে এসেছে, কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা রুক্মিণী চিরকাল "কাব্যে উপেক্ষিতা" হয়েই আছেন। বাঙালী কবিদের মধ্যে একমাত্র মধুসূদনই রুক্মিণীর প্রেমকে সার্থক কাব্যরূপ দিয়েছেন। 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রিকায় রুক্মিণী যেভাবে কৃষ্ণকে প্রেম নিবেদন করেছেন, তার মধ্যে একাধিক অভিনব বৈশিষ্ট্য আছে। রুক্মিণী

এই পত্রিকায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করায় এবং বিদর্ভপুরে নব-বৃন্দাবন রচনার উল্লেখ করায় বোঝা যায়, কৃষ্ণ তাঁর মনের কত গভীরে আসন পেতেছেন। এই পত্রিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে রুক্মিণী কোথাও তাঁর প্রেমাস্পদের নাম করেন নি। কৃষ্ণের কাছে তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের রূপগুণ ও ইতিহাস বর্ণনা করে পরিশেষে অনুরোধ জানাচ্ছেন,

প্রবেশি এ দেশে.
হর মোরে। হবে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে।

প্রেমের এই মধুর ছলনাটুকুই এই পত্রিকার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' এবং 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী'তে আবার অসমান স্তরের প্রেমের দেখা পাই, প্রথম পত্রিকায় প্রেমিকা রাক্ষসী, প্রেমাস্পদ মানুষ। দ্বিতীয়টিতে প্রেমিকা স্বর্গের অপ্সরী, প্রেমাস্পদ মর্ত্যের মানব। কিন্তু 'মেঘনাদ-বধে'র রাবণ-মেঘনাদের মত 'বীরাঙ্গনা'র সূর্পণখার মধ্যেও রাক্ষসোচিত বর্বরতার কণামাত্র নেই, মানবীর মত সে তার প্রেমের নৈবেদ্যকে বাণীর ডালিতে সাজিয়ে হৃদয়ের দেবতাকে নিবেদন করেছে। তরুণ অন্তরের মগ্ন প্রেমের এই বর্ণনাটি পত্রের আঙ্গিকের মধ্যে অত্যন্ত মধুর হয়ে ফুটেছে। এ প্রেমের বৈশিষ্ট্য একটা উদগ্র বাসনা ও দুরন্ত অধৈর্য। লক্ষ্মণের সন্তুষ্টির জন্য সূর্পণখা যে কোন রূপ ধারণ করতে প্রস্তুত। সে এমন কথাও বলেছে,

প্রেম-উদাসীন যদি তুমি গুণমণি,
কহ, কোন যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
বামাকুলে সে রমণী।)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমিষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে।

সূর্পণখা যে মায়াবিনী রাক্ষসী, (কিন্তু "বিকটা" রাক্ষসী নয়) তার পরিচয় এই কথাগুলি থেকে পাওয়া যায়।

শেষ অবধি, সূর্পণখা লক্ষ্মণের জন্য যোগিনী হতেও রাজী হয়েছে,

নহে কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,

এ বেশ—ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব।

প্রেমের এই অধৈর্যই স্পর্ণখার পত্রে অশ্রুচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছে। পত্রিকাটি আমাদের মনে একটি বাস্তব অনভিজ্ঞা মন্মথ শরাহতা তরুণীর চিত্র প্রত্যক্ষবৎ ফুটিয়ে তোলে।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম'এর মত 'বিক্রমোর্বশীয়ম' নাটকের নায়িকা উর্বশীও প্রেমাস্পদ পুরুরবাকে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু সে পত্র অভিশাপের আগে লেখা। মধুসূদন উর্বশীকে দিয়ে পত্র লিখিয়েছেন তাঁর প্রেমের নাটকীয়তম মুহূর্তে, অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়ার অব্যবহিত পরে। পুরুরবার দৃপ্ত পৌরুষ স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে প্রেমে মুগ্ধ করে পথভ্রষ্ট ও স্বর্গভ্রষ্ট করেছে তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই তিনি আশ্রয় চেয়েছেন তার সেই পরমাকাঙ্ক্ষিত পুরুষেরই কাছে। এই পত্রিকার আগাগোড়াই রূপজ প্রেমের আসক্তি উন্মুক্ততম ভাষা ও ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

'অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রিকার বিষয়বস্তু প্রেম হলেও এর রস ও আস্বাদন স্বতন্ত্র ধরণের। এখানে নায়িকা প্রোষিতভর্তৃকা দ্রৌপদী বহু পতির ঘরণী কিন্তু অর্জুনই তাঁর প্রিয়তম। সেই অর্জুনের সঙ্গে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের ফলে দ্রৌপদীর প্রাণ কাতর হয়ে উঠেছে, দেবদেশগত অর্জুনকে পত্র প্রেরণের সুযোগ পেয়ে তিনি তাঁর সেই কাতরতাকেই অভিব্যক্তিদান করেছেন। পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের ফলে তিনি অধীরা হয়ে উঠেছেন,

এত দব লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত।

কিন্তু দ্রৌপদী তরুণী প্রেমিকা নন, অভিজ্ঞা গৃহিণী। তাই তার পত্রের মধ্যে প্রেম বাঁধ ভাঙে নি, তার প্রকাশ একান্ত সংযত ও শান্ত। তিনি এই পত্রে নিজের পাণ্ডবদের ও অন্যান্য পরিজনদের বিস্তৃত সংবাদ দিয়েছেন, অর্জুনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছেন এবং পত্রের শেষে মধুরভাবে পরিহাস করেছেন,

কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ।

দ্রৌপদীর বয়স ও অভিজ্ঞতার প্রভাব এই পত্রটিতে পড়েছে এবং এই আলোকেই তাঁর প্রেম এক নতুন মূর্তি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। প্রেমের এই প্রকারভেদ 'বীরাঙ্গনা'র পত্রিকাগুলির প্রধান আকর্ষণ।

'বীরাঙ্গনা'র বাকী পাঁচটি পত্রিকায় নারীর অন্যান্য অনুভূতি অভিব্যক্ত হয়েছে। 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকায় জাহ্নবীর যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তা ঔদাসীন্য। পত্রের প্রথমেই তিনি শান্তনুকে লিখেছেন,

> বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
> বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
> মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
> ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
> স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে।

যে জাহ্নবী বৎসরের পর বৎসর শান্তনুর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে ছিলেন, তাঁর আট জন সন্তানকে যিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনিই আজ শান্তনুকে অনায়াসে বলছেন,

> পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে

> কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্বকথা ভুলি,
> করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
> প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা। শৈলেন্দ্রনন্দিনী
> রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে।

এই উক্তিতে আমাদের বিস্ময় বোধ হয়, কিন্তু আসলে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। যে নারী প্রকৃত উদাসিনী, সে অসঙ্কোচে এমন কথা বলতে পারে। জাহ্নবী দেব-কর্তব্যের অনুরোধে শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন, সে কর্তব্য পালন হয়েছে, তাই শান্তনুর সঙ্গে পূর্ব সম্পর্কের অবসান ঘোষণা করতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই। শান্তনুর সঙ্গে তিনি নিবিড়তম দৈহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে শান্তনুর জন্য কোনদিন একবিন্দুও প্রেম জাগে নি, তাই আজ সম্পর্ক-পরিবর্তনের কথা লিখতে তার লেখনী এতটুকু বিচলিত হয় না। নারীর এমন নির্বিকার হৃদয়হীন ঔদাসীন্যের ছবি খুব কম লেখকই

ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এদিক দিয়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একমাত্র কপালকুণ্ডলার সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা'র জাহ্নবীর তুলনা চলে।

'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' ও 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' এই দু'টি পত্রিকায় নারীচিত্তের আর একটি অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে। এটি মানুষের অন্‌ ম প্রাথমিক অনুভূতি—ভয়। কপোতের নীড়ে শ্যেন হানা দিলে কপোতী যেরকম সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, তেমনি স্বামীদের আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় ভানুমতী এবং দুঃশলার হৃদয় ত্রাসে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই দুই পত্রিকায়, বিশেষত 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা'তে ে উৎকট ভয়ের ছবি ফুটেছে, তা বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। ভানুমতী দুযোধনকে সন্ধি স্থাপন করতে বলেছে, কিন্তু দু শলা সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে জয়দ্রথের কাছে পালাবার প্রস্তাব করেছে। এই দুই নারীর প্রতি "বীরাঙ্গনা' বিশেষণের প্রয়োগ যেন কবি মধুসূদনের প্রচণ্ড পরিহাস।

নারীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তার স্বামী বা পুত্রের নিজের দোষে কোন বিপদ ঘটে, তখন তারা স্বামী-পুত্রের দোষ দেখতে পায় না। তার বদলে বিপদের জন্য আর পাঁচজনের প্রতি তারা দোষারোপ করে। 'মেঘনাদবধকাব্যে'র মন্দোদরী চরিত্রের মধ্যে আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখেছিলাম সেই একই বৈশিষ্ট্য আবার আমরা 'বীরাঙ্গনা'র ভানুমতী ও দুঃশলার মধ্যে দেখতে পেলাম। ভানুমতী দুযোধনের দুরদৃষ্টের জন্য স্বয়ং দুযোধনকে দায়ী না করে দায়ী করেছে শকুনিকে আর দুঃশলা জয়দ্রথের বিপদের জন্য জয়দ্রথের উপর দোষ না দিয়ে দোষারোপ করেছে দুযোধনের উপর। এই দুই নারীর কোন অসাধারণ মহিমা না থাকতে পারে, কিন্তু এরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নারী।

'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রিকার আগাগোড়াই নারীর ক্রোধের অভিব্যক্তি। পত্রিকার প্রথম দিকে এই ক্রোধ স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ না করে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে রূপলাভ করেছে। কিন্তু তার পরে সমস্ত আবরণ দূর হয়ে গিয়েছে, নগ্ন ও দুরন্ত ক্রোধের বহ্নিদাহ চিঠির মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে; নারীর উক্তির মধ্য দিয়েও যে দৃপ্ত রৌদ্ররস সৃষ্টি করা যায়, এই পত্রিকায় মধুসূদন তা দেখিয়েছেন। রামের প্রতি মধুসূদনের আন্তরিক বিরাগ ছিল। তাই কি তিনি কৈকেয়ীর ক্রোধকে এত সহানুভূতির সঙ্গে রূপায়িত করেছেন?

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকার মধ্যে বীররস, রৌদ্ররস ও করুণরসের সুন্দর সমন্বয় হয়েছে। পত্রিকাটির প্রথম অংশের প্রধান ভাব উৎসাহ, দ্বিতীয় অংশের প্রধান ভাব ক্রোধ এবং তৃতীয় অংশের প্রধান ভাব শোক। একই নারীর অন্তরের এই তিনটি অনুভূতিকে মধুসূদন অত্যন্ত জীবন্ত করে রূপায়িত করেছেন। সমস্ত পত্রিকাটির মধ্যে একটি তেজস্বিনী ক্ষত্রনারীর দৃপ্ত মূর্তি ফুটে উঠেছে, তার অন্তর পুত্রশোকে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে শোকও ক্ষত্রনারীরই শোক. সেখানে শোকের চাইতে বড় হয়ে উঠেছে যে শত্রু অন্যায় যুদ্ধে তার একমাত্র পুত্রকে নিহত করেছে, তার প্রতি দুর্বার ক্রোধ। ক্ষত্রনারীর শোকের শান্তি প্রতিহিংসায়, তাই জনা পত্রের প্রথম অংশে নীল-ধ্বজকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিত করেছেন, কিন্তু তারপরে সে চেষ্টা বৃথা উপলব্ধি করে তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকাদের মধ্যে একমাত্র জনাই প্রকৃত অর্থে বীরাঙ্গনা। 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতায় জনা চরিত্রের যে নাটকীয় সম্ভাবনা আভাসিত হয়েছে, তাকে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'জনা' নাটকে সার্থক করে তুলেছেন।

ক্রোধের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তার মধ্য দিয়ে শত্রুর সমস্ত কিছুই বিকৃত ও কুৎসিত বলে মনে হয়। জনাও নিদারুণ ক্রোধে ক্ষিপ্তা হয়ে অর্জুনের জন্ম থেকে সুরু করে বীরত্ব পর্যন্ত সমস্ত কিছুরই গ্লানি এই পত্রিকায় উদ্ঘাটিত করেছেন। তিনি অর্জুনের জননী কুন্তী ও ভার্যা দ্রৌপদীর কুৎসা রচনা করেছেন, পাণ্ডবদের প্রশস্তি-রচয়িতা বেদব্যাসকেও বাদ দেন নি। জনার এই ক্রোধের চিত্র যে বাস্তবতাসম্মত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আলোচ্য পত্রিকাটির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এর শেষাংশ, যেখানে জনা ক্রোধের অগ্নিবর্ষণের পরে প্রতিশোধের আশায় নিরাশ হয়ে শোকের হাহাকারে ভেঙে পড়েছেন,

> হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
> দশ মাস দশ দিন নানা কষ্ট স'য়ে,
> এ উদরে?
>
> ... .
>
> যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে

নব মিত্র পার্থ সহ। মহাযাত্রা করি
চলিলা অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে।
.. ..
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" ব'লি।

কোন কবিই যুগ-নিরপেক্ষ কাব্য রচনা করতে পারেন না। কবির জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর সমসাময়িক যুগের ধর্ম এবং সেই যুগের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। এই কারণে আধুনিক কবি যখন প্রাচীন যুগের পটভূমিকায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন, তখন তার মধ্যে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক যুগের চিন্তাভাবনা ও বেদনা সঞ্চারিত হয়। ইংরেজী সাহিত্যে মিল্টনের Paradise Lost, টেনিসনের Ulysses ও ব্রাউনিঙের Dramatic monologues-এ এবং বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' ও রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা', 'কাহিনী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এর নিদর্শন মেলে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও এই বিষয়ের সুন্দর উদাহরণ পাই। এই কাব্যের অন্তর্গত পত্রিকাগুলির পরিকল্পনার মূল সূত্রটুকু মধুসূদন পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্য থেকেই পেয়েছেন, কিন্তু তার রূপায়ণ একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। এই চিঠিগুলিতে নায়িকারা যেসব কথা লিখেছে, তার মধ্যে পুরাণ-প্রসঙ্গের অন্তরালে আধুনিক যুগের চিন্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকাটি স্মরণ করা যেতে পারে। এই পত্রিকার আখ্যানভাগ পুরাণে আছে, কিন্তু তা একান্তই সংক্ষিপ্ত, এবং সেখানে এই সমাজ বিগর্হিত প্রেমের প্রতি জুগুপ্সা ও ধিক্কার বর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু মধুসূদন তারার প্রেমনিবেদনকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন, সমাজের শাসনের ঊর্ধ্বে মানুষের হৃদয়বিক্ষোভকে স্থান দিয়েছেন। এখানে সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' পত্রিকাটিতে এরই আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কবি নিজেই লিখেছেন, "কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ

মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।" বিকটা রাক্ষসীর মুগ্ধা নায়িকাতে রূপান্তর, এতে আধুনিক কালের চিন্তাধারারই প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'পুরুরবার প্রতি উবর্শী' পত্রিকার নায়িকা উবর্শী স্বর্গ থেকে নির্বাসনের জন্য এক মুহূর্তের জন্যও খেদ করছেন না, মর্ত্যই তাঁর কাছে বাঞ্ছিত আশ্রয় বলে মনে হচ্ছে। কালিদাসের নাটকে এই ভাবটি তেমন পরিস্ফুট নয়, কিন্তু মধুসূদন এই ভাবটিকে হৃদয়গ্রাহী রূপে অভিব্যক্তি দান করেছেন। তার কারণ আধুনিক যুগের কবির কাছে কল্পনাসৃষ্ট পৌরাণিক স্বর্গলোকের কোন মূল্য নেই, ধুলো-মাটি দুঃখ-সুখ মায়া-মমতায় ভরা বাস্তব পৃথিবীর মোহেই তাঁদের মন ভরপুর। এই দিক দিয়ে 'পুরুরবার প্রতি উবর্শী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার অগ্রদূত।

'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রিকার এক জায়গায় আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় রয়েছে। মহাভারতে পঞ্চ স্বামীর ভার্যা হবার জন্য দ্রৌপদীর মনে কোন খেদ বা গ্লানির চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ নারীর পঞ্চ স্বামীকে আপত্তিকর ব্যাপার বলেই মনে করে। এই বিসদৃশ কাণ্ড দ্রৌপদীকে সুখী করেনি বলেও তারা ভাবতে পারে। মধুসূদন দ্রৌপদীকে দিয়ে এই যে ক'টি কথা লিখিয়েছেন, তাতে এই ভাবনারই পরিচয় আছে,

বজ্রনাদে ভেদিলা আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর। সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন।) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি।
ফুল মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে!'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য-দোষে। তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ?

এখানে দ্রৌপদী অর্জুনকে স্পষ্টই বলছেন, "স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যভেদের পরেই আমি যদি তোমার গলায় মালা দিতাম, তাহলে বহুপতি-রূপ বিষম তাপে আমায় জ্বলে মরতে হত না।"

'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' ও 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' কবিতায় শুধু

আধুনিক চিন্তাধারারই প্রভাব নেই, ভানুমতী ও দুঃশলা প্রায় আধুনিক কালের বাঙালী নারীতে পরিণত হয়েছে। মহাভারতে কোথাও লেখা নেই যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে দুর্যোধন ও জয়দ্রথের পত্নীরা ভয়ে বিহ্বলা হয়েছিলেন। সেযুগে ক্ষত্রিয় নারীরা স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে যুদ্ধের সজ্জায় সজ্জিত করে রণক্ষেত্রে পাঠাতেন। আধুনিক কালের বাঙালী গৃহিণীরা যেমন স্বামীর বা পুত্রের সামান্য বিপদের সম্ভাবনাতেই তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপ করেন, তাদের বাড়ী ফিরতে সামান্য দেরী হলে ভয়ে চিন্তায় ভাবনায় সারা হয়ে ওঠেন, ভানুমতী ও দুঃশলাও প্রায় সেইরকম আচরণ করেছেন।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায়ও আধুনিক মনোভাব সুস্পষ্ট। মহাভারতে অর্জুনের বহু কার্যকলাপই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু অর্জুন দেবতার অবতার বলে' প্রাচীন কবি সবসময় তাঁর প্রশস্তিই করেছেন। আধুনিক যুগের কবি এই সংস্কার থেকে মুক্ত, তাই তিনি জনার উক্তির মধ্য দিয়ে অর্জুনের সমস্ত নিন্দনীয় কাজের প্রতি ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছেন।

'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে মহাভারত থেকে গৃহীত হলেও জাহ্নবী-চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যে আধুনিক মনের প্রভাব সুস্পষ্ট। আধুনিক সাহিত্যেই এই জাতীয়া উদাসীনা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, প্রাচীন সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্রের দেখা মেলে না। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে জাহ্নবীর সাদৃশ্যের কথা আমরা আগেই বলেছি। মধুসূদনের জাহ্নবী যেরকম বিনা দ্বিধায় এক মুহূর্তে শান্তনুর সঙ্গে পূর্ব-সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক সম্পর্কের সূচনা করতে চাইছেন, তেমনটি ব্যাস বা কাশীরাম দাসের মহাভারতে বর্ণিত হয়নি। মধুসূদনের জাহ্নবী বেশ জটিল চরিত্র, এই ধরনের চরিত্র আধুনিক উপন্যাসে স্থান পাবার উপযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের কমলা যেন অনেকটা জাহ্নবীর মত। রমেশের সঙ্গে বেশ কিছুকাল দাম্পত্য-জীবন যাপন করার পরে যখন কমলা জানল রমেশ তার স্বামী নয়, তখন রমেশকে সে এক মুহূর্তেই মন থেকে মুছে ফেলল, যেমন করে জাহ্নবী শান্তনুকে মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। দীর্ঘকাল একত্র বাস ও নিবিড়তম দৈহিক সান্নিধ্য লাভ করা সত্ত্বেও জাহ্নবী ও কমলা ব্যক্তি শান্তনু বা ব্যক্তি রমেশকে কণামাত্র ভালবাসতে পারেনি। রবীন্দ্র-নাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও যেন 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকার ক্ষীণ

প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ঠিক তেমনি 'নষ্টনীড়' গল্পে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার অনুরূপ সুর বেজেছে। রবীন্দ্রনাথের এই সব উপন্যাস ও গল্পে যে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রভাব পড়েছে, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কালের পটভূমিকায় লেখা গল্প-উপন্যাসে যে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তার অনেকখানি আভাস পৌরাণিক নারীদের নিয়ে লেখা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের মধ্যেও মেলে।

*

'বীরাঙ্গনা' কাব্য পাঠ করার পরে একটি কথা মনে জাগে। বাঙালী কবিদের মত এবং বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক লেখকদের মত মধুসূদনের রচনায়ও নারীরই একচ্ছত্র প্রাধান্য। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে যদি কারও চরিত্রে প্রাণের আভাস ফুটে থাকে, সে তিলোত্তমা। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' রাবণ ও মেঘনাদ সার্থক চরিত্র, কিন্তু সীতা ও প্রমীলা তাদের তুলনায় কম সার্থক বা জীবন্ত নয়। মধুসূদনের নাটকগুলিতে পুরুষচরিত্রের তুলনায় নারীচরিত্রই অপেক্ষাকৃত সার্থকভাবে ফুটেছে। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে এতগুলি দীপ্তিময়ী নারীর চরিত্র অঙ্কন করে মধুসূদন নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করেছেন যে পুরুষচরিত্রের চেয়ে নারীচরিত্র সৃষ্টিতেই তাঁর দক্ষতা বেশী।

মধুসূদনের নীতি-কবিতা

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার পরে মধুসূদন আর কোন বৃহৎ সৃষ্টি করতে পারেননি। বাইরের অশান্তি ও গোলযোগই তার জন্য দায়ী, কিন্তু মধুসূদনের সৃষ্টি-প্রতিভা যে অটুট ছিল, তার প্রমাণ মেলে তাঁর নীত কবিতাগুলির মধ্যে। মধুসূদনের কবিত্বের রশ্মি বাংলার বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যের নানা দিক্ আলো করেছে। কিন্তু বালকবালিকারাও যাতে সে আলোকের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না থাকে, তার জন্য তিনি তাদের জন্যে একটি নীতি কবিতাগুচ্ছ রচনায় হাত দেন, তাঁর সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু তার যা কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি তার থেকে আমাদের মনে হয়, দীর্ঘতর আয়ু পেলে মধুসূদন তখনকার বাংলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত ও অবহেলিত দিক্‌টির অভাব দূর করতে পারতেন এবং তাঁর পূর্ণশক্তি এইদিকে নিযুক্ত হলে বাংলা শিশু-সাহিত্যের প্রথম সার্থক স্রষ্টা হিসাবে তাঁরই নাম সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা হত।

সত্যিকার শিশু সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? তা শুধু শিশুদের কাছে উপভোগ্য ও সহজবোধ্য হলে চলবে না, তার মধ্যে প্রকৃত শিল্পলক্ষণও ফুটে ওঠা চাই। শিশুসাহিত্য একদিকে যেমন হবে শিশুদের উপযোগী, অপরদিকে তেমনি তাকে হতে হবে প্রকৃত সাহিত্য, যাতে বয়স্করাও তা পড়ে তার রস উপভোগ করতে পারেন। শুধুমাত্র সহজ এবং আদিরসবর্জিত হলেই কোন রচনা শিশুসাহিত্য হয় না, তার মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের বালসুলভ বর্ণনা থাকলেও শিশুসাহিত্য হয় না, তার জন্য শিল্পীর লোকোত্তর শক্তির স্পর্শ থাকা চাই।

মধুসূদনের নীতি-কবিতাগুলিতে এইসব গুণ আছে বলেই তারা পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডী অতিক্রম করে সার্বজনীন সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের Æshop's Fable-এর অনুবাদ 'কথামালা'র মধ্যেও সাহিত্যরস আছে, কিন্তু মধুসূদনের এই কবিতাগুলিতে যে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় আছে, তার তুলনা অন্যত্র বিরল। অথচ মধুসূদনের এই কবিতাগুলি সাহিত্য-রসিকদের কাছে আজ পর্যন্ত অবহেলিত হয়ে আছে। এদের বিশেষ কোন

সমালোচনা এ পর্যন্ত হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে এই অমূল্য কবিতাগুলির কিছু পরিচয় প্রদান এবং এদের বৈশিষ্ট্যের দিকে সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এই কবিতাগুলির মধ্যে 'কাক ও শৃগালী', 'অশ্ব ও কুরঙ্গ', 'গদা ও সদা', 'কুক্কুট ও মণি', 'পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু'—এদের আখ্যান বস্তু Æshop's Fable থেকে নেওয়া। 'ময়ূর ও গৌরী', 'মেঘ ও চাতক', 'সিংহ ও মশক'—এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু মধুসূদনের স্বকপোলকল্পিতও হতে পারে, আবার আগেকার দিনের প্রচলিত নীতি-উপাখ্যানের ছায়ায় পরিকল্পিতও হতে পারে। বাকী দুটি কবিতা—'দেবদৃষ্টি' এবং 'সূর্য ও মৈনাকগিরি'র পরিকল্পনার মধ্যে যে চমকপ্রদ অভিনবত্ব রয়েছে, তাতে এদের মধুসূদনের মত কবির নিজস্ব উদ্ভাবনা ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় না। কিন্তু বিষয়বস্তু যেমনই হোক আর যেখান থেকেই নেওয়া হোক, এদের পরিবেশ সৃষ্টিতে মধুসূদনের প্রতিভার সুস্পষ্ট নিদর্শন মেলে। রঙে রেখায় লাবণ্যে মাধুর্যে এই কবিতাগুলির পরিবেশ অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়, এইসব পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে দেশী। 'মেঘনাদবধকাব্যে'র মধ্যে যেমন মধুসূদন হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টন প্রভৃতি কবির কাব্যের প্রভাবকে সুকৌশলে আমাদের দেশীয় ভাবধারা ও দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন, এই কবিতাগুলিতেও তিনি ঠিক তেমনটি করেছেন। এর দৃষ্টান্ত, Æshop's Fable-এর I and We গল্পের অনামা পথিকদ্বয় মধুসূদনের হাতে পড়ে 'গদা' ও 'সদার' রূপ লাভ করেছে। Æshop-এর The Crow and the Jackal গল্পটি অবলম্বনে রচিত 'কাক ও শৃগালী' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এর কতকাংশ নীচে উদ্ধৃত করছি।

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হৃষ্ট-মনে ;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে ;—
"অপরূপ রূপ তব, মরি !

তুমি কিগো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা ?—কহ গুণমণি !
হে নব নীরদ-কান্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি,
যুড়াও এ কান দুটি করি বেণু ধ্বনি !
পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি !
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি ; কি ছার যুবতী ?
গাও গীত গাও, সখে করি এ মিনতি !

মধুসূদনের পরিবেশসৃজননৈপুণ্য সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত মন্তব্য করেছি তাদের যাথার্থ্য উদ্ধৃত অংশটি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে।

মধুসূদনের স্বল্পায়তনের মধ্যে গভীর ভাবপ্রকাশের শক্তি যেমন ছিল, খুব কম কবির মধ্যে তেমনটি দেখা যায়। এই শক্তির পরিচয় মধুসূদনের নীতি-কবিতাগুলিতেও পাওয়া যায়, একটি অপূর্ব ক্লাসিকাল সংযম এদের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত প্রথা অনুসারে গল্পের নীতিটিও মধুসূদন কবিতার উপসংহারে দিয়েছেন, কিন্তু তাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে সুকৌশলে এমনভাবে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন যে বিচ্ছিন্ন বা প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে তাকে মনে হয় না।

বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদন নানা অভিনব পরীক্ষা করেছেন এবং নিজের শক্তির বলে তাতে সফল হয়েছেন। 'অশ্ব ও কুরঙ্গ' নামক নীতি-কবিতাটিতে তাঁর নতুন এক ধরনের স্তবক সৃষ্টির মনোরম দৃষ্টান্ত মেলে।

অশ্ব, নবদুর্ব্বাময় দেশে, বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দুর্ব্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল ;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি

নানা ক্লেশ আর অভাব-অভিযোগের মধ্যেও মধুসূদনের পরিহাসরসিকতা যে অম্লান উজ্জ্বল ছিল, এই নীতি-কবিতাগুলি তার পরিচয় বহন করেছে।

'মেঘনাদবধকাব্যে' তিনি যে রামলক্ষ্মণকে ছোট করে রাবণ-মেঘনাদকে বড করেছিলেন, 'সিংহ ও মশক' কবিতায তিনি তা নিযে ব্যঙ্গ করেছেন ; এই কবিতায সিংহ মশককে বলছে,

গুপ্তভাবে কি জন্য লডাই ?—,
সম্মুখ-সমব কব ; তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প-চূর,
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয ডালি,
দিযাছে এ দেশে কবি।

প্রকৃত রসিকের লক্ষণ এই যে তিনি সব কিছু নিযেই পরিহাস করেন, নিজেকেও বাদ দেন না।

'মেঘনাদবধকাব্যে'র মেঘনাদ অলৌকিক শৌর্যশালী সর্বগুণান্বিত রাজপুত্র। তিনি যে মেঘের আডাল থেকে যুদ্ধ কবে নীতিধর্মাননুমোদিত কাজ করেছিলেন, 'মেঘনাদবধে' তার কোন উল্লেখ নেই। এই কবিতায কিন্তু কবি তা বলেছেন, মশকের সঙ্গে অদৃশ্যচাবী মেঘনাদের উপমা দযে,

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তারে মারিতে না পায,
ভযঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায,
জর-জরি শ্রীবামের কটক লঙ্কায।

এই কবিতাগুলির মধ্যে 'দেবদৃষ্টি' কবিতাটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কবিতাটি অসম্পূর্ণ হলেও এর মধ্যে কবির মৌলিক অনুভূতি ও ভূযোদর্শনের যে উজ্জ্বল নিদর্শন মেলে তার তুলনা বিরল। কবিতাটির বিষযবস্তু সংক্ষেপে এই। শচী ও ইন্দ্র চিত্ররথকে সঙ্গে নিযে "স্বর্ণমেঘাসনে' চডে বিশ্বদর্শনে বেরিয়েছেন। নানা দেশ ঘুরে তাঁরা অবশেষে বাংলাদেশে এসে হাজির হলেন। "এ কোন্ দেশ" শচী জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র তাঁর কাছে বাংলাদেশের উজ্জ্বল গরিমাপূর্ণ বিবরণ

দিতে লাগলেন। এমন সময় নীচে প্রচণ্ড শব্দ উঠলে শচী ভয় পেয়ে প্রশ্ন করলেন,

নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা?

তখন

চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে শুন ত্রিদিব ঈশ্বরি।
'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে।'

এর মধ্যে যে অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে, তা বলে বোঝাবার নয়, অনুভবসাপেক্ষ। এইরকম চমৎকার anti-climax-এর মধ্য দিয়ে কৌতুক সৃষ্টি করা, সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় চরিত্রের হাস্যকর দিকের প্রতি সুকৌশলে অঙ্গুলি নির্দেশ করা, এ কেবল শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই সম্ভব। কবিতাটি সম্পূর্ণ না হলেও এর রস পরিস্ফুটন সম্পূর্ণ হয়েছে। এর শেষ দু'ছত্রও বেশ সঙ্কেতপূর্ণ,

সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

কবির নয়ন-কিরণ এমনিভাবে ঊর্ধ্বজগতের ভাবলোক থেকে নেমে এসে নীচের বাস্তবজগতের উপর পড়ে কৌতুক রসের সংগোপন নির্ঝরটিকে আবিষ্কার করেছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুইট ইণ্ডিয়া' নামক প্রসিদ্ধ হাসির গল্পটির বিষয়বস্তুর লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য আছে। অবশ্য বিভূতিভূষণ মধুসূদনের কবিতা থেকে এই গল্পটির প্রেরণা পেয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই দিকটি নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করার প্রথম কৃতিত্ব মধুসূদনেরই।

এই নীতি-কবিতাগুচ্ছের অপর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সূর্য ও মৈনাকগিরি'র রস কিন্তু ভিন্ন। এর মধ্যে কবির নিজের জীবনের বেদনা ও ক্ষোভ উন্মুক্ত হাহাকারে ফেটে পড়েছে। সূর্য যখন প্রথম আকাশে উঠেছিল, মৈনাক-

গিরি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। আত্মশক্তিবিশ্বাসী দাম্ভিক সূর্য সে অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করল। তারপর সূর্য মধ্যগগনে উঠল, সারা জগৎ তার তাপে অস্থির, "কমলিনী কেবল হাসিল"। ("কমলিনী" এখানে সুদিনের বন্ধুর প্রতীক।) কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সূর্যের পতন সুরু হল। রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে ম্লান রবি অস্তাচলের কোলে ঢলে পড়ল। তখন সে আবার মৈনাককে সাহায্য করবার জন্যে কাতরকণ্ঠে আবেদন জানাল, কিন্তু এবার আর মৈনাকের দয়া হল না।

নিজের ব্যথা এবং ব্যর্থতাকে এরকম তীব্র ও মর্মস্পর্শী করে মধুসূদন আর কোথাও রূপ দেননি। তার 'আত্মবিলাপ' কবিতায় অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'আত্মবিলাপ' রচনার সময় কবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া সে সময় তিনি নিজের জীবনের ট্র্যাজেডি অস্ফুটভাবে উপলব্ধি করছিলেন, তখনও তাঁর আর্থিক স্বাচ্ছল্য লুপ্ত হয়নি। আর 'সূর্য ও মৈনাকগিরি' লেখবার সময় কবি দুঃখ-দারিদ্র্য-নৈরাশ্য-ব্যর্থতার কালকূট গলাধঃকরণ করেছেন, তখন তাঁর সম্পদের সপ্তডিঙা ডুবে গেছে, অন্তহীন ব্যর্থতার বালুচরে তিনি বসে আছেন। এই কবিতায় তারই হাহাকার আমরা শুনতে পাচ্ছি। এমন কি এর শেষ অংশে কবি তপন ও মৈনাকের বেনামী ত্যাগ করে স্পষ্টভাবেই নিজের কথা বলেছেন,

> রমার থাকিলে কৃপা সবে ভালবাসে;
> কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে, হাস যদি, হাসে
> ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
> সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

কবির মানসিক অশান্তির দরুণ এই নীতি-কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি ভাষাগত ও ছন্দোগত ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও দু' অক্ষর বেশী হওয়ায় ছন্দোপতন হয়েছে, যেমন 'অশ্ব ও কুরঙ্গ' কবিতার

> উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
> রঙ্গে শুয়ে তরুতলে; দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে;
> তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
> ভীম হেষা গগনে উঠিল।

এই অংশের দ্বিতীয় ছত্রে উল্লিখিত দোষ ঘটেছে। কোথাও কোথাও আবার

অত্যন্ত সংক্ষেপে অনেকখানি ভাব প্রকাশ করতে যাওয়ায় সবটাই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কবির অসাবধানতার দরুণ 'গদা ও সদা' কবিতাটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কবি একবার বলেছেন, গদা টাকার থলে কুড়িয়ে পেল, পরক্ষণেই বলেছেন, গদা টাকার ভাগ চাইতে সদা উত্তর দিল, "আমি এ টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি, এ টাকা আমার"।

আসলে

দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।

এখানে "গদার" জায়গায় "সদা" হবে।

সেইরকম "শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণ-লীলা।

এখানে 'বিষ্ণু'র জায়গায় 'জিষ্ণু' হবে। অবশ্য এইসব স্থানে প্রথম মুদ্রণের সময় থেকে মুদ্রাকর প্রমাদ হয়ে আসছে, এখনও হতে পারে।

রামায়ণ মহাভারতের স্থানোপযোগী উপমাগুলি এই কবিতাগুলির সৌন্দয বৃদ্ধি করছে। মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যের মত এদের মধ্যেও কবির রামায়ণ-মহাভারত-প্রীতির অজস্র পরিচয় সমাকীর্ণ হয়ে আছে।

মোটের উপর এই নীতি-কবিতাগুলি রোগ-দারিদ্র্য-চিন্তার ভারে জর্জরিত কবির অযত্ন-সৃষ্ট রচনা হলেও এদের মধ্যে যে প্রতিভার স্পর্শ রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার তখনকার রিক্ত শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারে মধুসূদনের এই সামান্য দান মুষ্টিভিক্ষা হলেও স্বর্ণমুষ্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা বাস্তবধর্মী নাটক ঃ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'

সাহিত্য মানুষের এত প্রিয় কেন ? তার কারণ সাহিত্য মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানব-জীবনের গভীর অন্তর্লোকের রসসম্পুট থেকে সাহিত্য তার প্রাণশক্তি আহরণ করে। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্যই সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টট্ল্ সাহিত্যকে জীবনের অনুকরণ বলে অভিহিত করেছিলেন।

সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিব মধ্যে আবার নাটকের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী, তার কারণ নাটক দৃশ্যকাব্য। তার কাজ গতিমান্ মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবিকে অভিনযকলার মাধ্যমে দর্শকদের চোখের সামনে মূর্ত করে তোলা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখারও মুখ্য উপাদান জীবন; কিন্তু তাদের মধ্যে লেখকই জীবনলীলার বর্ণনা দেন। আর নাটক মানুষের জীবনে যা ঘটছে বা একদিন ঘটেছে অথবা কোনদিন ঘটতে পাবত. এমন ব্যাপারগুলিকে তাদের প্রবাহিত রূপে, ঘটনাগত অবস্থায ও চরিত্রগত বাক্যে-কার্যে প্রত্যক্ষের মত প্রদর্শন করে। সুতরাং অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যের তুলনায নাটকের মধ্যে অনেক বেশী বাস্তবধর্মিতা থাকা চাই।

এই দিক দিযে বিচার কবলে সব নাটকই কমবেশী পরিমাণে বাস্তবধর্মী। কিন্তু বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী নাটক তাদেরই বলা হয, যাদেব উপাদান মানুষের বাস্তব জীবন থেকেই পরিপূর্ণভাবে সংগ্রহ করা হয়। অন্যান্য নাটকে নাট্যকার কোথাও কোথাও কল্পনার আশ্রয় নিযে মাযাজগৎ রচনা করেন, কিন্তু এইসব নাটকে কি কাহিনী-নির্বাচন, কি ঘটনা-সংস্থান, কি চরিত্র-চিত্রণ, কি সংলাপ—কোথাও তিনি বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করেন না।

বাংলা সাহিত্যে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবধর্মী নাটকের নিদর্শন খুব বেশী মেলে না। এদিক দিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলিকে কতকটা প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। তাঁর অধিকাংশ নাটকেরই বিষয়বস্তু বাস্তব জীবনের পৃষ্ঠা থেকে আহরিত। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করেছেন। দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি এবং ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তার ভাবভঙ্গী ও ভাষা আত্মসাৎ করবার

শক্তি ছিল। তাঁর নাটকগুলিতে আমরা তারই নিদর্শন পাই। এদের মধ্যে সবচেয়ে বাস্তবধর্মী নাটক 'নীলদর্পণ'। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 'নীলদর্পণ' নাটকের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কতখানি বাস্তবধর্মিতা রয়েছে তার বিচার করব এবং এই বাস্তবধর্মিতা সবক্ষেত্রে শিল্পোচিত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

'নীলদর্পণে'র মধ্যে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাংলাদেশে নীলকরদের অত্যাচারের একটি আলেখ্য পাই। দীনবন্ধু কয়েকটি প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কতকগুলি সম্ভাব্য ঘটনার সুসমঞ্জস সংযোগ ঘটিয়ে এই নাটকের কাহিনীটি রচনা করেছেন। এই বিশ্বাস্য ও মর্মস্পর্শী কাহিনীর মধ্য দিয়ে দীনবন্ধু নীলকরদের পীড়নে জর্জরিত বাংলার গ্রামাঞ্চলের ভদ্র-গৃহস্থ ও কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনের দুঃখকষ্টকে অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে রূপায়িত করেছেন।

'নীলদর্পণ' নাটকে যে সমস্ত ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বাস্তবতার মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে একটি ঘটনার রূপায়ণে নাট্যকার অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেই ঘটনাটি হচ্ছে গ্রাম্য-নারী ক্ষেত্রমণির প্রতি লম্পট নীলকর রোগের অত্যাচার। 'নীলদর্পণ'-এর তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে স্বল্প পরিসরের মধ্যে দীনবন্ধু এই অত্যাচার এবং এর ফলে অসহায়া নারীর অবস্থাসঙ্কট যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে। নৃশংস হিংস্র জন্তুর আক্রমণে যেমন শশকশিশু তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আত্মরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা করে, তেমনি এই দৃশ্যে অবলা গ্রাম্য-নারী ক্ষেত্রমণি লম্পটের নৃশংস লালসার নাগপাশজাল থেকে মুক্তি পাবার আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছে। এই দৃশ্যটি দীনবন্ধুর সৃষ্টিকুশলতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কিন্তু নাট্যকার 'নীলদর্পণ'-এর অন্যান্য ঘটনার রূপায়ণে অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। বরং কতকগুলি ঘটনার অতিরিক্ত বাস্তবতা নাটকের রসসিদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে, যেমন গ্রাম্য প্রজাদের উপর উডের জুলুমের দৃশ্যগুলি। এদের মধ্যে আমরা নগ্ন নৃশংসতার বাস্তব চিত্র পাই। কিন্তু এতখানি নৃশংসতা নাটকের পাঠক-দর্শকেরা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এই নৃশংসতাকে নাটকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হলে মাঝে মাঝে dramatic relief দেবার দরকার হয়। নাট্যকার তা দেননি বলে বাস্তবতা এখানে রসে পরিণত হয়নি।

বাস্তবধর্মী নাটক হিসাবে 'নীলদর্পণ'-এর ত্রুটিবিচ্যুতি অল্প নয়। এখানে আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকররা কীভাবে প্রজাদের উপর জুলুম করে নীল চাষ করাত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত, তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা নাটকটিকে বাস্তবধর্মী করে তুলতে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সম্বন্ধে এত বেশী তথ্য নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে স্থানে স্থানে আমাদের সন্দেহ হয় নাটক পড়ছি না প্রবন্ধ পড়ছি। মাত্রাতিরিক্ত তথ্যের সন্নিবেশ এই নাটকের শিল্পোৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ করেছে।

এই নাটকের শেষদিকে যেভাবে পরপর চারটি মৃত্যু দেখানো হয়েছে, তা নাটকের শিল্পগুণকে যেমন খর্ব করেছে, তেমনি বাস্তবতার মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ করেছে। এক ক্ষেত্রমণি ছাড়া আর সকলেরই মৃত্যু এসেছে নিতান্ত আকস্মিকভাবে।

সরলতা ও সাবিত্রীর মৃত্যুতে বিন্দুমাধবের প্রতিক্রিয়া নাটকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তার মধ্যেও বাস্তবতার কণামাত্র মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। বিন্দু-মাধব তার এই হৃদয়বিদারক শোকের মুহূর্তে প্রথমে প্রায় নির্বিকারভাবে বলেছে, "ও কি আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি" এবং "যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল। মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল।" তারপর সে সংস্কৃতশব্দবহুল সাধুভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছে এবং পয়ার ছন্দে একটি ছত্রিশ চরণের কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করেছে।

এখন 'নীলদর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলি কতখানি সার্থক ও বাস্তবধর্মী হয়েছে, তার বিচার করা যাক। এই নাটকের চরিত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে,—(ক) ইংরেজ-চরিত্র, (খ) ভদ্র বাঙালী-চরিত্র এবং (গ) ভদ্রেতর বাঙালী-চরিত্র। এদের মধ্যে ইংরেজদের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার খুব বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। অত্যাচারী নীলকর উড এবং তার সহকারী রোগ—এরা যেন দুটি রাক্ষস। এদের নৃশংস আচরণ আমাদের মনে ক্রোধ ও ঘৃণা জাগ্রত করে। এদের মধ্যে মানবতার প্রায় কোন নিদর্শনই মেলে না। কেবল এক জায়গায় রোগের একটি উক্তিতে নির্বাপিত মনুষ্যত্বের ভস্মাবশেষের মধ্যে অল্প একটু স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, সেখানে সে বলেছে,

"আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে ২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা

দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইযাছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেযে মানুষকে নিদ্দম করিযা রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে ২ খানা খাই—"

রোগের সঙ্গে উডের চরিত্রের পার্থক্য নাট্যকার ফুটিযে তুলেছেন। রোগ লম্পট। কিন্তু উড লাম্পট্যের ঘোরতর বিরোধী। তবে রোগ একদিক দিযে উডের চাইতে ভাল। রোগ যে কাজ করে তা যে মন্দ সে বোধ তার আছে। কিন্তু উডের সেটুকুও নেই। উড এবং রোগ অত্যাচারী রাক্ষস হলেও তাদের রসবোধ আছে। তাই তারা নিজেদের চাবুকের মজার মজার নাম রেখেছে; উডের চাবুকের নাম 'শ্যামচাঁদ' আর রোগের চাবুকের নাম 'রামকান্ত'।

যাহোক্, 'নীলদর্পণ' নাটকের সাহেব-চরিত্রগুলির মধ্যে মানবতার বিশেষ কোন লক্ষণ না থাকার জন্য তাদের পুরোপুরি বাস্তবধর্মী চরিত্র বলা যায না। কিন্তু বাঙালী চরিত্রগুলি সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা চলে না। ভদ্র ও ভদ্রেতর—দুই শ্রেণীর বাঙালীরই চরিত্রের পরিকল্পনায় দীনবন্ধু বাস্তবতার প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচয দিযেছেন। দোষেগুণে তাদের মধ্যে কেউই average-এর গণ্ডী অতিক্রম করেনি। এই নাটকের ভদ্র চরিত্রের মধ্যে গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্রই প্রধান। এদের কাউকেই নাট্যকার অবিমিশ্র আদর্শবাদের প্রতীক বানিযে মানুষ থেকে দেবতার পর্যাযে উন্নীত করেননি। গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য নবীনমাধবের একটা আদর্শগত প্রেরণা আছে বটে, কিন্তু বিশেষভাবে আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিই তাঁকে নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধে অনুপ্রাণিত করেছে। গোলোক-চন্দ্রের মধ্যে আমরা কেবল আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিরই নিদর্শন পাই। গোলোকচন্দ্র ও নবীনমাধব গ্রাম ছেড়ে চলে গিযে নীলকরদের অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পাবার পরিকল্পনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। একদিকে মনুষ্যত্ববোধ এবং অপরদিকে স্বার্থপরতার সমাবেশে তাঁদের চরিত্র স্বাভাবিক হযে উঠেছে। অন্যান্য ভদ্রচরিত্রগুলি গতানুগতিক, তবে সাবিত্রীর উন্মত্ততার চিত্রটি বেশ স্বাভাবিক হযেছে এবং কবিরাজের চরিত্রটি অত্যন্ত গৌণ হলেও বেশ জীবন্ত হযেছে, রোগীর অন্তিম সমযেও তিনি যেভাবে রোগের গুরুত্ব লাঘব করে আত্মীয়দের আশ্বাস দিয়েছেন—তা বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

ভদ্রেতর চরিত্রের মধ্যে তোরাপই প্রধান। তোরাপকে নাটকের তিনটি মাত্র দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু তার মত জীবন্ত চরিত্র এই নাটকে আর নেই বলা চলে। তোরাপ চরিত্র সম্পূর্ণভাবে বাস্তবধর্মী। তার মধ্যে মহত্ত্ব আছে, কিন্তু সেই মহত্ত্বকে কোথাও অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়নি। তোরাপের বলিষ্ঠতা সহজ স্বাভাবিক বন্য বলিষ্ঠতা। তার কোন আচরণ সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসগ্রাহ্যতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি। সে যুক্তিবিচার করে কাজ করে না, যা সে ভাল মনে করে তাতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তোরাপ অপরকে বাঁচাতে গিয়ে আত্মোৎসর্গ করে' অতিমানবের পর্যায়ে উন্নীত হবার চেষ্টা করেনি। তার মধ্যে আমরা যেমন প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও পরোপচিকীর্ষার নিদর্শন পাই, তেমনি আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিরও নিদর্শন পাই। তোরাপের পরেই গোপীনাথের চরিত্র সবচেয়ে জীবন্ত। সে নীলকর সাহেবদের দেওয়ান। তাদের আদেশপালন ও মনোরঞ্জন করা ভিন্ন তার অন্য কোন উপায় নেই। তা করতে গিয়ে তাকে অম্লানবদনে নানা গর্হিত কাজ করতে হয়। কিন্তু তার জন্য তার মনে সত্যকার অনুতাপও হয় এবং সে মাঝে মাঝে নিজের লাঞ্ছনার ঝুঁকি নিয়েও সাহেবদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে সৎপথে আনবার চেষ্টা করে। এ ছাড়া স্বৈরিণী ও কুট্টিনী পদী ময়রাণী, অসহায়া গ্রাম্য নারী ক্ষেত্রমণি, অজ্ঞ রায়তবৃন্দ—এদের চরিত্রের পরিকল্পনা ও রূপায়ণেও নাট্যকারের বাস্তববোধ ও সৃষ্টিকুশলতার নিদর্শন পাই। 'নীলদর্পণ' নাটকের চরিত্রচিত্রণেব মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকের অনেক জায়গায় দীনবন্ধু পরোক্ষ উক্তি ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল করে তুলেছেন। গোলোকচন্দ্র সম্বন্ধে নবীনমাধবের উক্তি—"পিতা আমার অতি নিরীহ ....ফৌজদারির নামে কম্পিত হন" এবং সাবিত্রীর স্বগতোক্তি—"কর্তা আমার ঘরবাসী মানুষ....... তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না"—এগুলির মধ্য দিয়ে গোলোকচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ইতর চরিত্র-গুলির দু'একটি উক্তির মধ্য দিযে নাট্যকার তাদের রক্তমাংসে জীবন্ত করে তুলেছেন। তোরাপের অনেক কথা তার সহজ বলিষ্ঠ পৌরুষকে প্রত্যক্ষের মত ফুটিয়ে তুলেছে। যেমন দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে তার এই উক্তিটি— "দুত্তোর প্যারোকের মার প্যাট করো, লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে।" এই গর্ভাঙ্কেই দুটি রায়তের কথোপকথনের সময় তাদের দু'জনের

মন্তব্যের মধ্য দিয়ে দীনবন্ধু তাদের প্রকৃতিকে যে রকম সহজ ও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার নিদর্শন মেলে। প্রথম রায়তের সাহেবের বুটের খোঁচা খেযেও তার স্বপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসে সাহেবের উদ্দেশ্যে মৃদু একটা গালি ("গোডার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর") দিযে মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা তার অবস্থানুযাযী বুদ্ধি এবং পশুবৎ মূক সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয; কিন্তু তার উত্তরে দ্বিতীয রাযতের "প্যারেকের খোঁচা—সাহেবরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে?'—এই মন্তব্যটি তার নিরতিশয় নির্বোধ সরল হতভম্ব মনটিকে আমাদের সামনে একেবারে উন্মুক্ত করে মেলে ধরে। পদী মযরাণী অধঃপতনের শেষ সীমায পৌঁছোলেও আত্মাপরাধজ্ঞান ও মানীলোকের মর্যাদাবোধ একেবারে হারায়নি। পথে নবীন-মাধবের সামনে পডলে সে ঘোমটা টেনে দিযে বলে,—"ও মা কি লজ্জা! বডবাবুকে মুখখানা দেখালাম।" এইভাবে দীনবন্ধু এই নীচ ও ঘৃণ্য চরিত্রেও মানবতার স্ফুরণ দেখিযেছেন। ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে তার মা-র এই খেদোক্তির মধ্যেও নাট্যকারের বাস্তবতাবোধের সমুজ্জ্বল প্রমাণ মেলে,—"মুই সোনার নক্কি ভেস্‌যে দিতি পারবো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে" —এই উক্তির সর্বশেষ বাক্যটি দীনবন্ধুর স্থান-কাল-পাত্র-কল্পনা এবং সহানুভব-শক্তির পরিচয দিচ্ছে।

এইভাবে বিচিত্র কৌশলে বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল করে তোলায দীনবন্ধু নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন সত্য, কিন্তু নাটকে এরকম কৌশলের প্রযোগ-ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সংলাপ রচনায সাফল্যলাভের উপরেই চরিত্র-চিত্রণের তথা সমগ্র নাটকের সার্থকতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। দীনবন্ধু চরিত্র পরি-কল্পনায় যে বাস্তবজ্ঞানের পরিচয দিয়েছেন, তাদের মুখে ভাষা দেবার সময় তার থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন। 'নীলদর্পণ'-এর ভদ্র চরিত্রগুলির ভাষা সংস্কৃত-শব্দবহুল অলঙ্কারপূর্ণ সাধু ভাষা। এই ভাষা অত্যন্ত আডষ্ট ও অস্বাভাবিক এবং নাটকের সংলাপের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কোন কোন চরিত্রকে দিয়ে এমন কি বালিকা বধূ সরলতাকে দিযেও নাট্যকার সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়েছেন। এ ব্যাপার শুধু অশোভন হয়নি, বিরক্তিকর হয়েছে। এক মধুসূদন ছাডা দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী সমস্ত বাঙ্গালী নাট্যকারই ভদ্র চরিত্রের সংলাপ এই জাতীয় ভাষায় রচনা করে গিয়েছেন। 'নীলদর্পণ'-এ

দীনবন্ধু তাঁদেরই অনুসরণ করায় এই নাটকের উৎকর্ষ বিশেষভাবে খর্ব হয়েছে।

ভদ্রেতর চরিত্রগুলির সংলাপকে আবার দীনবন্ধু কোন রকম পূর্বসংস্কার না থাকায় অতি মাত্রায় বাস্তবধর্মী করে তুলেছেন। যশোহর জেলার চাষী-মজুর শ্রেণীর নরনারী যে ভাষায় কথা বলে 'নীলদর্পণ'-এর ঐ শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপে দীনবন্ধু হুবহু সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এতখানি প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে পাংক্তেয় হবার যোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে। আর্ট সৃষ্টির উপকরণ বাস্তবের রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদ-মজ্জা-সমেত সমগ্র কলেবর নয়, শুধু তার ভঙ্গীটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর্টকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তব করে তোলার চেষ্টা করলে তার শিল্পসৌকুমার্য-ই নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব আর্টের মধ্যে বাস্তবধর্মিতা আনতে হলে তাতে বাস্তবতার অল্প আভাস মাত্র দিতে হবে। তার বেশী দিলে চলবে না। 'নীলদর্পণ'-এর চাষী মজুর চরিত্রের ভাষায় যদি এই আদর্শ অনুসৃত হত, তাদের সংলাপকে অবিকলভাবে বাস্তবানুগ করে না তুলে তার মধ্যে যদি যশোহর জেলার কথ্যভাষার একটু রেশ মাত্র রাখা হত, তাহলে তা একদিকে যেমন বাস্তবধর্মী হত, অন্যদিকে তেমনি তা সকলের বোধগম্য হয়ে সবজনোপভোগ্য রস উদ্রেকে সমর্থ হত। কিন্তু যে ভাষা এইসব চরিত্রের মুখে দেওয়া হয়েছে, তা নাটকের ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে একান্তই অচল ; কারণ অভিনয়ের সময়ে শোনামাত্র সংলাপের অর্থবোধ না হলে অভিনয় উপভোগ করা যায় না।

এই কারণে একদিকে অতিকৃত্রিম ভাষা, অপর দিকে অতিস্বাভাবিক ভাষার মাঝখানে পড়ে 'নীলদর্পণ'-এর সংলাপ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু হাস্যরসের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর সহজাত অধিকার ছিল বলে 'নীলদর্পণ' নাটকে যেখানে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে দীনবন্ধু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সেখানকার সংলাপগুলিও স্বাভাবিক হয়েছে। 'নীলদর্পণ'-এর সংলাপের ভাষার একটি মহাদোষ এই যে, তার মধ্যে দীনবন্ধু অনেক স্থানে "বাস্তবতার" খাতিরে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন, অশ্লীল রসিকতার নিদর্শনও এই নাটকে কয়েকটি মেলে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বাস্তবতা-প্রীতির কারণ নির্দেশ করেছেন তাঁর সহানুভূতির আধিক্য। তিনি বলেছেন, "যাহার সঙ্গে তাঁহার (দীনবন্ধুর) সহানুভূতি, যাহার

চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ-সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; কেননা, তিনি সহানুভূতির অধীন—সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে।" কিন্তু অমিশ্র বাস্তব কখনও শিল্প-সৃষ্টির উপাদান হতে পারে না। শিল্প-স্রষ্টাকে নিজের প্রযোজন অনুযাযী তার পরিবর্তন সাধন করতেই হয। সহানুভূতি নাট্যকারের বিশিষ্ট ধর্ম হলেও তার আত্যন্তিকতা যে কখনও কখনও তাঁর শিল্প-প্রেরণাকে আচ্ছাদিত করে দেয, দীনবন্ধুর এই সুপ্রসিদ্ধ নাটকটিতে তারই নিদর্শন মেলে। আমরা এই নাটকটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই বাধ্য হই যে, "যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাতে যে রস · দীনবন্ধু সেই রসের রসিক" (ডঃ সুশীলকুমার দে)। কিন্তু সেই রসকে চিরস্থাযী করে রাখতে যে আধারের প্রযোজন, তার নির্মাণকৌশল-অভিজ্ঞ সুদক্ষ ভাস্কর তিনি নন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বহুদিন ধরে একটি প্রশ্ন আমার মনকে ক্রমাগত আন্দোলিত করে এসেছে—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি? বিভিন্ন সমালোচক এ সম্বন্ধে যে সমস্ত মত ব্যক্ত করেছেন, তাদেব মধ্যে অনৈক্য এত বেশি যে সেগুলির ভিতর থেকে কোন আলোক পাইনি। সেইজন্য আজ একবার নিজের স্বল্পপরিমিত শক্তি নিয়েই আমি এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে সুরুতেই নিরুৎসাহিত করে দেবার মত একটি প্রবল যুক্তি আছে। সাহিত্যরসের আস্বাদন সবত্রই আস্বাদকের রুচির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিভিন্ন সমালোচক তাঁদেব রুচি অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলবেন, এতে আপত্তিব কী থাকতে পারে আর এ প্রশ্ন নিয়ে বিচারেরই বা অবকাশ কোথায়? এর উত্তরে সবিনয়ে শুধু এই কথাই বলব, "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'—সে সম্বন্ধে কোনও সংশয় না থাকলেও সাহিত্য-সমালোচনায় সমালোচকের রুচিই একমাত্র কথা নয়। সাহিত্য-বিচারের কতকগুলি সর্বজনস্বীকৃত বস্তুগত মানদণ্ডও আছে। সেই মানদণ্ডগুলি প্রয়োগ করে বিভিন্ন রচনার তুলনামূলক বিচার করলে তাদের আপেক্ষিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা অর্জন করা অসম্ভব নাও হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এইভাবেই আলোচনায় অগ্রসর হব এবং মহাজন-পন্থা অনুসরণ করে "নেতি" "নেতি" করেই লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টা করব।

কতকগুলি রচনাকে বিচারের প্রথমেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। যেমন 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরীয', 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয' রূপকথা-ধর্মী আখ্যায়িকা—যাদও 'রাধারাণী' আধুনিক কালের এবং 'যুগলাঙ্গুরীয' প্রাচীন কালের পটভূমিকায় লেখা। এই দুটি ক্ষুদ্র উপন্যাসে লেখকের শক্তির পরিচয় প্রায় কিছুই পাওয়া যায না, 'রাধারাণী'তে বরং কতকগুলি উৎকট অসঙ্গতি প্রকট হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এবং একজন তরুণ লেখকের রচনা হিসাবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিণত ও সার্থক শিল্পকৌশলের নিদর্শন তার মধ্যে মেলে না। এই বইতে দেখি, সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে বারবার কাহিনীর মোড় ফিরছে, একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে

বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে পূর্ব-সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, নবাবের কন্যা একজন অপরিচিত হিন্দুকে সেবা করতে গিয়ে ভালবেসে ফেলছেন এবং সেই কথা তারস্বরে ভৃত্যদের সামনে ঘোষণা করছেন, অজস্র প্রহরীর মাঝখানে কৎলু খাঁকে একজন রমণী অনায়াসে হত্যা করে পালিয়ে যাচ্ছেন। ভাঁড়ামি, জ্যোতিষ-গণনা, হত্যাকাণ্ড, দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রভৃতি মুখরোচক উপাদানকে এ বইয়ে যত্রতত্র প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, তার মধ্যে কোন চরিত্রই জীবন্ত হয়নি।

'মৃণালিনী', 'রজনী' এবং 'দেবী চৌধুরাণী'—এই তিনখানি উপন্যাসের নামও বর্তমান প্রসঙ্গের বিচারে উঠতে পারে না। 'মৃণালিনী'তে লেখকের শক্তির খুব বেশী পরিচয় নেই। এর নায়ক হেমচন্দ্র নিতান্তই অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে তৈরী করা সর্বগুণান্বিত নায়ক, তার মধ্যে কোন প্রাণস্পন্দনের পরিচয় মেলে না; হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমও নিতান্ত গতানুগতিক, ছকে বাঁধা, বৈশিষ্ট্যবর্জিত প্রেম। এই প্রেমকে বিবাহোত্তর প্রেম হিসাবে উপস্থাপিত করায় এর মধ্যে রোমান্সের আবহাওয়া একেবারেই ফুটে উঠতে পারেনি।* মনোরমার জটিল চরিত্র এবং পশুপতির চক্রান্ত, দেশদ্রোহিতা ও পরিণামে আশাভঙ্গ লেখক যেভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন, তার মধ্যে কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বৃদ্ধ জগন্নাথের বধিরতার চিত্রও বেশ কৌতুকপূর্ণ করে আঁকা হয়েছে। কিন্তু এগুলি উপন্যাসের গৌণ বিষয়। উপন্যাসের মূল প্রসঙ্গ অর্থাৎ নায়কনায়িকার প্রসঙ্গটি যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, তাতে লেখকের ব্যর্থতারই স্বাক্ষর রয়ে গেছে। এই মূলগত ত্রুটি সত্ত্বেও 'মৃণালিনী' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হতে পারত, যদি তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তোলা হত। 'মৃণালিনী'র প্রথম সংস্করণে লেখক সে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ঐ সংস্করণের প্রথম দুই পরিচ্ছেদে মুসলমানদের রাজধানী দিল্লীর পরিবেশ, মুসলমানদের বিজয় উৎসব এবং হাতীর সঙ্গে বখ্‌তিয়ার খিলিজীর লড়াই প্রভৃতি বর্ণনা করেছিলেন, এই সমস্ত বর্ণনা অনেকাংশে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকেই নেওয়া। পশুপতি চরিত্রের নামকরণেও তিনি ইতিহাসের

*বাঙ্গালী মেয়েদের সেযুগে প্রেমে পড়ার বয়স হবার আগেই বিবাহ হত। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা এবং অন্ধ তরুণী রজনী ছাড়া আর কোন নারীর প্রাক্-বিবাহ প্রেমের বর্ণনা দেননি।

সাহায্য নিয়েছিলেন বলে মনে হয়, ঐ সময়ে পশুপতি নামে গৌড়রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্যিই বর্তমান ছিলেন, তিনি ছিলেন হলায়ুধ মিশ্রের ভ্রাতা, অবশ্য তিনি বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে সাহায্য করেছিলেন বলে ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু এটুকু কল্পনা করবার অধিকার ঔপন্যাসিকের আছে। 'মৃণালিনী'র প্রথম দুই সংস্করণের নাম-পৃষ্ঠায় তাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলেই অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে স্ফুটতর করে তোলার পরিবর্তে বরং আরও নিষ্প্রভ করে দেন, দিল্লীর পরিবেশ ও বখ্‌তিয়ারের হাতীর সঙ্গে লড়াই প্রভৃতি বর্ণনা সংবলিত আদি পরিচ্ছেদগুলি বর্জন করেন এবং নাম-পত্রের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সংজ্ঞার 'ঐতিহাসিক' শব্দটি পরিত্যাগ করেন। তার ফল খুবই শোচনীয় হয়েছে—যে বই একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পারত, তা একটি অসার্থক সাধারণ উপন্যাসে পরিণত হয়েছে। আরও একটি কারণে 'মৃণালিনী'র উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বখ্‌তিয়ার খিলিজীর অধিনায়কত্বে ১৭জন অশ্বারোহী সৈনিক বাংলাদেশ জয় করেছিল কিনা, এবং করলে কীভাবে করেছিল, এই প্রশ্নের উপর এ-বইয়ে অযথা জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ জাতীয় প্রশ্নের বিচার ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়—সাহিত্যের বিষয় নয়। তাছাড়া বখ্‌তিয়ার ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, এ কথা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না—বঙ্কিমচন্দ্র মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে এই কথা আছে বলে মনে করেছিলেন; কিন্তু তিনি ও তাঁর অনুবর্তীরা মীনহাজের বিবরণ ভালো করে পড়ে দেখেননি বলেই তাঁদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে; মীনহাজ আসলে লিখেছেন যে বখ্‌তিয়ার এক বৃহৎ অশ্বারোহিবাহিনী নিয়েই নদীয়া জয় করেছিলেন, তবে তাঁর বাহিনী যখন নদীয়ার দিকে আসছিল, তখন তিনি এত জোরে ঘোড়া চালাচ্ছিলেন যে, মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী (১৭জন নয়) তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল, এই ১৮ জনকে নিয়ে বখ্‌তিয়ার প্রথমে নদীয়ায় প্রবেশ করেন, বাকী সৈন্য পিছনেই আসছিল, একটু পরে তারাও নদীয়ায় প্রবেশ করে। বখ্‌তিয়ার বাংলা দেশ জয় করেছিলেন, এ ধারণাও ভুল। মীনহাজের বিবরণ পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বখ্‌তিয়ার প্রথমে নদীয়া শহরটি অধিকার করেছিলেন, তার পরে তিনি লক্ষণাবতী সমেত

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কিছু অংশমাত্র জয় করতে পেরেছিলেন; সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ সমেত বাংলার অবশিষ্ট অংশে এর পরেও বহুদিন পর্যন্ত হিন্দু অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল।

'রজনী' সম্পূর্ণভাবে মৌলিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন যে, রজনী-চরিত্রের পরিকল্পনার জন্য লর্ড লিটনের কাছে এবং উপন্যাসটির আঙ্গিকের জন্য উইল্‌কি কলিন্‌সের কাছে তিনি ঋণী। 'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গঠনকৌশলের জন্য কিছু কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। লবঙ্গলতার চরিত্রের মধ্যেও কিছু নতুনত্ব দেখা যায়—লবঙ্গলতা বিবাহিতা নারী, কিন্তু তবুও অমরনাথের মহত্ত্বের পরিচয় পেযে সে শেষ পর্যন্ত অমরনাথকে মনের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হল, অথচ সমাজ ও ধর্মের অনুরোধে সেকথা সে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারল না। অবশ্য অনেক সমালোচক লবঙ্গলতাকে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের সমপর্যাযভুক্ত করে ছেড়েছেন। তাঁদের অভিমত সমর্থন করা যায় না। বিবাহের আগে লবঙ্গলতা অমরনাথকে মোটেই ভালবাসত না, বরং ঘৃণা করত, সে সময়ে একদিন অমরনাথ তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করায় সে অমরনাথকে আটক করে তার পিঠে উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে 'চোর' লিখে দিয়েছিল। অমরনাথকে লবঙ্গলতা এত নিদারুণ ও কুৎসিত শাস্তি দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও যখন পূর্বোক্ত সমালোচকেরা বলেন লবঙ্গলতা চিরদিনই মনে মনে অমরনাথকে ভালবেসে এসেছিল, তখন অত্যন্ত বিস্ময় লাগে। আসলে অমরনাথের মহত্ত্বের পরিচয় পাবার আগে লবঙ্গলতা তার প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও বোধ করেনি। যাহোক্, 'রজনী'র মধ্যে কিছু কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তাকে সার্থক উপন্যাস বলা যায় না। কারণ এ বইটির ভিতরে গভীরতার একান্ত অভাব। এর মধ্যে আকস্মিক ঘটনার মাত্রাতিরিক্ত সমাবেশ দেখা যায়। তার চেয়েও আপত্তির বিষয় এই যে, আধুনিক কালের পটভূমিকায রচিত এই উপন্যাসে নানা অলৌকিক উপাদান স্থান পেয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এর মধ্যে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নায়িকা রজনীর প্রতি নায়ক শচীন্দ্রের প্রেম জাগ্রত করা হয়েছে এবং শিশুমনোভাবসম্পন্ন পাঠকপাঠিকাদের সন্তুষ্ট করার জন্য শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর চিকিৎসায় জন্মান্ধ রজনীর অন্ধত্ব আরোগ্য করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ের

অবতারণার ফলে 'রজনী' শেষ পর্যন্ত উপন্যাস না হয়ে ছেলেভুলোনো গালগল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'দেবী চৌধুরাণী' সম্বন্ধেও এই কথা অনেকখানি প্রযোজ্য। এর মধ্যেও অবিশ্বাস্য এবং আকস্মিক ঘটনার অবতারণা খুব বেশী। প্রফুল্লকে ডাকাতে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর যেভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তার মৃত্যুসংবাদে পরিণত হয়ে তার অদূরবর্তী শ্বশুরবাড়ীতে পৌছোলো, তা বিশ্বাসের অযোগ্য। সাগরের বাপের বাড়ীতে দেবী চৌধুরাণীর আকস্মিকভাবে উপস্থিত হওয়া, ঠিক সময়ে ঝড় উঠে দেবী চৌধুরাণীকে ইংরেজদের হাত থেকে ত্রাণ করা প্রভৃতি ঘটনাও অবাস্তব। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একান্ত প্রিয় গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শের সঙ্গে হিন্দু স্ত্রীর চিরন্তন আদর্শের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আসলে দু'টি আদর্শেব জট পাকিয়ে একটা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ব্যাপাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উপন্যাসে ভবানী পাঠকের কাছে প্রফুল্লের পাঁচ বছর ধরে শিক্ষালাভের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার মত অ-সাহিত্যিক আর কিছুই হতে পারে না। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, এর নায়িকা আদৌ উপন্যাসের চরিত্রই হতে পারেনি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যই ফোটেনি, প্রফুল্ল-রূপে বা দেবী চৌধুরাণী-রূপে, কোন রূপেই সে কোন অসাধারণত্বের পরিচয় দেয়নি। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে প্রফুল্লকে উপন্যাসেব নায়িকারূপে উপস্থাপিত করেছেন তাই নয়, উপন্যাসের শেষে তিনি তাকে ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন! প্রফুল্লের তুলনায় ব্রজেশ্বর সুপরিস্ফুট, কিন্তু তার পিতৃভক্তি এই উপন্যাসে যেরকম অন্ধ, যুক্তিহীন সংস্কারের রূপ নিয়েছে, তা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না; পিতৃভক্তি ভাল জিনিস, কিন্তু পিতার পাপ কাজের প্রতিবাদ না করার মধ্যে কোন মহত্ত্ব বা গরিমা নেই। বিবেকহীন, অর্থলোভী, ভীরু, পুত্রবৎসল হরবল্লভ এই উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র। চপলা সাগর বৌয়ের চরিত্রও মোটের উপর সুচিত্রিত। কিন্তু কাহিনীর অবাস্তবতা, কেন্দ্রীয় বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের দুর্বলতা এবং নানা বিসদৃশ উপাদানের সমাবেশের ফলে 'দেবী চৌধুরাণী' শেষ পর্যন্ত উপন্যাস হিসাবে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

এতক্ষণ যে উপন্যাসগুলির কথা বলা হল, সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু গুণ

থাকলেও দোষের পরিমাণ খুব বেশী এবং তা উৎকটভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গণ্য হবার প্রতিযোগিতায় এরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এখন যে দুটি উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করছি, তাদের মধ্যে প্রভূত শক্তির নিদর্শন থাকলেও সামগ্রিক বিচারের ফলে দেখা যায় যে, তারা উপন্যাস হিসাবে সামনের সারিতে স্থান পাবার যোগ্য নয়।

এদের মধ্যে একটি হচ্ছে 'আনন্দমঠ', অপরটি 'ইন্দিরা'। 'আনন্দমঠে' দেশপ্রেমের যে প্রজ্বলন্ত প্রকাশ দেখতে পাই, তা আমাদের শিরায় শিরায় আলোড়ন জাগিয়ে তোলে। সন্তানদের সাধনার মধ্য দিয়ে, 'বন্দেমাতরম্' গানের মধ্য দিয়ে, সত্যানন্দের 'মা যা ছিলেন', 'মা যা হইয়াছেন', 'মা যা হইবেন' দেখানোর মধ্য দিয়ে এই দেশপ্রেমের অগ্নি পাঠকদের মনের মধ্যে পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়। বাংলা সাহিত্যের আর কোন বই দেশবাসীকে এতখানি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেনি। উপন্যাসের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমকে এইভাবে বহ্নিদীপ্ত অভিব্যক্তি দান করা—এ কেবল প্রতিভাধর ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব। এই উপন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা লেখকের অশেষ শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এই মহৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তুর গৌরব তার সাহিত্যিক কৌলীন্যকে কথঞ্চিৎ খর্ব করেছে: উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার দরুণ 'আনন্দমঠ' বিশুদ্ধ রসসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত হতে পারেনি। অবশ্য এই উপন্যাসের উপন্যাসোচিত বৈশিষ্ট্য যে কিছু নেই, তা নয়: নারীপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে আদর্শ দেশপ্রেমিক ভবানন্দের ব্রতভঙ্গ ও জীবন বিসর্জন দান সত্যকার ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছে; বঙ্কিমচন্দ্রের "হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্।"—এই উক্তিটি ট্র্যাজেডির কারুণ্যকে ঘনীভূত করে তোলে। তারপর, এই উপন্যাসে শান্তির চরিত্রে লঘু ও গুরুর অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখতে পাই, 'আনন্দমঠ' উদ্দেশ্যমূলকতার গণ্ডীকে ছাড়াতে পারেনি। তা ছাড়া এই বইয়ে দুটি গৌণতর ত্রুটি দেখা যায়। পরাধীনতার জ্বালা এই দেশাত্মবোধসর্বস্ব উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ ইংরেজ-শাসন সমর্থন করেছেন এবং উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে তাঁর এই উপন্যাস

রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল "ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিযাছেন" প্রতিপন্ন করা। ইংরেজ সরকারের রোষের প্রতিষেধক হিসাবেই বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন, যার সঙ্গে গ্রন্থের মূল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধ। দেবী চৌধুরাণীর উপসংহারে ভবানী পাঠকের দ্বীপান্তর দণ্ড গ্রহণের বর্ণনার পিছনেও ছিল এই একই উদ্দেশ্য। 'আনন্দমঠে'র আর একটি ত্রুটি এই যে এর মধ্যে এমন কিছু কিছু উক্তি আছে, যেগুলি মুসলমান সম্প্রদাযের মনে আঘাত দেয। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র যে অন্ধ মুসলিম-বিদ্বেষের বশবর্তী হযে এই সব উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন তা নয। তাঁর নিজের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলবার ছিল, সেগুলি স্পষ্টভাবে বলার উপায ছিল না বলেই সেই সব কথা তিনি 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীদের মুখে বসিযে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীযার্ধের বাংলার জরাজীর্ণ মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বলিযেছেন। ইংরেজ আমলের বহু বাঙালী সাহিত্যিকই তাঁদের দেশাত্মবোধমূলক রচনায অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। যাহোক্, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য মহৎ হলেও প্রতিবেশী সম্প্রদাযের মনোভাবের কথা বিচার করে 'আনন্দমঠে'র মুসলিম-বিরোধী উক্তি-গুলিকে তিনি আরও সংযত ভাষায লিপিবদ্ধ করলেই ভাল করতেন। অবশ্য 'আনন্দমঠে'র প্রথম সংস্করণগুলিতে এই উক্তিগুলি যতটা অসংবৃতভাবে ছিল, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ততটা নেই। কিন্তু 'আনন্দমঠে'র মত মহৎ উপন্যাসে এই জাতীয আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষমূলক উক্তি থাকলে তার শিল্প-মূল্য খর্ব হয।

"ইন্দিরা' এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এর মধ্যে আগাগোড়াই একটি লঘু ভাব স্ফূর্ত হযেছে। উপন্যাসের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি স্নিগ্ধ ও মৃদু হাস্যরসের ধারা বযে চলেছে। এর মধ্যে কোথাও গাম্ভীর্য নেই, জটিলতা নেই, সমস্যা নেই। যে সমস্ত মারাত্মক বিষয থেকে মর্মান্তিক করুণ রসের সৃষ্টি হতে পারে, তেমন বিষযের অবতারণাও এ বইতে আছে, কিন্তু সেগুলির থেকেও কোন সমস্যা সৃষ্টি হযনি, সবকিছুরই অবলীলাক্রমে সমাধান হয়ে গিযেছে; তরুণী মেযের ডাকাতদলের হাতে পড়ার মত ভযাবহ ব্যাপার আর কী আছে? কিন্তু 'ইন্দিরা'তে এই সাংঘাতিক ব্যাপারের পরিণামও কিছুমাত্র সাংঘাতিক হযনি। 'ইন্দিরা' আধুনিক যুগের রূপকথা। তার মধ্যে যেমন কোন সমস্যা নেই, তেমনই দুঃখও নেই। এর কাহিনীটি যেমন আনন্দের স্রোতে ভাসতে

ভাসতে অগ্রসর হয়েছে, তেমনি পরিপূর্ণ আনন্দের লোকে পৌঁছে তার যাত্রা সমাপ্ত হয়েছে। এই রকম আদ্যন্ত লঘু, সহজ, স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে একখানি উপন্যাস রচনা করা কম শক্তির পরিচায়ক নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই এক বা একাধিক সন্ন্যাসী চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়—এর ব্যতিক্রম 'রাজসিংহ' ও 'ইন্দিরা'। আবার পরিপূর্ণ ভাবে সন্ন্যাসীদের চরিত্র নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র একখানি উপন্যাস লিখেছেন—'আনন্দমঠ'। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসে আর এক বিশেষ ধরনের চরিত্র একটি করে দেখা যায়। তা হল একটি প্রাণচঞ্চলা আনন্দময়ী বুদ্ধিমতী নারীর চরিত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা, 'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবি, 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া, 'বিষবৃক্ষে'র কমলমণি, 'চন্দ্রশেখরে'র সুন্দরী, 'রজনী'র লবঙ্গলতা, 'রাজসিংহে'র নির্মলকুমারী, 'আনন্দমঠে'র শান্তি এবং 'দেবী চৌধুরাণী'র সাগর বৌ এই শ্রেণীর নারী-চরিত্র। কিন্তু 'ইন্দিরা' উপন্যাসখানি পরিপূর্ণভাবে এই শ্রেণীর নারী-চরিত্রদের নিয়েই লেখা। ইন্দিরা, সুভাষিণী, হারাণী সকলেই এই শ্রেণীর নারী। এদের শিরোমণি হচ্ছে ইন্দিরা। তার মত সদাপ্রফুল্ল, প্রাণবন্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী নারী অত্যন্ত দুর্লভ। এই সমস্ত গুণের জন্যই সে বিপদকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে চলে যেতে পারে এবং সকলকে এমন কি কালির বোতলটাকেও সে বশ করতে পারে। ইন্দিরা তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে তার স্বামীকে যেভাবে নাকাল করেছে, তা খুবই উপভোগ্য হয়েছে। সুভাষিণী ইন্দিরারই যোগ্য সখী; তাছাড়া সে প্রেমময়ী, ভালবাসা দিয়ে পরকে আপন করে নিতে তার জুড়ি নেই; এইজন্যই ইন্দিরা বলেছে, "সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।" হারাণী সব সময়েই হাসে, কিন্তু তার চরিত্রের দৃঢ়তাও অতুলনীয়, কোন মন্দ কাজ তাকে দিয়ে করানো যায় না। কালির বোতলের গলায় গলায় কালি, বয়স্থ জিতেন্দ্রিয় স্বামীকে সে সন্দেহ করে; পুত্রের সামান্য কষ্টের সম্ভাবনা সে সহ্য করতে পারে না; মাথার পাকা চুল ক'গাছা তুলে ফেলে তরুণী হবার জন্য তার প্রচণ্ড সাধ। চরিত্রটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। আর আকর্ষণীয় হয়েছে বুড়ি বামনির চরিত্র, অন্ধকার রাত্রে কলপ মাখার দরুণ যার দুর্গতির একশেষ হয়েছিল। 'ইন্দিরা'র পুরুষ চরিত্রগুলি একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। নারী-চরিত্রগুলি সমস্ত উপন্যাসটি জুড়ে আছে। উপন্যাসটি ইন্দিরার জবানীতে লেখা। এর মধ্যে পুরুষ গ্রন্থকার আশ্চর্য দক্ষতার

সঙ্গে আগাগোড়া নারীর ভাষা ও ভঙ্গীকে রূপায়িত করে তুলেছেন। এইটিই 'ইন্দিরা'র সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে আমার মনে হয়। 'ইন্দিরা'তে দোষক্রটি যে কিছুই নেই তা'ও নয়। ইন্দিরা যেভাবে মহেশপুরের পথ হারাল, তা খুবই বিস্ময়কর, সারাদিন অপরিচিত পথ ধরে চলবার সময় মাঝে মাঝে লোকদের জিজ্ঞাসা না করে চলা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার ; তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে বাপের বাড়ীর ডাকঘরের নাম জানল না, এ-ও আশ্চয কাণ্ড। তার স্বামী যেভাবে বিগ্নাধবীর অন্তর্ধানের কথা বিশ্বাস করেছেন, তাতে তাঁকে শিশুরও অধম বলে মনে হয়। তবে রূপকথাধর্মী রচনায় এই জাতীয় অস্বাভাবিক ব্যাপারের আবিভাব অপ্রত্যাশিত নন। 'সেকালে যেমন ছিল' পরিচ্ছেদটি উপন্যাসের উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ করেছে, এটি লেখার যে কোন প্রয়োজন ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র তা নিজেই স্বীকার করেছেন। যে উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য তিনি এটি লিখেছেন বলে জানিয়েছেন, তার জন্য তিনি আলাদা প্রবন্ধ লিখতে পারতেন, উপন্যাসে এই জাতীয় অবান্তর বিষয় অবতারণার কোন সার্থকতা নেই।

নানা গুণ সত্ত্বেও 'ইন্দিরা' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ এর মধ্যে গভীরতার একান্ত অভাব। অবশ্য একেবারেই যে গভীরতা নেই, তা নয়। 'ইন্দিরা'র লঘু হাস্যোজ্জ্বল কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি গভীর সত্য আভাসিত হয়েছে। সেটি এই যে, ভালবাসাই জীবনের স্পর্শমণি, এরই স্পর্শে দুঃখের লোহা আনন্দের সোনায় পরিণত হয়। ইন্দিরা ভালোবাসা পেয়েছিল বলেই তার যে দিনগুলি অসহ্য দুঃখকষ্ট অপমানে ভরে উঠতে পারত, সেগুলি আনন্দে হাসিতে মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে যে উদাত্ত স্বরের ধ্রুপদী সঙ্গীত শোনা যায়, 'ইন্দিরা'তে তা যায় না, তার মধ্যে শুনি একটা হালকা মেঠো সুরের সুমধুর আলাপ। সেইজন্যে 'ইন্দিরা' ঐ উপন্যাসগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে না।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গণ্য হবার জন্য মাত্র ছয়টি উপন্যাসই প্রতিযোগিতা করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এই ছয়টি উপন্যাস হল—'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল',

'রাজসিংহ' ও 'সাতারাম'। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এই ছয়টি উপন্যাসের আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নেই।

এখন এদের সম্বন্ধে বিচার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। প্রথমে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি এই বইটিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতেন। নিছক বহিরাঙ্গিকের দিক দিযে বিচার করলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলতে হয। এর ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ও গতিশীল। এর মধ্যে একটি গল্প সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সাবলীল ও অনায়াস ভঙ্গীতে বর্ণিত হযেছে। লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি উপন্যাসের প্রথমে নিতান্ত গৌণ বিষযের অবতারণা করে তার থেকে আশ্চর্য কৌশলে ধীরে ধীরে মুখ্য বিষযের আবির্ভাব ঘটিযেছেন।

কিন্তু উপন্যাসটির আভ্যন্তরীণ ঐশ্বয সে তুলনায কতখানি? এর ভিতরে গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীকে নিযে একটি চিরন্তন ত্রিভুজ রচনা করা হযেছে। এদের মধ্যে রোহিণী চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হবাব আগেই উপন্যাস থেকে বিদায নিযেছে, ভ্রমর ও গোবিন্দলাল দীর্ঘকাল ধরে অসহ্য দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে, তার ফলে ট্র্যাজেডিব সৃষ্টি হযেছে। কিন্তু এই ট্র্যাজেডির পিছনে সুষ্ঠু কার্যকারণপরম্পরা ছিল কি না, তা সন্দেহের বিষয। মনে হয, কতকগুলি বিষযের আকস্মিক যোগাযোগ হওযার ফলেই এদের জীবনে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হযেছে। ভ্রমর যদি রাগ করে বাপের বাড়ী না যেত, কৃষ্ণকান্ত যদি মৃত্যুর আগে তাঁর উইল না বদলাতেন—তাহলেই হযত এ ট্র্যাজেডি আদৌ সংঘটিত হত না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে, গোবিন্দলালের জননী যদি সুগৃহিনী হতেন, তাহলেই এই ট্র্যাজেডি নিবৃত্ত হতে পারত। যে ট্র্যাজেডি অনিবার্য ছিল না, তাকেই আকস্মিক বিষযসমূহের সন্নিবেশের মধ্য দিযে সংঘটিত করার ফলে ট্র্যাজেডিটি কৃত্রিম ধরনের হযে গিযেছে।

এখানে আর একটি বিষয বিচার করতে হবে। গোবিন্দলাল চরিত্রের পরিণতি খুবই করুণ হযেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কারুণ্যের পিছনে যে কারণ রযেছে, তা শিল্পসম্মত হযেছে কিনা, সে বিষযটি ভেবে দেখবার মত। গোবিন্দলাল তার বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছিল বলেই তাকে এত বিরাট শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হযেছিল। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য নারীকে নিয়ে চলে যাওয়া একটা সামাজিক অপরাধ। কেউ সেই

অপরাধ করলে পরিণামে তার মর্মদাহ ও যন্ত্রণা অনুভব করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে কোন উপন্যাস রচনা করলে তা নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও কতকটা তা'ই হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ভ্রমর-চরিত্রের মধ্যে যদি এমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখানো হত যার দ্বারা বোঝা যেত যে বিশেষভাবে ভ্রমরকে হারাবার জন্যই গোবিন্দলালের এই মানসিক যন্ত্রণা, তাহলে উপন্যাসের উদ্দেশ্যমূলকতা আত্মপ্রকাশ করত না। ভ্রমরের দুঃখ উপন্যাসে খুব বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করে না, কারণ এ দুঃখের বিবরণ নিতান্তই একটা বিবরণ মাত্র, এর মধ্য দিয়ে ভ্রমরের চরিত্র বিকশিত হয়নি। সমগ্র উপন্যাসে ভ্রমর-চরিত্র কোথাও রক্তমাংসে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। গোবিন্দলালের চরিত্রও ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব, সে শুধু স্রোতে ভেসে চলে। রোহিণীর চরিত্র উপন্যাসের প্রথমার্ধে বেশ জীবন্ত, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সে নেপথ্যে সরে গিয়েছে এবং অবশেষে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। রোহিণীকে এইভাবে "হত্যা" করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সমালোচকের কাছে বিরূপ সমালোচনা অর্জন করেছেন। শরৎচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী সমালোচকদের মতে বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবোধ দ্বারা চালিত হয়েই এই বিপথগামিনীর জীবন শেষ করে তাকে অসময়ে উপন্যাস থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। আর এক দল সমালোচকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্রের চারদিকে গড়ে-ওঠা সমস্যাবলীর গ্রন্থি উন্মোচন করতে না পেরে তাকে এই রকম কৃত্রিমভাবে উপন্যাস থেকে অপসারিত করেছেন। এই দুই সমালোচনাই আংশিকভাবে সমর্থনযোগ্য। রোহিণীর হত্যা প্রসঙ্গ উপন্যাসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে তার উপযুক্ত প্রস্তুতি রচনা করা হয়নি এবং তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়নি। রোহিণী একবার মাত্র নিশাকরকে দেখেই তার প্রতি আকৃষ্ট হল, এ ব্যাপার যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি নিশাকরের সঙ্গে তার সামান্য কথা বলার দরুণই গোবিন্দলাল প্রকৃত ব্যাপার জানবার চেষ্টা না করে তাকে গুলি করল—এরও মধ্যে বাস্তবতার একান্ত অভাব। এই হত্যাকাণ্ডকে বাস্তবতাসম্মত করে বর্ণনা করলে পূর্বোক্ত সমালোচকদের আপত্তির যৌক্তিকতা সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শিল্পমূল্য খর্ব হত না।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মধ্যে যে কিছু কিছু গুরুতর ত্রুটি আছে, তা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করলাম। এইগুলির জন্যই আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-কে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত করতে পারি না।

'চন্দ্রশেখর'* উপন্যাসটি অপরিসীম সৌন্দর্যে পূর্ণ। এই উপন্যাসের সব চেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় বিভিন্ন বর্ণনার অপরূপ মনোহারিত্ব। এর মধ্যে জল একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে, জলের অফুরন্ত সৌন্দর্যকে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে নানা জায়গায় নানা বিচিত্র ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এর অন্য কতকগুলি বর্ণনারও সৌন্দর্যের তুলনা নেই; দৃষ্টান্তস্বরূপ, চন্দ্রশেখর যেখানে শৈবলিনীর অপহরণের খবর পেয়ে পুঁথিগুলি জ্বালিয়ে ফেললেন এবং মীরকাশিম যেখানে সভাসদ্‌দের বিদায় দিয়ে আভরণাদি ফেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে 'দলনী' 'দলনী' বলে কাঁদতে লাগলেন, সেই দৃশ্য দুটির উল্লেখ করা যেতে পাবে। জড়প্রকৃতির হৃদয়হীনতা যে অনুচ্ছেদটিতে বর্ণিত হয়েছে, সেটির সৌন্দযও অসামান্য। 'কাঁদে' ও 'হাসে' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুটিও এক কথায় অপূর্ব। এই উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্র অতুলনীয় দক্ষতা দেখিযেছেন। শৈবলিনী চরিত্র অত্যন্ত জটিল। তাছাড়া তার হৃদযবিক্ষোভ সমাজের শাসনকে অস্বীকার করেছে, এদিক্ দিয়ে সে শরৎচন্দ্রের নাযিকাদের অগ্রদূত। শৈবলিনীর পরেই এ উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র মীরকাশিম। তাঁর ট্র্যাজেডি দ্বিমুখী—কর্তব্য-পরাযণ নৃপতি হযেও তিনি নিজের রাজ্য রাখতে পারেননি এবং পত্নীবৎসল স্বামী হযেও তিনি অদৃষ্টচক্রে তাঁর সাধ্বী স্ত্রীকে হারিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মীর-কাশিমের এই সুগভীর ট্র্যাজেডি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দলনীব চরিত্রের উপর Othello-র ডেসডিমোনা চরিত্রের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নিয়তির চক্রান্তে দলনীর জীবনে যে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হযেছে, উপন্যাসে তার রূপায়ণ শুধু করুণ হযনি, রসোত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতাপ চরিত্র আদর্শবাদ-প্রভাবিত হলেও জীবন্ত। এমনকি, গ্রন্থকীট চন্দ্রশেখরও তাঁর পত্নীপ্রেমের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। 'চন্দ্রশেখর' যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, তা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন; কিন্তু তবুও তিনি এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীযতাবাদ বিশেষভাবে হিন্দু জাতীযতাবাদ। 'সীতারাম'-এর ললিতগিরির বর্ণনা, 'কমলাকান্ত'র 'একটি গীত' প্রবন্ধ প্রভৃতি থেকে তার নিদর্শন মেলে। কিন্তু তিনি যে ইংরেজদের চেয়ে মুসলমানদের আপন বলে মনে করতেন, 'চন্দ্রশেখর' থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায।

পটভূমিকাকে আশ্চর্যরকম জীবন্ত করে তুলেছেন; এর মধ্যে মীরকাশিমের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে, তাঁকে ঘিরে গুরগণ খাঁ ও জগৎশেঠ প্রভৃতিরা যে চক্রান্তজাল রচনা করেছিল, তারও বর্ণনা খুব সজীব হয়েছে; আর সজীব হয়েছে সেযুগের সাম্রাজ্যস্থাপনপ্রয়াসী শক্তিমান গর্বী ইংরেজদের চরিত্র, জনসন ও গলষ্টনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি, তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা পোঁতার ক্ষেত্র রচনা করার জন্য আমিয়টের জীবনবিসর্জনদান এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্য দিয়ে এদের বাস্তব চরিত্র লেখক নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন; ফষ্টর ইংরেজ জাতির কলঙ্ক, কিন্তু তার চরিত্রও অস্বাভাবিক হয়নি।

কিন্তু তবুও 'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, কারণ এর মধ্যে যে সমস্ত দোষত্রুটি আছে, তা খুবই মারাত্মক। সমাজের শাসনের বিরুদ্ধে শৈবলিনীর যে বিদ্রোহকে লেখক আশ্চর্য শিল্পকুশলতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন, তাকেই আবার ধিক্কার দিয়ে ও তিরস্কার করে তিনি শিল্পের সমাধি রচনা করেছেন। সবচেয়ে শোচনীয় হয়েছে শৈবলিনীকে বারো-বছর-ব্যাপী প্রায়শ্চিত্তের বিধান দান, যোগবলে তার অন্তরের কথা উদ্‌ঘাটন এবং মীরকাশিমের সভায় তার সতীত্বের বিচার; রমানন্দ স্বামীর চরিত্র সামাজিক আদর্শ ও অলৌকিক যোগবলের মাহাত্ম্যকে উচ্চে তুলে ধরেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু চরিত্রটির অবতারণা উপন্যাসের শিল্পগুণকে যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করেছে। এই উপন্যাসে শৈবলিনীর কাহিনী এবং দলনীর কাহিনীর মধ্যে সংযোগসূত্র এত ক্ষীণ যে দলনীর কাহিনীটিকে উপন্যাসের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। অনেক সমালোচকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী চরিত্রের সঙ্গে বৈপরীত্য দেখাবার জন্য দলনী-চরিত্রের অবতারণা করেছেন, কিন্তু এই মত সমর্থন করা যায় না, কারণ শৈবলিনী ও দলনীর জীবনের সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। দলনীর জীবনে প্রতাপ নেই। মোটের উপর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি একাধারে স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের চরম সাফল্য ও চরম ব্যর্থতার নিদর্শনস্থল হয়ে রয়েছে।

'সীতারাম' উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বিষয়ে অত্যন্ত দুর্লভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর কাহিনীবয়নকৌশল সত্যিই উচ্চাঙ্গের। একদিকে সীতারামের রাজনৈতিক ভূমিকা, অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডি, অপরদিকে গঙ্গারামের কাহিনী এই উপন্যাসের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে একটি নিবিড় যোগসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই উপন্যাসের গৌণ চরিত্রগুলি খুবই জীবন্ত হয়েছে। সবচেয়ে

জীবন্ত হয়েছে গঙ্গারামের চরিত্র; সাহসী বীর গঙ্গারাম কীভাবে কন্দর্পের ফাঁদে পড়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল এবং দেশদ্রোহী স্বজনদ্রোহী হয়ে উঠল, তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি ধাপ বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। স্বামী-সন্তানের ভালোবাসায় অন্ধ কাণ্ডজ্ঞানহীনা রমা একেবারে স্বাভাবিক বাঙালী নারী হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, আবার গঙ্গারামের বিচারের সময় সে যেভাবে নির্ভয়ে তেজস্বিতার সঙ্গে সকলের সামনে সব কথা ব্যক্ত করেছে, তা-ও অস্বাভাবিক হয়নি। নন্দা কর্তব্য পরায়ণা স্ত্রী ও জননী, তার মধ্যে এতটুকু অস্বাভাবিকতা নেই। সে একবার মাত্র নিজের তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছে, জয়ন্তীকে চরম লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করার সময়; নারী হয়ে নারীর বিপদের সময় এসে দাঁড়ানো—এর মধ্য দিয়ে নন্দা স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত হয়েই দেখা দিয়েছে। জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী হলেও জীবন্ত, এই চরিত্রটি সবচেয়ে জীবন্ত হয়েছে তার লাঞ্ছনার দৃশ্যটিতে, সীতারাম যখন তাকে সকলের সামনে বিবস্ত্র করে বেত মারতে আদেশ দিলেন, তখন জয়ন্তী প্রথমে সন্ন্যাসিনীসুলভ নির্বিকারভাব দেখাল, কিন্তু যখন চরম মুহূর্ত এল, তখন নারীর লজ্জা এসে তার সমস্ত দৃঢ়তা ভেঙে চুরমার করে দিল। মহাভারতের কৌরবরাজসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর চিত্রটি মনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র জয়ন্তীর এই ছবিটি এঁকেছিলেন বলে মনে হয়। 'সীতারাম' উপন্যাসের অনেক জায়গায় জনতা-সমাবেশের চিত্র পাই। এই চিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত। ঘটনার দিক পরিবর্তনের তালে তালে জনতার মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে দেখিয়েছেন, তা জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। এই বর্ণনাগুলির শিল্পকৌশলও অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের।

কিন্তু নানা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও 'সীতারাম'কে আমরা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস দূরের কথা, মোটামুটিভাবে সার্থক উপন্যাসও বলতে পারি না। কারণ এই উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র—সীতারাম এবং শ্রী মোটেই জীবন্ত হয়নি। সীতারাম যেভাবে আদর্শ রাজা থেকে কামোন্মত্ত অত্যাচারী পিশাচে পরিণত হয়েছেন, তা মোটেই প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়নি, সীতারামের পরিবর্তনের ধাপগুলিকেও আদৌ স্পষ্ট করে তোলা হয়নি। শ্রী মূর্তিমতী হেঁয়ালি ছাড়া আর কিছুই নয়। উপন্যাসের প্রথমে দেখি শ্রী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা বলে তার মনে দুঃখের অন্ত নেই। তারপর সে যখন জানতে পারল যে তার কোষ্ঠীতে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবার

কথা লেখা ছিল বলে তার শ্বশুর তাকে ত্যাগ করেছিলেন, তখন সে সীতারামকে ছেড়ে চলে গেল, সীতারাম তাকে গ্রহণ করতে চাওযা সত্ত্বেও সে সীতারামের সঙ্গে থাকতে রাজী হল না, পাছে সীতারামের অমঙ্গল হয। তারপর নানা দেশ ভ্রমণ করার পরে উড়িষ্যায এসে শ্রী জয়ন্তীর দেখা পেল। জয়ন্তীর কাছে শ্রী বলল যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেও সীতারামকে ভুলতে পারেনি। এতদূর পর্যন্ত শ্রীর চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু এর পরেই অস্বাভাবিকতা সুরু হযেছে। এর মাত্র এক বছর পরেই শ্রী জযন্তীকে বলল যে সে এখন জযন্তীর শিষ্যা, তার মনে সীতারামেব আর কোন স্থান নেই। তারপর শ্রী জয়ন্তীর সঙ্গে দেশে ফিরে এল। সীতাবাম যখন শ্রীকে তার কাছে থাকতে বললেন, তখন শ্রী তাঁব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কবল না, কিন্তু সীতারামকে সে নিষেধ করে দিল তিনি যেন তার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করেন। সীতারাম তার কথায সম্মত হযে তাকে 'চিত্তবিশ্রামে' রেখে দিলেন, সদা সর্বদা তিনি সেখানে যান, লোকে জানে শ্রী তাঁর রক্ষিতা। তাতে সন্ন্যাসিনী শ্রীর ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কেবল সীতারামের স্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রেখেই সন্তুষ্ট। সীতারাম শ্রীর কাছে সব সময পড়ে থাকেন, রাজকার্যে অবহেলা করেন, তাঁর অধঃপতন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কিন্তু শ্রী তাঁকে সংশোধনের কোন চেষ্টাই করল না। এখানে শ্রী স্ত্রী বা সন্ন্যাসিনী, কোন হিসাবেই তার কর্তব্য পালন করেনি। তারপর শ্রী 'চিত্তবিশ্রাম' থেকে পালিয়ে গেল। তাকে হারিযে সীতারাম উন্মত্তপ্রায় হয়ে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে নেমে গেলেন, কিন্তু শ্রী তখনও ফিরে এল না। সে ফিরে এল তখন, যখন সীতারামের আর উদ্ধারের কোন আশা নেই, যখন তাঁর সর্বনাশ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তখন সে সীতারামের পায়ে হাত দিয়ে বলল যে সে আর সন্ন্যাসিনী নয়, সীতারামকে সে তখন আকুল অনুরোধ জানাল তাকে গ্রহণ করার জন্য! প্রকৃতপক্ষে শ্রীর কার্যকলাপের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আর একটি কারণে 'সীতারাম'-এর উৎকর্ষ খর্ব হযেছে। 'সীতারাম'-এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একান্ত প্রিয় একটি তত্ত্বকে রূপায়িত করে তুলেছেন। এই তত্ত্বের মধ্যে গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ এবং ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদ ও হিতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এই তত্ত্বের রূপায়ণের জন্য তিনি 'সীতারাম'-এর

ঐতিহাসিক পটভূমিকাটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত স্থূলহস্তে বিকৃত করে দিয়েছেন। এই উপন্যাসের বহু উপাদানই ইতিহাস থেকে নেওয়া। সীতারামের আবির্ভাবকাল, সেযুগে বাংলার হিন্দুদের উপর মুসলমান ধর্মধ্বজীদের অত্যাচার, মুসলমান শাসকশক্তির সঙ্গে সীতারামের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও স্বাধীনতা ঘোষণা, বিলাসে নিমগ্ন হওয়ার দরুণ সীতারামের পতন—প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ঐতিহাসিক আবহাওয়া বেশ জীবন্তভাবেই ফুটেছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্ব বর্ণনায় মনোযোগী হয়ে ইতিহাসকে উপেক্ষা করতে আরম্ভ করলেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সুরুতেই তিনি নিজের কাজের সমর্থনে লিখলেন, "উপন্যাস-লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিষ্প্রয়োজন।" তৃতীয় খণ্ডে তত্ত্বের প্রাধান্য ঐতিহাসিক আবহাওয়াকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দিয়েছে। ফলত, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের প্রিয় এক দুর্বোধ্য তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য 'সীতারাম' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে নির্মমভাবে বলি দিয়েছেন। তার ফলে 'সীতারামে' তত্ত্বের চাপে শিল্প শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছে। 'সীতারামে'র প্রথম সংস্করণে বহু ঐতিহাসিক উপাদান ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাদের অধিকাংশকেই পরবর্তী সংস্করণে বর্জন করেছেন সম্ভবত এই কারণে যে, তাদের রাখলে পাঠকদের মন তাদেরই দিকে গিয়ে পড়বে, উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে না। প্রথম সংস্করণে 'সীতারাম' প্রায় পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাসই হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে লেখক অধিকতর পরিমাণে তত্ত্বপ্রিয় হয়ে ওঠার দরুণ বইটি ভিন্নধর্মী উপন্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তনের ফল ভাল হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

'সীতারাম' উপন্যাসে জ্যোতিষ-গণনার সূত্র ধরে খানিকটা অলৌকিক উপাদান প্রবেশ করেছে, যেমন করেছিল 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে। এর ফলে এই উপন্যাসের বাস্তবতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

*

'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' ও 'রাজসিংহ'—এই তিনটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক-প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি কেবলমাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'রজনী' ও 'দেবী চৌধুরাণী' রচনা করতেন, তা হলে তিনি বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। সেই সঙ্গে তিনি

যদি 'চন্দ্রশেখর' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-ও রচনা করতেন, তা হলে তিনি একজন শক্তিমান্ ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন, এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু তিনি যে অমর ঔপন্যাসিকদেব প্রথম সারিতে স্থান পেযেছেন, তা প্রধানত 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' ও 'রাজসিংহে'র জন্য।

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রেব এক আশ্চয সৃষ্টি। এই উপন্যাসটি সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুপম কাব্যিক লাবণ্যে বিমণ্ডিত। এর মধ্যে প্রকৃতির বর্ণনা একটি প্রধান স্থান অধিকার কবে আছে এবং এই বর্ণনা অনুপম সৌন্দর্যে নিষিক্ত। কিন্তু এই বইযের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কপালকুণ্ডলার চরিত্র। এই চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কপালকুণ্ডলার মধ্যে একটা অসাধারণ জটিলতা আছে। একদিকে সে অরণ্যের ক্রোডে পালিতা, যার জন্য সংসারকে সে ভালবাসতে পাবেনি; অপরদিকে নারীসুলভ কোমলতা দযামাযায সে পরিপূর্ণা, যার জন্য সে নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সেইরকম আবার তান্ত্রিকেব হাতে মানুষ হবার ফলে শক্তিদেবীর উপর তার অটল ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মেছিল, তাই সে যখন শুনল দেবী তার প্রাণবলি চাইছেন, তখন সে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এইটিই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে যৌন-অনুভূতি একেবারেই নেই, যার জন্য এক বছর বিবাহিত জীবনযাপন করার পরেও তার মনে নবকুমারের স্থান হযনি। অনেকে কপালকুণ্ডলার এই বৃত্তিটিকেও আরণ্য-প্রকৃতির প্রভাবজনিত বলে মনে করেন। কিন্তু আরণ্য-প্রকৃতির মধ্যেও যৌন-জীবন সম্পূর্ণভাবে সক্রিয, সুতরাং আরণ্য-প্রকৃতি কপালকুণ্ডলার যৌন-প্রবৃত্তির বিকাশের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কপাল-কুণ্ডলার ট্র্যাজেডি একান্তভাবেই তার নিজস্ব, অন্য অরণ্য-পালিতা নারীদের জীবনেও যে এ ট্র্যাজেডি আসবে, তার কোন মানে নেই। কারণ তাদের সংসার ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু স্বামীর প্রতি আকর্ষণ বোধ না করার কোন কারণ নেই। সুতবাং 'কপালকুণ্ডলা'ব মধ্যে একটি যৌন-অনুভূতি-হীনা নারী বা Frigid woman-এর ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে এবং এই ট্র্যাজেডির প্রেরণা এসেছে কপালকুণ্ডলাব নিজেরই ভিতর থেকে। বাইরের ঘটনাপ্রবাহের চক্রান্ত এই ট্র্যাজেডির বিকাশে সাহায্য করেছে বটে কিন্তু

এ ট্র্যাজেডিকে নিয়তিসৃষ্ট বলতে পারি না। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই ট্র্যাজেডির মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য—দুই শ্রেণীর উপাদানেরই সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এই উপন্যাসের কপালকুণ্ডলা ভিন্ন অন্য চরিত্রগুলি একান্তই গৌণ—কপালকুণ্ডলা চরিত্রের ক্রমবিকাশে সাহায্য করার জন্যই সেগুলির অবতারণা করা হয়েছে। পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলার সম্পূর্ণ বিপরীত শ্রেণীর চরিত্র—কপালকুণ্ডলা যেরকম শান্ত, স্বল্পভাষিণী, যৌন-চেতনা-বিহীনা, পদ্মাবতী আবার সেই অনুপাতেই চঞ্চলা, বাক্‌পটিয়সী এবং অতিমাত্রায় যৌন-চেতনা-সম্পন্না। এই বিপরীতধর্মী চরিত্রটির অবতারণার মধ্য দিয়ে কপালকুণ্ডলার চরিত্রকেই উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। নবকুমারকে সর্বগুণান্বিত করে আঁকা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে তার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী তাঁকে পাবার জন্য পাগল। এর দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছেন যে, কপালকুণ্ডলার যে নবকুমারকে ভাল লাগেনি এতে নবকুমারের পুরুষ হিসাবে কোন দোষ বা অসামর্থ্য নেই, কপালকুণ্ডলার চরিত্রবৈশিষ্ট্যই এজন্য দায়ী। এই উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিবেশটি অত্যন্ত সজীব। ঐতিহাসিক পটভূমিকা যেটুকু আছে, তা কেবলমাত্র বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যই; সেটুকুও বেশ জীবন্ত। ঐতিহাসিক মেহেরউন্নিসার দার্শনিক প্রকৃতির চরিত্রটি একটি মাত্র পরিচ্ছেদে স্বল্প পরিসরের মধ্যেই লেখক উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি অবিস্মরণীয় বাক্য রয়েছে, যাদের ভিতরে অল্প কথার মধ্যে অপরিসীম অর্থগর্ভতার নিদর্শন মেলে; যেমন "তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" (১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ), "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" (ঐ, ৫ম পরিচ্ছেদ), "প্রদীপ নিভিয়া গেল" (২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)। এগুলি এই উপন্যাসের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

'বিষবৃক্ষে'র মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এটিই বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস—যার পটভূমিকা গ্রন্থরচনা-কালের সমসাময়িক। 'বিষবৃক্ষ' রচনার কিছু দিন আগে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের আইন প্রবর্তিত করিয়েছেন এবং ঠিক 'বিষবৃক্ষ' রচনার সময়েই বহুবিবাহ বন্ধের জন্য তিনি আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। 'বিষবৃক্ষে' বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত প্রসঙ্গের অবতারণা গ্রন্থরচনাকালের সঙ্গে তার পটভূমিকার সমসাময়িকতা প্রমাণ করে।

'বিষবৃক্ষে'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর শান্ত নিস্তরঙ্গ পারিবারিক জীবন থেকেই জ্বলন্ত ট্র্যাজেডির উপকরণ আহরণ করেছেন। দাম্পত্যজীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব যে কি প্রলয় ঘটাতে পারে, তার মর্মন্তুদ উদাহরণ তিনি এই উপন্যাসে সর্বপ্রথম সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে অনেকগুলি বিশিষ্ট চরিত্র আছে এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত। 'বিষবৃক্ষে'র নারীচরিত্রগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অতুলনীয় সৃজনদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সূর্যমুখী আদর্শ সাধ্বী, স্বামীর সুখের জন্য তিনি চরম স্বার্থত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু তিনি মানবতাবর্জিত অশরীরী আদর্শের বিগ্রহও যে নন, তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, স্বামীকে কুন্দের হাতে তুলে দেওয়ার পর গৃহত্যাগ ক'রে। কুন্দ ভীরু, অপ্রতিভ, স্বল্পবাক্, নিজেকে সে মেলে ধরতে জানে না; হৃদয়জোড়া তার ভালবাসা, কিন্তু তা সে জানাতে পারে না, তাই সেই ভালবাসার প্রতিদানও সে পায় না। মৃত্যুর প্রবাহে সে মুখর হয়ে উঠে তার অবহেলিত প্রেমকে প্রথম ও শেষবারের মত ব্যক্ত করে গিয়েছে। এতে তার স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। কমলমণি স্বামীপুত্র-সৌভাগ্যে গরবিনী, কিন্তু সে প্রেমময়ী, সকলকেই সে ভালবাসে, এমনকি সমস্ত অশান্তির মূল কুন্দকেও। হীরাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'সর্পী' বলেছেন, হীরার খলতা, পরশ্রীকাতরতা এবং লেলিহান্ জিঘাংসার দুর্বিষহ উগ্র রূপটিকে তিনি জীবন্তভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন; কিন্তু হীরা নিছক একটা শয়তানী মাত্র হয়নি, তার মানবিকতাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্যের দরুণই যে সে সূর্যমুখীর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছে এবং প্রেমাস্পদের কাছে বঞ্চনা ও আঘাত পেয়েই যে সে কুন্দের প্রতি জিঘাংসাপরায়ণা হয়েছে, তা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বলে হীরাকে অমানুষ বলে মনে হয় না। 'বিষবৃক্ষে'র ফুলের নারীচরিত্রগুলির নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্যমুখী সূর্যমুখী মতই গরিমাময়ী ও কান্তগতপ্রাণা। কুন্দফুল যেমন স্বল্পায়তন, স্বল্পজীবী এবং মৃদুসৌরভপূর্ণ, কুন্দনন্দিনীও ঠিক তেমনি। কমল কমলের মতই প্রফুল্ল এবং সুবাসে ভরা। হীরা-চরিত্রে হীরার ঔজ্জ্বল্য আর তীক্ষ্ণধার দুই-ই পাই। 'বিষবৃক্ষে'র পুরুষচরিত্রগুলি নারীচরিত্রগুলির মত দীপ্তিপূর্ণ না হলেও প্রাণবন্ত। নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে অনায়াসে পেয়েছিলেন বলে তাঁর মূল্য বুঝতে পারেননি, সূর্যমুখী তাঁর তৃষ্ণাও মেটাতে পারেন নি, তাই কুন্দকে কাছে পেয়ে তিনি সহজেই

তার প্রেমে পড়লেন ; সেই সময়ে নিজেকে সংযত রাখবার জন্যে তাঁর প্রচণ্ড চেষ্টা, প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রামের চিত্র খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কুন্দকে বিবাহ করার সময় নগেন্দ্র যে সব যুক্তি দেখিয়ে নিজের আচরণের দোষকে ক্ষালন করবার চেষ্টা করেছেন, তাতে তাঁর অসহায়তা প্রকট হয়েছে। বিধবা-বিবাহ করার সমর্থনে তিনি বিদ্যাসাগরের বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যে বিধান দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করতে তাঁর বাধেনি। সূর্যমুখীকে হারিয়ে নগেন্দ্র তাঁর মূল্য বুঝেছেন এবং সূর্যমুখীর "মৃত্যু-সংবাদ" পাবার পর তাঁর অন্তর্দাহ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে। দেবেন্দ্র দত্ত পাষণ্ড হলেও তাকে অমানুষ বলে মনে হয় না : কুরূপা ও মুখরা স্ত্রীর জন্যই সে ধাপে ধাপে এতদূর নেমে গিয়েছে, এই কথা স্মরণ করে আমরা তার জন্যেও মনে বেদনা অনুভব করি। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় এই যে, এর কোন চরিত্রই তাঁর সমবেদনা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীকে ঘিরে যে ট্র্যাজেডিটি রচিত হয়েছে, তা যেমনই সূক্ষ্ম, তেমনই গভীর। নগেন্দ্রের প্রবৃত্তি দমনে অক্ষমতা, সূর্যমুখীর অভিমান এবং কুন্দের দুর্ভাগ্য মিলে এই ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছে। কুন্দের ট্র্যাজেডি তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই মৃত্যু নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলনের মধ্যে বেঁচে থেকে তাদের ট্র্যাজেডিকে জীইয়ে রেখেছে। এই ট্র্যাজেডির প্রতিটি স্তরে ইন্ধন জুগিয়েছে হীরা। সে-ই "হরিদাসী বৈরাগী'র খবর এনে দিয়ে কুন্দের প্রতি সূর্যমুখীর মন বিষিয়ে দিয়েছে ; সে ই কুন্দকে আশ্রয় দিয়ে তার প্রতি নগেন্দ্রের বিচ্ছেদজনিত মোহ বাড়িয়ে তুলেছে ; সূর্যমুখীর কুন্দকে ভর্ৎসনা করার কথা নগেন্দ্রের কাছে বলে সে-ই নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সম্পর্ককে তিক্ত করে কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে। সে-ই কুন্দের মৃত্যু ঘটিয়েছে। কিন্তু হীরা শুধু দুর্বৃত্ততার দ্বারা চালিত হয়ে এই ট্র্যাজেডির ইন্ধন যোগায়নি, তার অন্তরের ঈর্ষা ও অপমানের জ্বালা,—অতৃপ্ত প্রেম ও প্রবঞ্চিত নারীত্বের জ্বালা তাকে এই ইন্ধন যোগাতে অনুপ্রেরিত করেছে এবং এই প্রচণ্ড জ্বালা তার নিজের জীবনেও ট্র্যাজেডি রচনা করেছে। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য কৌশলে একটি ট্র্যাজেডির স্ফুলিঙ্গ দিয়ে আর একটি ট্র্যাজেডির শিখাকে জ্বালিয়েছেন। তাছাড়া তিনি 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর কাহিনীর সঙ্গে হীরা-দেবেন্দ্রের কাহিনীকে একসূত্রে গেঁথে দিয়ে যেভাবে একটি সংহত

আখ্যান রচনা করেছেন তার তুলনা বিরল। হীরা-দেবেন্দ্রের কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ থেকে প্রমাণিত হয় যে সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিতৃষ্ণা ছিল কিন্তু বটে, প্রয়োজন হলে তিনি এই প্রেমকে অনুপম অন্তর্দৃষ্টি সহকারে শিল্পচাতুর্যে মণ্ডিত করে রূপায়িত করতে পারতেন।

'বিষবৃক্ষে'র অনেক বর্ণনা খুব সজীব ও আকর্ষণীয়। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নগেন্দ্রনাথের নৌযাত্রার বর্ণনা এবং জমিদারবাড়ীর বর্ণন বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। এই উপন্যাসের ৭ম ও ১২শ পরিচ্ছেদে জমিদারবাড়ীর যে দুটি বর্ণনা পাই, তাদের মধ্যে আমূল বৈপরীত্য রয়েছে। দুটি বর্ণনাই বাস্তবধর্মী; জমিদারবাড়ীর ভিতরে যে সংসার রয়েছে, তার সুখের সময়ে জমিদারবাড়ী গমগম করছে আবার দুঃখের সময়ে সেই জমিদারবাড়ী শ্মশানের মত মনে হচ্ছে। 'বিষবৃক্ষে' অনেক জায়গায় উপভোগ্য হাস্যরসেরও নিদর্শন মেলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ নগেন্দ্রের পাইকদের সূর্যমুখীকে অনুসন্ধানের বর্ণনা এবং হীরার আয়ীবুড়ীর বর্ণনা স্মরণ করতে পারি। এই হাস্যরসাত্মক বর্ণনাগুলি উপন্যাসের তীব্র কারুণ্যকে প্রশমিত করে সহনীয় করে তুলেছে।

'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'রাজসিংহে'র সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তারপরে আর বলবার কথা প্রায় কিছুই নেই। 'রাজসিংহে'র মধ্যে ভারত ইতিহাসের একটি সঙ্কট ক্ষণ তার পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে রূপায়িত হয়েছে এবং সেই সঙ্কট ক্ষণের ঝঞ্ঝাবর্তের বাত্যাবিক্ষোভ উপন্যাসের রুদ্ধশ্বাস গতিবেগের মধ্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'রাজসিংহে' কোন উচ্ছ্বাস বা অদৃষ্ট বিশ্লেষণের নিদর্শন মেলে না, তার গতিচ্ছন্দকে অব্যাহত রাখবার জন্য লেখক এগুলিকে নির্মম হস্তে বর্জন করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের এই প্রচণ্ড গতি সত্ত্বেও চরিত্রগুলির স্ফুরণ কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি। 'রাজসিংহে'র প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রই জীবন্ত। রাজসিংহের বীরত্ব ও মহত্ত্ব, ঔরংজেবের শাঠ্য ও পরধর্মদ্বেষ, চঞ্চল-কুমারীর তেজ ও দীপ্তি, উদিপুরীর মত্ততা ও নীচতা আশ্চর্যরকম সজীব হয়েছে। সেইসঙ্গে সজীব হয়েছে দুটি গৌণ কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র—বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রফুল্লতা ও রসিকতার সমাবেশে ভরা মাণিকলাল ও নির্মল-কুমারী। এই উপন্যাসের সবচেয়ে জটিল ও জীবন্ত চরিত্র জেবউন্নিসা। সে জানত যে সম্রাটনন্দিনী হয়ে জন্মাবার ফলে তাকে কোনদিন কোন দুঃখ

ভোগ করতে হবে না, এমনকি প্রেমের দুঃখও তার জন্যে নয়; ভোগবিলাস ও উচ্ছৃঙ্খল কামনানিবৃত্তির মধ্য দিয়েই তার সারাজীবন কাটবে। সম্রাট-নন্দিনীর অভিমান ও নিষ্ঠুরতা নিয়েই সে তার উপপতি মবারকের প্রাণদণ্ড দিয়েছিল। কিন্তু দণ্ডাদেশ কার্যকরী হবার পরে সে একটুও সুখী হল না, তার বদলে অবদমিত ভালোবাসা জেগে উঠে তার দাবী জানিয়ে সম্রাটনন্দিনীর হৃদয়মনকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল; সেদিন জেবউন্নিসা বুকভাঙা কান্নার মধ্য দিয়ে বুঝল যে অনেক পর্ণকুটিরবাসী দরিদ্রও তার চাইতে সুখী।

জেবউন্নিসা, মবারক ও দরিয়া বিবিকে নিয়ে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে একটি অনুপম ট্র্যাজেডি গড়ে উঠেছে। জেবউন্নিসা তার প্রণয়ীকে যখন কাছে পেয়েছিল, তখন তাকে ভালোবাসেনি। তাকে হারাবার পরে ভালোবাসার আগুনে সে জ্বলে পুড়ে মরেছে; অনেক দহনের পর আবার সে তাকে ফিরে পেয়েছে, কিন্তু পেয়েও আবার হারিয়েছে। প্রেম আর মিলন—এই দুটি বস্তু জেবউন্নিসার জীবনে একসঙ্গে মেলেনি, এই তার ট্র্যাজেডি। মবারকের ট্র্যাজেডি এই যে, সে যাকেই ভালোবেসেছে, সে-ই তার জীবনে এনে দিয়েছে মৃত্যু। জেবউন্নিসাকে সে ভালোবেসেছিল, সেই জেবউন্নিসা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল; দরিয়াকে সে ভালোবেসেছিল, দরিয়া তার জীবন শেষ করল। দরিয়া বিবিও বঞ্চিত প্রেমের আগুনে জ্বলে উন্মাদিনী হয়ে ট্র্যাজেডির শিখাকে লেলিহান করে তুলেছে। এই ট্র্যাজেডি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত পরিণত শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' ও 'রাজসিংহ'—এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বিচার করা সমালোচকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। তিনখানি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা যায়, তিনটি উপন্যাসেরই কাহিনী, চরিত্রচিত্রণ ও শিল্পরূপ অনবদ্য এবং তিনটিরই মধ্যে অতলস্পর্শ গভীরতার এবং সুমহান্ জীবনবোধের নিদর্শন মেলে। এ অবস্থায় এদের মধ্যে একের তুলনায় অন্যের অপকর্ষ প্রতিপন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ।

যাহোক্, এ সম্বন্ধে সাবধানে বিচার করে আমার মনে হয়, 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষে'র তুলনায় 'রাজসিংহে'র স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নে। অবশ্য এই মন্তব্য করা খুব নিরাপদ নয়, কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহে'র অনন্যসাধারণত্ব প্রমাণ করেছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবেই

'রাজসিংহে'র কিছু ত্রুটি আছে। অবশ্য এই মত প্রকাশ করাও নিরাপদ নয়, কারণ 'রাজসিংহ' যে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস—এ কথা শুধু রবীন্দ্রনাথ বলেননি, আচার্য যদুনাথ সরকারও বলেছেন; যদুনাথ সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং 'রাজসিংহে' যে যুগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ; উপরন্তু তিনি সাহিত্যরসিকও, এক সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মতের বিরুদ্ধে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া খুবই দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক।

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন মত প্রকাশ করতে হলে যথোপযুক্ত তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করে বিষয়টির বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। প্রথমে দেখা যাক, 'রাজসিংহে'র কাহিনীটির ঐতিহাসিকতা কতখানি। কাহিনীটি পুরোপুরিভাবে ঐতিহাসিক না হলেও মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক; বঙ্কিমচন্দ্র এর মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকের তা করবার অধিকার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত টডের 'রাজস্থান' থেকে 'রাজসিংহে'র কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন; টডের 'রাজস্থান'কে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশুদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ বলে মনে করেন না, কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের সময়ে এই বই ইতিহাসগ্রন্থ বলেই গণ্য হত। যাহোক্, 'রাজসিংহে' টডের 'রাজস্থান' থেকে যে বিবরণকে উপকরণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই প্রামাণিক ঐতিহাসিক সূত্রদ্বারা সমর্থিত; অবশ্য, টড ও বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'রূপনগর রাজ্য' বলেছেন, তার আসল নাম কিষণগড় রাজ্য রূপনগর ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট শহর। 'রাজসিংহে' যিনি চঞ্চলকুমারী নামে অভিহিত হয়েছেন, তাঁর আসল নাম চারুমতী। বঙ্কিমচন্দ্র (এবং তাঁকে অনুসরণ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি গ্রন্থকাররা) লিখেছেন যে, ঔরংজেবের মনোনীতা পাত্রী রূপনগরের রাজকন্যাকে রাজসিংহ নিয়ে যাওয়ায় ঔরংজেব রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এরকম লেখার কারণ টডের রাজস্থানে রূপনগরকুমারী-রাজসিংহ ঘটিত ব্যাপারের বর্ণনার পরেই ঔরংজেব রাজসিংহের যুদ্ধের বর্ণনা আছে; টড কিন্তু একথা কোথাও লেখেননি যে, প্রথম ঘটনাটি দ্বিতীয় ঘটনার কারণ। আসলে রাজসিংহ মৃত যোধপুররাজ যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে আশ্রয় দেওয়াতে এবং জিজিয়া কর না দেওয়াতে ঔরংজেব ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন; "রূপনগর"-এর রাজকন্যার

সঙ্গে রাজসিংহের বিবাহ হয়েছিল তার একুশ বছর আগে—১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। যাহোক্, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করলেও তার জন্য উপন্যাসের কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এই উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের কাছে ঔরংজেবের শোচনীয় পরাজয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, ইতিহাসে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। আসলে এই সংঘর্ষে মোগলদের জয়ই বেশী হয়েছিল, তবে কোন কোন সময়ে তাদের বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল; যে সমস্ত যুদ্ধে ঔরংজেব নিজে মোগলবাহিনীর নেতৃত্ব করেছেন, তাদের সবগুলিতেই তিনি জয়লাভ করেছেন; রাজসিংহ যুদ্ধ চলার সময়েই মারা যান (১৬৮০ খ্রীঃ); শেষ অবধি ঔরংজেব তাঁর বিদ্রোহী পলাতক পুত্র আকবরের পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্য রাজসিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বসম্প্রদায়প্রীতির বশবর্তী হয়ে রাজসিংহের কাছে ঔরংজেবের কাল্পনিক পরাজয়কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তার ফলে শিল্পের দিক্ দিয়ে 'রাজসিংহে'র ক্ষতি হয়েছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের আর একটি সর্ত এই যে, তার মধ্যে ইতিহাসের মর্মগত সত্যকে বিকৃত করা চলবে না, সর্বজনবিদিত কোন বিষয়ের বিপর্যয়সাধন করা চলবে না। তা করলে পাঠকের মনে আঘাত লাগবে এবং তার ফলে রস নষ্ট হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উলটা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা ধমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।" কিন্তু রাজসিংহের ঔরংজেব ও জেবউন্নিসা চরিত্রের মধ্যে সর্বজনবিদিত সত্যকেই বিকৃত করা হয়েছে। অবশ্য আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, ঔরংজেব চরিত্রের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেননি। আচার্য যদুনাথ ঔরংজেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, সুতরাং তাঁর এই উক্তির উপর কারও কথা চলে না। কিন্তু যদুনাথ এই প্রশ্নটির সমস্ত দিক্ নিয়ে আলোচনা করেননি; তিনি দক্ষ উকীলের মত বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপক্ষে যে কথা বলবার আছে, তারই উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু যে সমস্ত বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যায়, সেগুলি সম্বন্ধে তিনি নীরব থেকেছেন। ঔরংজেব যে অতিমাত্রায় পরধর্মদ্বেষী ছিলেন, তার অনেকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করে যদুনাথ বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ঔরংজেবকে পরমধর্মদ্বেষী করে এঁকে কোন অন্যায় করেননি। কিন্তু

বঙ্কিমচন্দ্র তো ঔরংজেবকে শুধু পরধর্মদ্বেষী করে আঁকেননি, তিনি ঔরংজেব চরিত্রে এমন সব বৈশিষ্ট্যের আরোপ করেছেন, ঐতিহাসিক ঔরংজেব যার তুলনায় সর্বাংশে বিপরীতভাবাপন্ন ছিলেন। ঔরংজেব ছিলেন লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুরুষ, তার বীরত্ব ও সামরিক প্রতিভার তুলনা ছিল না; তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না বা কারও দ্বারা চালিত হতেন না; স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ বা দুর্বলতা ছিল না এবং তাঁর ছিল অতুলনীয় কুশাগ্র কূটনীতিজ্ঞান। ঔরংজেবের এই গুণগুলি চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঔরংজেব দেখি সমস্ত যুদ্ধেই পরাজিত হন; স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও পরামর্শেই তাঁর সাম্রাজ্য চালিত হয়, সামান্যা রমণী নির্মলকুমারীকে দেখে তিনি বৃদ্ধ বয়সে তার প্রেমে পড়ে যান এবং 'রাজসিংহে'র কূটনীতির কাছে তিনি বারবার নাস্তানাবুদ হন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মর্মগত সত্যকে বিকৃত করেছেন এবং তার ফলে 'রাজসিংহে'র শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এ কথা না বলে উপায় নেই। জেবউন্নিসার চরিত্রসৃষ্টিতেও এই দোষ দেখা যায়। ঐতিহাসিক জেবউন্নিসা নিষ্কলঙ্কচরিত্রা, তিনি বিদুষী, কবি এবং নানা গুণে ভূষিতা ছিলেন। কিন্তু 'রাজসিংহে'র জেবউন্নিসা দুর্নীতিপরায়ণা, স্বৈরিণী এবং পশুর মত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি সম্পন্না। মানুচীর Storia do Mogor গ্রন্থের মতে জেবউন্নিসার ভগ্নী ফখরউন্নিসার এইসব দোষ ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা জেনেও তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের নাম 'ফখরউন্নিসা' না রেখে 'জেবউন্নিসা' রেখেছেন; সম্ভবত 'ফখরউন্নিসা' নামটি তার কাছে ভাল না লাগার জন্যেই তিনি এ রকম করেছেন, কিন্তু তিনি চরিত্রটির কোন কাল্পনিক নাম দিলেই তো পারতেন; মহীয়সী মহিলা জেবউন্নিসার নামকে এইভাবে কালিমালিপ্ত করার কোন প্রয়োজন ছিল না; এর ফলে পাঠকের সংস্কার আহত হয়েছে এবং উপন্যাসের রসও কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাজসিংহের আর একটি ত্রুটি এই যে, এই উপন্যাসে নিষ্প্রয়োজনে অনেক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এবং তারও মধ্যে অনেক ভুল আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পঞ্চম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে জিজিয়া কর সংক্রান্ত প্রসঙ্গটির উল্লেখ করতে পারি।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'রাজসিংহে'র মধ্যে যে কিছু ত্রুটি আছে, তা আমরা দেখতে পেলাম। অন্য দিক দিয়ে এর মধ্যে ত্রুটি খুবই সামান্য। তবে মবারকের সর্পাঘাতে মারা গিয়ে কবরস্থ হবার পরেও পুনর্জীবন লাভের

ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। অবশ্য উপন্যাসের প্রচণ্ড দ্রুত গতির ফলে এই ব্যাপারের অসম্ভাব্যতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি পড়তে পারে না। তবুও বলতে হয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই প্রায়-অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা না থাকলেই ভাল হত। মবারকের কবরস্থ হওয়া না দেখিয়ে জেবউন্নিসার কাছে মবারকের মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছোনো দেখালেও ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য সাধিত হত। 'রাজসিংহে'র পঞ্চম খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে চঞ্চলকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধে যে জ্যোতিষ গণনার উল্লেখ আছে এবং পরে যার সার্থকতা দেখানো হয়েছে, সেটিও অলৌকিক এবং অবান্তর প্রসঙ্গ। উপরে যে আলোচনা করা হল, তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, 'রাজসিংহ' উচ্চস্তরের উপন্যাস হলেও তার মধ্যে কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। আমাদের মনে হয় এই কারণেই 'রাজসিংহ'—'বিষবৃক্ষ' ও 'কপালকুণ্ডলা'র সমপর্যায়ভুক্ত উপন্যাস বলে গণ্য হতে পারে না।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কপালকুণ্ডলা'—এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে কোনটি আপেক্ষিক-ভাবে শ্রেষ্ঠ, তা বলা খুবই কঠিন। অবশ্য এক দিকে 'কপালকুণ্ডলা' শ্রেষ্ঠ, কারণ এই উপন্যাসটি প্রায় নিখুঁত সৃষ্টি। পক্ষান্তরে, 'বিষবৃক্ষে'র মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়; এরকম একটি বাস্তবধর্মী উপন্যাসে কুন্দের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্দর্শনের বর্ণনা এবং হীরামণির অন্তর্ধান ও প্রত্যাবর্তনের চমকপ্রদ কাহিনী কোনমতেই মানায় না। এই উপন্যাসে সামাজিক প্রতিবেশকে একেবারেই ফোটানো হয়নি, এটিও এর একটি ত্রুটি, নগেন্দ্র দত্তের বাড়ী থেকে দুটি যুবতী স্ত্রীলোক নিরুদ্দেশ হয়ে বেশ কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করার পরে ফিরে এল—অথচ সমাজে তার কোন প্রতিক্রিয়া হল না, এ-ও বড় আশ্চর্য লাগে। কিন্তু এই ত্রুটিগুলি বাহ্য, এগুলির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের প্রাণ-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। 'কপালকুণ্ডলা'র মত ত্রুটিহীন সৃষ্টি না হলেও 'বিষবৃক্ষ' যে 'কপালকুণ্ডলা'র চেয়ে মহত্তর সৃষ্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'কপালকুণ্ডলা'তে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র সুর মূর্ছিত হয়েছে, কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' দেখি নানা সুরের সমাবেশ—কোন সুর কোমল, কোন সুর কঠোর, কোন সুর মৃদু, কোন সুর উদাত্ত। 'কপালকুণ্ডলা'তে একটিমাত্র চরিত্রই পূর্ণাঙ্গরূপে পরিস্ফুট, কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' বহু চরিত্র সৃষ্ট হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে রক্তমাংসে সজীব হয়ে। 'কপালকুণ্ডলা'তে

যে ট্র্যাজেডি রূপায়িত হয়েছে, তার তুলনায় 'বিষবৃক্ষে'র ট্র্যাজেডি অনেক গভীর ও মর্মস্পর্শী। 'কপালকুণ্ডলা'র সৌন্দর্য একটি ফুলের তোড়ার সৌন্দর্যের মতই মধুর ও সুকুমার, কিন্তু 'বিষবৃক্ষে'র সৌন্দর্যের মধ্যে একটা বিশাল ব্যাপ্তি ও অপরিসীম বৈচিত্র্য আছে, তা যেন গিরিনদী-অরণ্য উপত্যকা-সঙ্কুল এক বিরাট ভূখণ্ডের সৌন্দর্যের সমজাতীয়। 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে অনেক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পূর্বসূরীদের প্রভাব পড়েছে, কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' সম্পূর্ণভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি। এই সমস্ত কারণেই আমার মনে হয়, 'বিষবৃক্ষ' 'কপালকুণ্ডলা'র চেয়েও সার্থকতর উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে তারই স্থান সর্বোচ্চে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ‘নানা প্রবন্ধ’

সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের মধ্যেও আবার শ্রেণী-বিভাগ আছে। এক শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে বিষয়বস্তুই প্রধান, এইজন্য এদের ‘বস্তুগত প্রবন্ধ’ বলা হয়। যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে বিষয়বস্তুর একটি সুনির্দিষ্ট সার্থক পরিচয় পরিস্ফুট করে তোলা ভিন্ন এইসব প্রবন্ধের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য চিন্তার মৌলিকতা এবং প্রকাশভঙ্গীর লাবণ্যও এই জাতীয় প্রবন্ধে থাকতে পারে, কিন্তু তা থাকা তাদের পক্ষে অপরিহার্য নয়। এ ছাড়াও আর এক ধরনের প্রবন্ধ আছে, যাতে বিষয়বস্তু নিতান্ত অপ্রধান স্থান অধিকার করে। তাদের মধ্যে নামমাত্র বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে লেখকের অন্তরের কথা আত্মপ্রকাশ করে, তার ফলে লেখকের হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপিত হয়। এই সব প্রবন্ধে যুক্তির তুলনায় আবেগ, তথ্যের তুলনায় কল্পনা প্রাধান্য লাভ করে এবং স্মৃতি-বিজড়নের স্নিগ্ধতায়, গীতি-মাধুর্যের রমণীয়তায় এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি একটি অপূর্ব লালিত্যে মণ্ডিত হয়। এদের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তা ও অনুভূতি বিশেষভাবে রূপায়িত হয় বলে এদের ‘ব্যক্তিগত প্রবন্ধ’ বলা হয়।

বঙ্গদর্শনের বিশিষ্ট লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ‘নানা প্রবন্ধ’ গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি উল্লিখিত দুটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথমটির অন্তর্গত। এই প্রবন্ধগুলি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এদের সম্বন্ধে এপর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই অভাব খানিকটা পূরণ করা। এগুলি বস্তুগত প্রবন্ধ হলেও এদের প্রকাশভঙ্গীর ঐশ্বর্য উপেক্ষণীয় নয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্যরস ও প্রসাদগুণেরও অভাব নেই।

এখন ‘নানা প্রবন্ধে’র প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যাক। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন ও শিক্ষাদীক্ষা যে তাঁর রচনার মধ্যে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে, ‘নানা প্রবন্ধে’র প্রবন্ধগুলিতে তারই উজ্জ্বল নিদর্শন মেলে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলে তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধই হয় ইতিহাসবিষয়ক না হয় দর্শনবিষয়ক। ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে আবার চারভাগে ভাগ করতে পারি,—(ক) প্রাচীন ভারত

ও প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, যেমন, 'ভারতমহিমা', 'ঐতিহাসিক ভ্রম' এবং 'প্রাচীন ভারতবর্ষ'; (খ) প্রাচীন কবি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, যেমন, 'বিদ্যাপতি' এবং 'শ্রীহর্ষ'; (গ) মানবসমাজ ও মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, যেমন, 'সমাজ বিজ্ঞান' 'মনুষ্য ও বাহ্যজগৎ' এবং 'জ্ঞান ও নীতি'; (ঘ) পুরাণ ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ, যেমন, 'দেবতত্ত্ব'।

এই বইটির মধ্যে পাঁচটি দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ আছে—'চার্বাক দর্শন', কার্যকারণসম্বন্ধ', 'ভাষার উৎপত্তি', 'প্রতিভা' এবং 'কোমত দর্শন'।

এখন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

'নানা প্রবন্ধে'র অন্তর্গত ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে রাজকৃষ্ণ বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সর্বসাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন এবং সেগুলি সম্বন্ধে তার সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলি থেকে আমরা যেমন রাজকৃষ্ণের ইতিহাসে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাই, তেমনি নীরস তথ্যকে সরস করে তোলার ব্যাপারে তার কুশলতারও পরিচয় পাই। এই প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণের খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল। ইতিহাস যে শুধু রাজারাজড়াদের ইতিবৃত্ত নয়, জনসাধারণের ইতিহাসই যে প্রকৃত ইতিহাস—এ কথা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেন বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে এই কথা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

"এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অল্পস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্ব-সাধারণ প্রজাদের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম, শিল্প, শাস্ত্র কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল, প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়. ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করি না।'

রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন। সুতরাং তিনি বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের এই প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তাতে কোন

সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তার পিছনে রাজকৃষ্ণের ইতিহাস-চিন্তার খানিকটা প্রভাব রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

ইতিহাসঘটিত যে সব প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন বাংলার কথা বলেছেন সেগুলির আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি। রাজকৃষ্ণের সাহিত্যজীবনের দীক্ষাগুরু বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁরই সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়ে লেখকরূপে রাজকৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব। এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনার অনুপ্রেরণাও রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালির বাহুবল', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রভৃতি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাজকৃষ্ণের 'ভারতমহিমা', 'ঐতিহাসিক ভ্রম' প্রভৃতি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সাধর্ম্য সকলেই লক্ষ্য করবেন। অবশ্য রচনাভঙ্গীর দিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলির সঙ্গে রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধগুলির পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁর স্বাদেশিকতাবোধ, তাই তাদের মধ্যে যুক্তি ও তথ্যের পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের আবেগও অভিব্যক্ত হয়েছে। রাজকৃষ্ণের এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধের নিদর্শন যে নেই তা নয়, তিনি এদের ভিতরে ইতিহাসের দৃঢ়ভিত্তিভূমি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে মাতৃভূমির গ্লানি মোচনের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাঁর আলোচনায় যুক্তিশৃঙ্খলাই প্রাধান্য লাভ করেছে, তার মধ্যে হৃদয়ের উত্তাপ আদৌ অনুভূত হয় না। রাজকৃষ্ণের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক চেতনাই এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। 'ভারত-মহিমা' প্রবন্ধে তিনি ভারতসন্তানদের আত্মবিস্মৃতির জন্য তাদের সম্বোধন করে খেদ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা ঐতিহাসিকের খেদ, তার মধ্যে কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাসের নিদর্শন মেলে না।

'নানা প্রবন্ধে' 'বিদ্যাপতি' ও 'শ্রীহর্ষ' সম্বন্ধে যে দুটি প্রবন্ধ আছে, তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। লেখক এই দুটি প্রবন্ধে প্রাচীন বিবরণ, প্রাচীন শাস্ত্র ও প্রাচীন কাব্য থেকে প্রমাণ আহরণ করে এই দুই কবির দেশ ও কাল সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এদের মধ্যে 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, কারণ বিদ্যাপতি যে মিথিলার লোক ছিলেন তা এই প্রবন্ধেই সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয়। রাজকৃষ্ণ এই দুই প্রবন্ধে বিদ্যাপতি ও শ্রীহর্ষের কবিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন

আলোচনা করেননি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনারীতির পার্থক্য দেখাবার জন্য তিনি শুধু তাঁদের পদ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, এ বিষয় সম্বন্ধে নিজের কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেননি। এর থেকে বোঝা যায়, সাহিত্য সমালোচনার দিকে রাজকৃষ্ণের তেমন প্রবণতা ছিল না।

'নানা প্রবন্ধে'র যে সব প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ মানব-সমাজ ও মানব-সভ্যতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রচনাকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে মানব-সভ্যতার উন্নতি হয়েছে, যেমন সমাজে শৃঙ্খলার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ন্যায় ও নীতির বিধানের প্রতি মানুষের আনুগত্যবোধ জাগ্রত হয়েছে, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে আদিমযুগের বিশৃঙ্খল যথেচ্ছাচারিতা দূর হয়ে দাম্পত্যপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছে, বর্বরোচিত দাসত্বপ্রথার অবসান হয়েছে; এগুলি লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'দেবতত্ত্ব' প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও রচনা-কুশলতার সঙ্গে লেখকের মৌলিক চিন্তারও পরিচয় মেলে। প্রবন্ধটির মধ্যে স্থানে স্থানে তথ্যের ব্যূহ ভেদ করে লেখকের ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাঁহার 'দেবতত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা একদিকে যেমন আমাদের নব নব কৌতূহল জাগ্রত করে, তেমনই আলোচনার ধারার ভিতরে একটা হেঁয়ালিহীন পরিচ্ছন্নতা আছে,—প্রকাশভঙ্গির ভিতরে অনাড়ম্বর সরলতা আছে।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টি নিয়ে যেভাবে পৌরাণিক দেবদেবীদের পরিকল্পনার এবং তাদের সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ও অনেক ক্ষেত্রে কুৎসাপূর্ণ কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। "ভট্ট মোক্ষমূলর" প্রদর্শিত "দেবতত্ত্ব-ব্যাখ্যা"র কাছে তিনি নিশ্চয়ই ঋণী, কিন্তু তাঁর নিজের মৌলিক ব্যাখ্যাও প্রবন্ধটির মধ্যে কয়েকটি আছে। এগুলির শুধু তত্ত্বমূল্যই নেই, রসমূল্যও কিছু আছে।

দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়ও রাজকৃষ্ণ পাণ্ডিত্য ও রচনাদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনটিতে তিনি প্রতিভা, ভাষার উৎপত্তি, কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি কূট বিষয়বস্তুর দর্শনশাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট দুটি প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় চার্বাকদর্শন ও

কোম্‌ত দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন ও তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রাজকৃষ্ণের যে কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার আশ্চয ক্ষমতা ছিল, এই প্রবন্ধগুলি থেকে তার প্রমাণ মেলে।

'নানা প্রবন্ধে'র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি জ্ঞানের সাহিত্য বা Literature of Knowledge-এর শ্রেণীভুক্ত। এই দিক্ দিয়ে আমরা এই প্রবন্ধগুলির অসীম উপযোগিতা উপলব্ধি না করে পারি না। যে বিষয় নিয়েই রাজকৃষ্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে তিনি তার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। যথোচিত যুক্তি প্রদর্শন না করে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি; যেখানে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ধারণার কথা বলেছেন, সেখানে তার কারণটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে তিনি ভোলেননি। অবান্তর কথা তিনি কোন জায়গায়ই বলেননি। অহেতুক উচ্ছ্বাসের কোন নিদর্শন তাঁর কোন প্রবন্ধে মেলে না। মিতভাষিতার সংযম তাঁর প্রবন্ধগুলির গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য। দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেই তাঁর দক্ষতার সবচেয়ে বেশী পরিচয় মেলে। এগুলির মধ্যে তিনি নানারকম দুরূহ দার্শনিক বিষয়কে যেভাবে বাংলা ভাষায় সহজ ও সর্বজনবোধ্য আকারে উপস্থাপিত করেছেন, তা অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচায়ক। পারিভাষিক শব্দের অভাব তাঁকে লেশমাত্রও বিচলিত করতে পারেনি। তাঁর কি দার্শনিক, কি ঐতিহাসিক সর্ববিধ প্রবন্ধ সে যুগে বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডারের অনেক অপূর্ণতা মোচন করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য তথ্যপ্রধান প্রবন্ধের একটি ত্রুটি এই যে, তার সমাদর পরবর্তীকালে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হলে স্বতই হ্রাস পায়। রাজকৃষ্ণের অনেক প্রবন্ধ বর্তমান কালের বিচারে অনেকখানি মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটিরই উল্লেখ করতে পারি। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অজস্র নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ফলে রাজকৃষ্ণের অনেক সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয়েছে এবং তাঁর এই প্রবন্ধ কালবারিত হয়ে পড়েছে। এই প্রবন্ধ সেযুগে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং মনীষী গ্রীয়ারসনকে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে গবেষণার প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছিল, কিন্তু আজকের দিনে প্রবন্ধটি আমাদের কোন নতুন আলোক দান করতে

পারে না। জ্ঞানের সাহিত্যের উন্নততর সংস্করণ হওয়া সম্ভব এবং হলেই পুরাতন সংস্করণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধগুলির বেলাতেও যে তা হবার আশঙ্কা নেই. সেকথা বলা যায় না। তবুও বর্তমান যুগে এই প্রবন্ধগুলি উপেক্ষিত হবে না, কারণ এদের মধ্যে এমন কয়েকটি চিন্তার পরিচয় রয়েছে, যেগুলি এখনও পর্যন্ত খণ্ডিত হয়নি। রামের অহল্যাকে মুক্ত করার কাহিনীর রূপক রাজকৃষ্ণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা তার সঙ্গে অভিন্ন, অবশ্য তা অধিকতর মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী ; রবীন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ থেকেই অহল্যা-কাহিনীর রূপক-ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের যে উপাদেয় চিত্র রাজকৃষ্ণ অঙ্কন করেছেন, আজকের দিনেও তার সজীবতা ও আকর্ষণীয়তা বিশেষ হ্রাস পায়নি। আর কিছু না হোক্ রাজকৃষ্ণের অসামান্য পাণ্ডিত্য, যুক্তির স্বচ্ছতা, বক্তব্যের স্পষ্টতা এবং ভাষার অনায়াসগম্যতাই তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বিস্মৃতির কবল থেকে রক্ষা করবে বলে আমাদের মনে হয়। তা ছাড়া এইসব প্রবন্ধের অধিকাংশের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণই সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় আলোচনা করেছেন বলে পথিকৃৎ হিসাবেও চিরদিন তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এখন 'নানা প্রবন্ধে'র ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। আমরা এই বইয়ের ভাষার মধ্যে একটা লঘু ও স্বচ্ছন্দ গতি অনুভব করি। প্রতিকটু আভিধানিক শব্দের সমাবেশ বা অবান্তর বর্ণনার অনাবশ্যক আড়ম্বরে এ ভাষা কোথাও আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি।

'নানা প্রবন্ধে'র অধিকাংশ প্রবন্ধই সহজ সাধুভাষায় রচিত। সামান্য কয়েক জায়গায় রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত শব্দবহুল জটিল বাক্যগঠনরীতি অবলম্বন করেছেন। এই প্রবন্ধগুলিতে রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমের প্রবন্ধাবলীর ভাষাকে অনুসরণ করলেও তার সঙ্গে প্রচুর তদ্ভব ও দেশী শব্দ মিশ্রিত করে তার প্রাঞ্জলতা ও স্থিতি-স্থাপকতা বৃদ্ধি করেছেন এবং এই মিশ্রণের মধ্যে তিনি যথেষ্ট কৌশল ও পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। রাজকৃষ্ণ জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। এই বিশেষ ধরনের ভাষাই তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য যে প্রবন্ধে দুরূহ বিষয়কে সর্বজনবোধ্য করবার প্রচেষ্টা করা হয়, সে প্রবন্ধের ভাষা স্বতই সরল ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

এখানে রাজকৃষ্ণের ভাষার সার্থকতার নিদর্শনস্বরূপে আমরা তাঁর 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি,

"এইরূপে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স কাটাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করে। তখন তাহারা চিক্কণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান করে এবং অঙ্গুলে ও কর্ণেও স্বর্ণাভরণ ধারণ করে। মাংস খায়, কিন্তু শ্রমসহায় জীবের নহে, এবং অধিক সংখ্যক সন্তানের আশায় যত ইচ্ছা তত বিবাহ করে।"

সুনির্বাচিত উপমা ও রূপকের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য একাধিক স্থানে বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যেমন,

"চিন্তাস্রোত অবিরাম বহিতেছে; সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন গতির স্থিরতা নাই, কখন এদিকে কখন ওদিকে কখন সেদিকে যাইতেছে। মনোনিবেশ কর, দেখিবে দুইপাশে দুইটি অনতিক্রম্য তীর, সন্নিকর্ষ ও সাদৃশ্য; উভয়ের মধ্য দিয়াই স্রোতের গতি; উভয়ের আঘাতেই স্রোতের বিচিত্রতা।" (প্রতিভা)

লেখক সর্বত্রই অচল অটল গাম্ভীর্যের অন্তরাল থেকে পাঠককে উপদেশ দেননি, লঘু পরিহাসের ভঙ্গীও তার রচনায় বিরল নয়।

নানা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও দু'একটি ত্রুটির জন্য 'নানা প্রবন্ধে'র ভাষাকে আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলতে পারি না। যত্রতত্র সম্ভ্রমার্থক ক্রিয়ার প্রয়োগ ও স্থানে স্থানে গুরুচণ্ডালী দোষ তার প্রধান ত্রুটি। রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত ও ইংরেজী থেকে যেসব অংশ অনুবাদ করেছেন, সেগুলিও স্থানে স্থানে সুবোধ্য হয়নি। এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণের ভাষা এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব-চিহ্ন ধারণ করে আছে। সম্পূর্ণ বস্তুগত Objective প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে এতখানি মসৃণতা ও প্রসাদগুণ সত্যই আশা করা যায় না এবং এর জন্য লেখককে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন না জানিয়েও আমরা পারি না।

বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে 'নানা প্রবন্ধে'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর ও বহুমুখী। প্রকৃত সমাজসেবীর মনোভাব নিয়ে তিনি তাঁর এই পাণ্ডিত্যকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। 'নানা প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলি তারই নিদর্শনস্বরূপ। এদের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ের জ্ঞানকে যেভাবে অত্যন্ত সরল ও সুন্দর ভাষায় বাঙালী জন-

সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করছেন, তা একাধারে তাঁর মনীষা, সহৃদয়তা ও রচনাকুশলতার পরিচয় বহন করছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়েরই একখানি ছাত্রপাঠ্য বই ('প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস') সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,

"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

"মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।"

'নানা প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। এই প্রবন্ধগুলির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ে, যখন আমরা স্মরণ করি এগুলি একজন যুবক লেখকের রচনা। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। তারই মধ্যে তিনি অতুলনীয় মনীষার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

সবশেষে, 'নানা প্রবন্ধ' সাহিত্যগ্রন্থ বলে গণ্য হতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। বাংলার এক শ্রেণীর আধুনিক সমালোচকের (এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও আছেন) মতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রবন্ধই* সাহিত্যের পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য, বস্তুগত প্রবন্ধগুলি "কেজো লেখা" বলে 'সাহিত্য' আখ্যা পেতে পারে না। এইসব "রসাবিষ্ট" সমালোচকরাই আমাদের সাহিত্যের ভাগ্যবিধাতা হয়ে আছেন বলে আমাদের দেশে কাব্য, কথাসাহিত্য এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধের (এগুলির নতুন নাম হয়েছে "রম্যরচনা") লেখকরা ছাড়া আর কেউ সাহিত্যিক বলে গণ্য হন না। অথচ আর সব দেশে ইতিহাস, দর্শন, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, এমন কি জনপ্রিয় বিজ্ঞান-গ্রন্থেরও লেখকদেরও সাহিত্যিক বলে গণ্য করা হয়, ভাষা ও রচনাভঙ্গীর উৎকর্ষকেই সেখানে সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে 'নানা প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলিকে আমরা নিশ্চয়ই "সাহিত্য" আখ্যায় অভিহিত করতে পারি।

* রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগত প্রবন্ধও রচনা করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'স্ত্রীলোকের রূপ' নামে যে চমৎকার প্রবন্ধটি আছে, সেটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক ঃ 'জনা'

গিরিশচন্দ্র নানা ধরনের নাটক লিখেছিলেন। পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন—সমস্ত শ্রেণীরই নাটক তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। কিন্তু সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়ে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি বচেযে উল্লেখযোগ্য। তার কাবণ গিরিশচন্দ্র অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক হিসাবে বাংলার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি জানতেন পৌরাণিক নাটকই বাঙালী দশকদের মনে সব চাইতে বেশী রেখাপাত করে। এদেশের লোকেব সবচেযে প্রিয সাহিত্য—পুরাণ। আর এদেশের লোকেবা একান্তভাবে ধর্মপ্রাণ। সেইজন্য পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে ধর্মমূলক নাটক রচনা করলে সে নাটকের সহজেই জনপ্রিয হযে ওঠার সম্ভাবনা। তাছাড়া রামকৃষ্ণ-শিষ্য গিরিশচন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে স্বভাবতই আগ্রহী ছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি বিশেষভাবে পৌরাণিক নাটকই রচনা করে গিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্রের পৌবাণিক নাটকগুলিকে অনেকে 'যাত্রা' বলেন। কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত রযেছে এবং উন্নাসিকেব দৃষ্টি পরিহাব করলে আমরা দেখতে পাব, তার মধ্যে গিবিশচন্দ্রেব অগৌরবের কিছুই নেই। আধুনিক নাটকের আবিভাবের আগে যাত্রাই ছিল আমাদের একমাত্র "নাট্য-সাহিত্য"। যাত্রা গীত পরম্পরার মধ্য দিযে অভিনীত হত এবং তার বিষযবস্তু হত একান্তভাবে পৌরাণিক ও ধর্মমলক। গিরশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি যাত্রাকে বিষয়বস্তুর দিক্ দিযে সম্পূর্ণভাবে এবং গীতি-প্রাধান্যের দিক্ দিযে আংশিকভাবে অনুসরণ করেছে। তাদেব বহিরাঙ্গিক পাশ্চাত্ত্য নাটকের মত হলেও অন্তর্বৈশিষ্ট্য যাত্রারই অনুরূপ। অর্থাৎ গিবিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি প্রাণধর্মের দিক্ দিযে বাংলার নিজস্ব নাট্যধারার ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছে। পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে বিচার করলে এদের মধ্যে হযত অনেক পরিমাণে নাট্যগুণের অভাব দেখা যাবে; কিন্তু এই নাটকগুলির সব-চেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে অন্তঃপ্রকৃতির দিক্ দিযে এরা খাঁটি বাঙালী—এদের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিজাতীযতা নেই। অর্থাৎ আমাদের দেশের ঐতিহ্য অনুযাযী

আমাদের নাটক যেমন হওয়া উচিত, এগুলি ঠিক তা'ই, দোষ-গুণ তাদের মধ্যে যা ই থাকুক না কেন।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'জনা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 'জনা' নাটকের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে। সংস্কৃত পুরাণের মধ্যে জৈমিনি-সংহিতা ও অগ্নিপুরাণে এই কাহিনীটি পাওয়া যায়, সেখানে রানীর 'জনা'র বদলে 'জ্বালা' নাম পাই। গিরিশচন্দ্র এইসব সংস্কৃত পুরাণ থেকে তাঁর নাটকের কোন উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কাশীরামের মহাভারতে আলোচ্য কাহিনীটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে তাকে অনেকখানি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকের অনেক পরিস্থিতি তাঁর কল্পনার সৃষ্টি। 'জনা' নাটকের চরিত্রগুলির অধিকাংশই কাশীরামের মহাভারত থেকে নেওয়া। কাশীরামের মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রকে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে নতুন বর্ণে রঞ্জিত করেছেন। কাশীরামের মহাভারতের প্রবীর দুর্বিনীত ও অদূরদর্শী প্রকৃতির যুবক এবং নিতান্ত সাধারণ স্তরের যোদ্ধা, অর্জুনের সঙ্গে অল্পক্ষণ যুদ্ধ করেই সে মারা যায়। 'জনা' নাটকের প্রবীর অদ্বিতীয় বীর ও মাতৃভক্ত, দৈবশক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে সে শেষ পর্যন্ত অর্জুনের হাতে প্রাণ দিয়েছে। জনা চরিত্রটিকে গিরিশচন্দ্র যে অপূর্ব গরিমায় মণ্ডিত করেছেন, কাশীরামের মহাভারতে তার আভাস মেলে না।

কাশীরামের মহাভারত ছাড়া গিরিশচন্দ্র আর এক জায়গা থেকে তার নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সেটি হচ্ছে মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতা। মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট 'জনা' চরিত্রের তুলনামূলক বিচার আমরা পরে করব।

কাশীরাম ও মধুসূদনের কাছ থেকে গিরিশচন্দ্র 'জনা' নাটকের পরিকল্পনাটি পেয়েছেন সত্য, কিন্তু 'জনা' নাটকে যে ভক্তিরসের প্রাবল্য দেখা যায়, তা সম্পূর্ণভাবেই গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি।

'জনা' পৌরাণিক নাটক হিসাবে কতখানি সার্থক হয়েছে, তার বিচার করতে

হলে প্রথমে জানা দরকার, পৌরাণিক নাটক কাকে বলে ? পৌরাণিক নাটকের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। প্রথম, তার বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে সংগৃহীত হবে ; অবশ্য নাটকের প্রয়োজনে নাট্যকার কাহিনীর ও চরিত্রগুলির রূপান্তর সাধন করতে পারেন ; কিন্তু পুরাণের মূল আদর্শকে তাঁর নাটকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরস প্রাধান্য লাভ করবে এবং নাটকের শেষে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, পৌরাণিক নাটকের ভাষা হবে প্রাচীনগন্ধী ; এই কারণে পৌরাণিক নাটকের সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ্যে রচিত হয়।

'জনা'র বিষয়বস্তু পুরাণ থেকেই সংগৃহীত। অবশ্য গিরিশচন্দ্র নাটকের মধ্যে পুরাণ-বহির্ভূত অনেক নতুন বিষয় সন্নিবেশ করেছেন ; যেমন, অগ্নির নীলধ্বজ-পরিবারকে বরদান, প্রবীর-নিধনে কৃষ্ণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, গঙ্গারক্ষক-দের কার্যকলাপ প্রভৃতি ; প্রবীরকে বধ করার জন্য মহাদেবের সঙ্গে কৃষ্ণের চক্রান্ত এবং তার ফলে অন্যায় যুদ্ধে প্রবীরের পতনও নাট্যকারের সংযোজনা ; তবে এক্ষেত্রে তাঁর উপরে মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। যাহোক্, গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে এই যে নতুন বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন, এ কাজ তিনি নাটকের প্রয়োজনেই করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি পুরাণের আদর্শ আদৌ খর্ব করেননি।

'জনা'র অধিকাংশ চরিত্রই পৌরাণিক। যেগুলি পৌরাণিক নয়, সেগুলিও পৌরাণিক আদর্শের অনুগ। কয়েকটি চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বিদূষক। জনা ও প্রবীরের চরিত্রকে গিরিশচন্দ্র নতুন মহিমায় মণ্ডিত করেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। অন্য কোন কোন চরিত্রকেও তিনি নতুন মহিমা দান করেছেন এবং সমস্ত চরিত্রের ক্ষেত্রেই পৌরাণিক আদর্শ অম্লান রেখেছেন।

এখন, পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের যে স্থান, তা 'জনা'তে অক্ষুণ্ণ আছে কিনা, সেই প্রশ্নের বিচার করতে হবে। 'জনা' নাটকে আমরা অনেকগুলি ভক্ত-চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই ; এদের বিভিন্নজনের ভক্তি বিভিন্ন ধরনের ; নীলধ্বজের মধ্যে দেখি প্রকাশ্য কৃষ্ণভক্তি ; জনার মধ্যে দেখি গঙ্গাভক্তি ; প্রবীরের মধ্যে মাতৃভক্তি ; স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর মধ্যে পতিভক্তি এবং বিদূষকের মধ্যে আমরা পাই প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণভক্তি। এদের প্রত্যেকেরই ভক্তির বিশদ বর্ণনা

আমরা এই নাটকে পাই এবং তার মধ্য দিয়ে প্রভূত পরিমাণে ভক্তিরস সৃষ্ট হয়েছে। 'জনা' নাটকে নাট্যকার আর একটি সত্যকে তুলে ধরেছেন; সেটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তার কোন কোন কাজ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রীতিকর হলেও পরিণামে (মৃত্যুর পরে) তাতে মঙ্গল হয়। এর মধ্য দিয়ে ভক্তিধর্মেরই মাহাত্ম্য স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং 'জনা'র মধ্যে পৌরাণিক নাটকের প্রধান লক্ষণগুলি পরিপূর্ণভাবেই পাওয়া যাচ্ছে।

অবশ্য 'জনা' নাটকে ভক্তিরসের প্রাবল্যের মাঝখানেও কিছু কিছু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবীর ও জনার মধ্যে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন দেখি। প্রবীর কৃষ্ণকে মঙ্গলময় বলে স্বীকার করেন, তার কাছে আত্মসমর্পণও করেনি। জনা ভগবান কৃষ্ণ ও তার কৃপাধন্য অর্জুনের প্রতি রোষবহ্নি উদগীরণ করেছেন। এই দুটি চরিত্রে মধ্যে যেন পৌরাণিক নাটকের চিরন্তন আদর্শের বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের খানিকটা নিদর্শন পাওয়া যায়।

পৌরাণিক নাটকে ভক্তিভাবের প্রাধান্যের ফলে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত তেমন স্ফূর্তি পায় না। 'জনা'তেও পায়নি। তবে এই নাটকের জনা ও প্রবীরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি নিয়তির চক্রান্তে তাদের পুরুষকার বার বার পরাজয় স্বীকার করছে। এর মধ্যে কিছু বহির্দ্বন্দ্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রবীরকে যুদ্ধে পাঠানোর সময় জনার চরিত্রে খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের নিদর্শনও আমরা পাই।

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অভাবের জন্য পৌরাণিক নাটকে সাধারণত উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি সৃষ্ট হয় না। কিন্তু 'জনা' নাটকে জনা চরিত্রের পরিণামে একটি চমৎকার ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের চিরন্তন আদর্শ শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডিটির তীব্রতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে। নাটকের ক্রোড় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজকে দেখালেন যে মৃত্যুর পর প্রবীর, মদনমঞ্জরী, জনা সকলেই পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছে। এখানে নাট্যকার বলতে চান যে ইহজগতের শোক-দুঃখ-ক্ষয়ক্ষতি সবই ঈশ্বরের নির্বন্ধে ঘটে এবং মৃত্যুর পর মানুষ পরম গতি লাভ করে এই সব দুঃখকষ্ট সহ্য করার পুরস্কার পায়। এইভাবে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত ভক্তির শান্তিবারি সিঞ্চন করে ট্র্যাজেডির আগুনকে নিভিয়েছেন। ফলে শেষপর্যন্ত 'জনা' নাটকে আধুনিক আদর্শের উপরে পৌরাণিক আদর্শই জয়ী হয়েছে।

পৌরাণিক নাটকে নাট্যকার ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করেন। এর জন্য তিনি দৈবশক্তির কৃপায় মানুষের জীবন কেমনভাবে সার্থক হয় এবং দৈবশক্তির বিরূপতায় কীভাবে মানুষের সর্বনাশ হয়, তার বর্ণনা দেন। তার ফলে পাঠক-দর্শকের মনে দেবতার প্রতি আস্থা জাগে এবং মঙ্গল অমঙ্গল যে দেবতার ইচ্ছাতেই ঘটে এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়; এইভাবে নাট্যকার তাদের মনে ভক্তির ভিত্তি দৃঢ় করেন।

পৌরাণিক নাটকে পুরুষকারের স্থান গৌণ; তার মধ্যে প্রায় সব সময়েই দেখা যায় পুরুষকার দৈবশক্তির হাতের ক্রীড়নক। আধুনিক নাটকে কিন্তু পুরুষকারই প্রাধান্য লাভ করে। সেখানে মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজের শক্তিতে ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং সেই সংগ্রামই তার চরিত্রকে প্রদীপ্ত করে তোলে।

'জনা' নাটকে প্রথম থেকেই আমরা দৈবশক্তির প্রাধান্য দেখতে পাই; দেবতা অগ্নির বরদান পরবর্তী ঘটনারাজির অর্গল খুলে দিয়েছে। এই বরদানের ফলেই অর্জুনের সঙ্গে প্রবীরের যুদ্ধ হয়েছে। মহাবীর প্রবীর দৈবশক্তির চক্রান্তের ফলেই অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছে। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে জনার সমস্ত উদ্যম দৈবশক্তিই ব্যর্থ করে দিয়েছে, তার ফলে জনা উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছেন। জনার প্রাণবিয়োগও ঘটেছে দৈবশক্তির ইচ্ছায়—জাহ্নবী নিজে এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন।

এই নাটকে কোন কোন চরিত্র বিনা সংগ্রামেই দৈবশক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে। যেমন, রাজা নীলধ্বজ। বিদূষক এত সহজে দৈবশক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণ করেনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। জনা এবং প্রবীর কিন্তু কোন সময়েই আত্মসমর্পণ করেনি। তারা সংগ্রাম করে পরাজিত হয়েছে। প্রবীর পিতা, স্ত্রী, মন্ত্রী, সেনাপতি কারও নিষেধ না মেনে নির্ভয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছে—কৃষ্ণ ভগবান এবং অর্জুন তাঁর সখা সে কথা জেনেও। পাণ্ডব-বাহিনীর সঙ্গে প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করে প্রবীর অর্জুন-সমেত সমস্ত বীরকে পরাজিত করেছে। অস্ত্রশস্ত্র অপহৃত হবার পরে প্রবীরের আশাভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু মাথা তার নত হয়নি; তখনও সে অর্জুনের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে, অবশেষে নিহত হয়েছে। জনা প্রবীরের মৃত্যুর পরে প্রাণপণে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেছেন। নীলধ্বজ পাণ্ডবদের

সঙ্গে সন্ধি করাতে তিনি নীলধ্বজকে ধিক্কার দিয়ে যুদ্ধ করতে বলেছেন, কিন্তু নীলধ্বজ রাজি হননি। অবশেষে তিনি একাই প্রতিশোধ নিতে গিয়েছেন, কিন্তু দৈবশক্তি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। প্রবীর ও জনার ক্ষেত্রে পুরুষকার দৈবশক্তির কাছে পরাজিত হলেও তার দীপ্তি ম্লান হয়নি; তার সংগ্রাম নাটকে অত্যন্ত জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং সেখানে পরাজিত পুরুষকারই আমাদেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এইখানেও নাট্যকার পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

সাধারণ নাটকে দৈবশক্তির অবিমিশ্র প্রাধান্য দেখানো শিল্পসম্মত নয়; জীবনে দৈবশক্তির সঙ্গে পুরুষকারের সংগ্রামে জয় ও পরাজয় দুই-ই ঘটে, নাটকে নাট্যকার যদি কেবলমাত্র পরাজয়টাই দেখান. তবে তা অবাস্তব হয়ে যায়। পৌরাণিক নাটকে দৈবশক্তির প্রতি মানুষের ভক্তি জাগ্রত করবার জন্য নাট্যকার সব সময়েই দৈবশক্তির জয় দেখাতে বাধ্য হন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাট্যকারকে খানিকটা ক্ষেত্র প্রস্তুত কবতে হয, যাতে লোকে দৈবশক্তির উপর বিরূপ না হয়ে ওঠে। 'জনা' নাটকে তা যথোচিত পরিমাণে করা হয়নি বলে মনে হয়। এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব যেভাবে প্রবীরের প্রাণবধের জন্য চক্রান্ত করেছেন, তাতে আমাদের তাঁদের প্রতি ভক্তির বদলে অভক্তি জাগ্রত হয। সুতবাং এক্ষেত্রে নাট্যকারেব উদ্দেশ্য সম্পূণ সার্থক হয়নি। 'জনা'য দৈবশক্তি শেষপযন্ত জয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু তা আমাদের শ্রদ্ধা আকষণ কবতে পারেনি। দৈবশক্তির সঙ্গে পুরুষকাবের সংগ্রামের জীবন্ত ছবিটিই বরং 'জনা'কে আকর্ষণীয় কবেছে।

চরিত্রসৃষ্টি নাটকের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। কোন নাটকের চরিত্রগুলি যদি জীবন্ত না হয়, তবে সে নাটক সার্থক হয় না। নাটকেব চরিত্র নানা প্রবৃত্তির সমাবেশের ভিতর দিয়ে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্বের স্থান খুব কম বলে তার মধ্যে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। 'জনা' নাটকেও তাই দেখি অনেক চরিত্রই জীবন্ত হয়নি। কোন কোন চরিত্র ভক্তির চাপে পড়ে অস্বাভাবিক হয়ে গয়েছে। কিন্তু নাট্যকারের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও তিনি 'জনা'র কতকগুলি চরিত্রকে প্রাণবন্ত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছেন।

এই নাটকের সর্বপ্রধান চরিত্র জনা। সজীবতার দিক্ দিয়েও এই চরিত্রই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'জনা' চরিত্রের প্রতিটি রেখা এই নাটকের মধ্যে উজ্জ্বল, সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

জনা-চরিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য তাঁর মাতৃস্নেহ। তিনি একটি মাত্র পুত্রের জননী। পুত্রই তাঁর কাছে জীবনের সর্বস্ব, তাঁর মাতৃস্নেহ সব সময়েই পুত্রকে ঘিরে রয়েছে। পুত্রের মঙ্গলের জন্য জনা সর্বদা গঙ্গার পূজা করেন, পুত্র যথা-সময়ে ঘরে না ফিরলে তিনি ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠেন। তাই জনার পুত্র যখন জনাকে ছেড়ে চলে গেল, তখন জনার জীবনে আর কিছুই রইল না। পুত্রশোকের আঘাত পেয়ে এবং পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে না পেরে তিনি উন্মাদিনী হয়ে গেলেন এবং তারপর জীবন বিসর্জন দিয়ে সব জ্বালা জুড়োলেন।

জনার আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইষ্টদেবী গঙ্গার প্রতি তাঁর অচল একনিষ্ঠ ভক্তি। গঙ্গা ভিন্ন আর কোন দেবতার স্থান জনার হৃদয়ে নেই। সেইজন্য অগ্নি যখন নীলধ্বজ-পরিবারের সবাইকে বর দিলেন, তখন জনা এইমাত্র বর চাইলেন যে তিনি যেন জাহ্নবীর জলে জীবন বিসর্জন দিতে পারেন। জনা সর্বদা গঙ্গারই পূজা করেন। অগ্নি যখন জনাকে বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিব-দুর্গার পূজা করতে বললেন, তখন জনা তাতে রাজী হলেন না, কারণ গঙ্গা ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা তিনি করবেন না, দুর্গার তো নয়ই, দুর্গা গঙ্গার সপত্নী বলে জনা তাঁকে "ডাকিনী" বলে অভিহিত করলেন। গঙ্গাজলে জনার জীবন-বিসর্জনের মধ্যে জনার গঙ্গা-ভক্তি সার্থক পরিণতি লাভ করেছে।

কিন্তু জনা-চরিত্রের সবচেয়ে প্রধান ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর তেজ। এ রকম তেজস্বিনী নারী বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা গিয়েছে। প্রবীর যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাইল, তখন রাজা নীলধ্বজ থেকে সুরু করে তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্যবর্গ সকলেই তাকে নিরুৎসাহিত করলেন। একা জনা প্রবীরকে উৎসাহ দিলেন। শুধু তাই নয়, পুত্রের পক্ষ নিয়ে তিনি নীলধ্বজ এবং তাঁর মন্ত্রী-সেনাপতিদের সঙ্গে প্রচণ্ড উদ্যমে তর্ক করতে পশ্চাৎপদ হলেন না। এর মধ্যে শুধু তাঁর তেজস্বিতা নয়, বাগ্মিতারও উজ্জ্বল নিদর্শন পাই। এই অপূর্ব তেজস্বিতা ও বাগ্মিতা দিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত সকলকে স্বমতে আনতে সমর্থ হলেন।

প্রবীর যখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হল, তখন জনার তেজ বহ্নিশিখায়

জ্বলে উঠেছে। পুত্রের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে জনা পুত্রের জন্য শোক করেননি, তার বদলে তিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করেছেন। জনা তাঁর হৃদয়ের সমস্ত দাহ, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশ জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তারপর তিনি প্রতিশোধ নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নীলধ্বজের অসহযোগিতা এবং দৈবশক্তির চক্রান্তের ফলে তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। ব্যর্থমনোরথ জনা উন্মাদিনী হয়ে গিয়ে আহতা ফণিনীর মত কেবল নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরেছেন। এর মধ্য দিয়ে জনা-চরিত্র ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে। পুত্রবিয়োগের আঘাতের মধ্য দিয়ে জনার ট্র্যাজেডির সূচনা হয়েছিল, অদৃষ্টের কাছে তার ব্যক্তিত্বের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সেই ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়েই জনা-চরিত্র শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছে।

'জনা' নাটকে জনার পরেই বিদূষকের চরিত্র সবচেয়ে সুপরিস্ফুট। সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষার নাটকেই বিদূষকের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কিন্তু দুই ভাষার নাটকে বিদূষকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের কতকগুলি ধরাবাঁধা বৈশিষ্ট্য থাকে, বিদূষক হয় জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং রাজার সমবয়স্ক ও সতীর্থ; ভোজনে সে খুব পটু হয় এবং স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়ে সে হাস্যরস সৃষ্টি করে। ইংরেজী নাটকে বিদূষকের জাতি বা বয়স সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই; তাতে দু' ধরনের বিদূষক দেখতে পাওয়া যায় এক—Court-jester, যারা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করে; এবং দুই—Fool, যারা ভাঁড়ামি করে লোক হাসায়। কোন কোন ইংরেজী নাটকের বিদূষক-চরিত্রে আবার Court-jester ও Fool-এর বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক বা একাধিক বিদূষকের চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই চরিত্রগুলি প্রধানত সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের আদর্শে পরিকল্পিত। 'জনা' নাটকের বিদূষকও তাই। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ, রাজার বয়স্য, ভোজনপটু, এবং স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়ে সে লোক হাসায়।

হাস্যরস সৃষ্টি ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গিরিশচন্দ্র 'জনা'য় বিদূষক-চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র

ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেযেছেন। সরল বিশ্বাসই যে শ্রেষ্ঠ ভক্তি এই সত্যটি গিরিশচন্দ্র বিদূষক-চরিত্রের মধ্য দিযে ফুটিযে তুলেছেন। বিদূষকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে সচেতনভাবে সে কৃষ্ণদ্বেষী, কিন্তু তার অবচেতন মনে কৃষ্ণেব প্রতি গভীর বিশ্বাস। এক কথায সে প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণভক্ত। সে মনে ভাবে ও মখে বলে যে কৃষ্ণ যাদের কাছে যাবেন, তাদেরই সবনাশ হবে। এইজন্যে সে কৃষ্ণের নামও নিতে চাইত না। কিন্তু অবচেতন মনে তার বিশ্বাস ছিল যে একবাব মাত্র কৃষ্ণেব নাম করলেই মুক্তি পাওযা যায। এই বিশ্বাসের জোরেই বিদূষক শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছে। বিদূষকেব দ্বিতীয বৈশিষ্ট্য তার অসাধারণ প্রভুভক্তি। কৃষ্ণ নীলধ্বজের পুরীতে এলে পাছে তার প্রভুর অমঙ্গল হয়, এই ভেবেই সে সব সময অস্থির। রাজার মঙ্গলের জন্য বিদূষক কিছুই কবতে বাকী রাখেনি। প্রবীর পাণ্ডবদের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া ধরলে সে ঘোড়া চুরি করে পাণ্ডবদের শিবিরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে এবং গঙ্গারক্ষকদের—ঘোড়াটি চুরি করতে পারলে ব্রাহ্মণীর হীরের কণ্ঠিটি অবধি দেবার প্রতিশ্রুতি দিযেছে।

এই নাটকে বিদূষক যে হাস্যরস পরিবেশন কবেছে, তা প্রাযই স্থূল। এর দৃষ্টান্তস্বরূপে তার কৃষ্ণনিন্দা এবং গঙ্গারক্ষকদের সঙ্গে কথোপকথনেব অংশ-গুলির উল্লেখ করা যায। এসব জাযগায তার ভাষা স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হযেছে। তবে কযেক জাযগায তাব কাযকলাপে উপভোগ্য হাস্যরস সৃষ্টি হযেছে. দৃষ্টান্তস্বরূপ তাব সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি বিসর্জন দিযে অবশেষে ব্রাহ্মণীর ইতুভাঁড়কেও জলে ফেলার চেষ্টা করা এবং বাক্‌চাতুরীব মধ্য দিযে বৈষ্ণের শালগ্রামশিলা হস্তগত করা—এগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

'জনা' নাটকের বিদূষক-চরিত্র উপভোগ্য হলেও সম্পূর্ণ সার্থক হযনি। না হবার প্রধান কারণ, বিদূষক যে বাইবে কৃষ্ণদ্বেষী হলেও অন্তরে কৃষ্ণভক্ত, এই রহস্যটি নাট্যকার নাটকের প্রথমেই উদ্‌ঘাটিত কবে দিযেছেন। এটি নাটকেব শেষে উদ্‌ঘাটন করলে একটা অপ্রত্যাশিত চমৎকৃতি সৃষ্ট হত, তার ফলে নাটকেব আকর্ষণও বাড়ত।

'জনা' নাটকেব অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনার প্রযোজন নেই। এগুলি নিতান্তই সরল ও একহারা ধরনের। নীলধ্বজের মধ্যে বিশেষভাবে কৃষ্ণভক্তিই দেখানো হযেছে। তাঁর ভক্তি স্থানে স্থানে বেশ

অস্বাভাবিক লাগে। বিশেষতঃ পুত্রবিয়োগের সামান্য পরেই অর্জুনের মুখে কৃষ্ণের আগমনের কথা শুনে তাঁর আনন্দে অধীর হওয়া আমাদের কাছে চরম অবাস্তব বলে মনে হয় এবং এর জন্যে তাঁর প্রতি আমাদের বিরক্তি জাগত হয়। নীলধ্বজ যে কৃষ্ণের নামে এতখানি পাগল হয়ে পড়বেন, তার কোন আভাস নাট্যকার ইতিপূর্বে দেননি বলেই ব্যাপারটা বিসদৃশ লাগে।

প্রবীর মহাবীর। সমকক্ষ বীরের সঙ্গে যুদ্ধ তার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সে বীরের মতই অবিচলভাবে সংগ্রাম করেছে। দৈবশক্তির চক্রান্তে প্রবীর পরাজিত ও নিহত হয়েছে, কিন্তু তার মাথা নত হয়নি। তার মাতৃভক্তিও অতুলনীয়। প্রবীর চরিত্র সবদিক দিয়েই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু যেখানে প্রবীর আত্মবিস্মৃত হয়ে ছদ্মবেশিনী নায়িকার কাছে আত্মনিবেদন করেছে, সেই দৃশ্যটি সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। দৈবশক্তির চক্রান্ত এবং মোহিনীর মায়া যতই প্রবল হোক, অজানা নারীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করবার সময় প্রবীর একবারও জননীর কথা বা স্ত্রীর কথা ভাবল না, এ ব্যাপার আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগে।

স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর চরিত্রে পতিভক্তি ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অগ্নি চরিত্রে দেবতাসুলভ কোন বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় না, নীলধ্বজের জামাতা মানুষ হলে যেরকম আচরণ করত ও যেভাবে কথাবার্তা বলত, তার সঙ্গে অগ্নির আচরণ ও কথাবার্তার কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

'জনা' নাটকের কৃষ্ণ লীলাময় ঈশ্বর। ভক্ত পাণ্ডবদের মঙ্গলসাধনের জন্য ভক্ত নীলধ্বজের সর্বনাশ করতে তার কোন দ্বিধা নেই। নাট্যকারের বক্তব্য —ঈশ্বর যা ইচ্ছা তা'ই করতে পারেন, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তাঁর কাজের বিচার করা যায় না। তত্ত্বের দিক দিয়ে এ মতের যতই মূল্য থাক, এইভাবে অঙ্কিত হওয়ার ফলে 'জনা'র কৃষ্ণ যে নাটকের চরিত্র হতে পারেনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং অর্জুন চরিত্র অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। অর্জুন মহাবীর হলেও নিষ্ঠুর নন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র। প্রতিপক্ষ প্রবীরের প্রতিও তিনি ভদ্র ব্যবহার করেছেন। প্রবীরকে মিষ্ট কথা বলে, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে তার বীরত্বের প্রশংসা করে এবং তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাকে তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রবীর রণশয্যায় শয়ান হলে তিনি দুঃখিত হয়েছেন, বীরকুল নিধনের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন এবং

চিকিৎসা করে প্রবীরকে বাঁচাতে চেয়েছেন। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের যে কোমল অন্তঃকরণের পরিচয় পাই, এই নাটকেও ঠিক তেমনটিই আমরা দেখতে পাই। নীলধ্বজের প্রতিও অর্জুন ভদ্র ব্যবহার করেছেন। মোটের উপর 'জনা'তে অর্জুন গৌণ-চরিত্র হলেও বেশ জীবন্ত হয়েছে।

'জনা' নাটকের জনা-চরিত্র অঙ্কনে গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতাকেই আদর্শ করেছিলেন সন্দেহ নেই। দুই কবির অঙ্কিত জনা-চরিত্রের একটা তুলনামূলক বিচার এখানে করা যেতে পারে।

অবশ্য এ তুলনা খুব সুষ্ঠু হবে না। মধুসূদনের হাতে জনা-চরিত্র রূপায়িত হয়েছে পত্রের আঙ্গিকে লেখা একটি কবিতায়, তার মধ্যে জনার একটি বিশেষ মুহূর্তের চিন্তা-ভাবনা মাত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র জনাকে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ নাটক রচনা করেছেন, তার চরিত্রে নানারকম বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করেছেন, নানা ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে তাকে স্থাপন করেছেন, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি চরিত্রটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। এক কথায় গিরিশ-চন্দ্রের জনা পূর্ণাঙ্গ চরিত্র, মধুসূদনের জনা তা নয়।

যাহোক্, দুই কবির অঙ্কিত জনা-চরিত্রের তুলনা করলে আমরা দেখি মধুসূদনের জনার মধ্যে একটিমাত্র বৃত্তিরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়—তা হচ্ছে পুত্রশোক। 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতায় জনার পুত্রশোকের অভিব্যক্তি নানা ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপায়িত হয়েছে। কবিতাটির প্রথম অংশে পুত্রশোকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিস্ময়, মাঝের অংশে রোষ, শেষ অংশে নৈরাশ্য। গিরিশচন্দ্রও জনার মধ্যে পুত্রশোকের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি জনার চরিত্রে গঙ্গাভক্তি, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা প্রভৃতি নানা বৃত্তি সন্নিবেশ করেছেন।

দু'জনের হাতে জনার বিলাপের রূপায়ণও একরকমের হয়নি। মধুসূদনের জনা নীলধ্বজের কাছে কোন সহানুভূতি না পেয়ে মনের খেদ চিঠিতে প্রকাশ করে একলা বসে কাদতে চলে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি,
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে

খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি !

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জনা কাঁদেন নি, তাঁর প্রতিজ্ঞা—পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার আগে তিনি বিলাপ করবেন না, একবিন্দুও অশ্রু বর্ষণ করবেন না ; প্রতিহিংসার বাসনা তাঁর অন্তরে অনির্বাণ বহ্নিদাহ সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি বলেন,

মমতা, এস না বক্ষে মম !
জ্বল, জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে !
পুত্র-হন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময় !
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে।

'জনা' নাটকেব চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যেখানে জনা প্রবীরের মৃত্যুর পবে নীলধ্বজকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করে যুদ্ধে যেতে বলেছেন, সেখানে পরিস্থিতিগত ঐক্যের জন্য 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতার প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছে। কিন্তু মধুসূদনের পত্রের আঙ্গিকে লেখা কবিতায় একা জনার উক্তি পাই, নীলধ্বজ সেখানে অনুপস্থিত। এই অসুবিধা গিরিশচন্দ্র নাটকের মধ্যে সহজেই পূরণ করতে পেরেছেন। 'জনা' নাটকের আলোচ্য অংশে জনার বিভিন্ন উক্তির প্রত্যুত্তরে নীলধ্বজের উক্তি এবং তাইতে জনার তেজের উত্তরোত্তর বিকাশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। মধুসূদনের জনার নীলধ্বজের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ, তিনি পুত্রঘাতী শত্রু অর্জুনের সংবর্ধনা করছেন (মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'তে কৃষ্ণের কোন উল্লেখ নেই)। গিরিশ-চন্দ্রের জনা সেই অভিযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্মের অবমাননার কথা বলে নীলধ্বজকে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেছেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে কৃষ্ণের ভক্ত হয়েও কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় ; নীলধ্বজ যখন বললেন যে জয়ের কোন আশা নেই, তখন জনা তাঁকে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন। মধুসূদনের জনার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের জনার আরেকটি পার্থক্য এই যে, মধুসূদনের জনা ভাষার সংযম বজায় রাখতে পারেন নি, তিনি পাণ্ডবদের কুৎসা কীর্তন করেছেন, তাঁদের স্ত্রী দ্রৌপদী এবং

কীর্তিকাহিনী-রচয়িতা ব্যাসদেবকেও অব্যাহতি দেন নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জনা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশ প্রকাশের সময়ও কোন অসংযত বা অসঙ্গত উক্তি করে নি। মোটের উপর, তুই কবির অঙ্কিত জনাই তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা, কিন্তু তু'জনের রূপায়ণ-পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

এখন 'জনা' নাটকের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে তু'একটি কথা বলে এই আলোচনা শেষ করব।

'জনা' পৌরাণিক নাটক। সুতরাং এর ভাষার মধ্যে প্রাচীনতার ছাপ থাকা চাই। নাট্যকাব যথেষ্ট পবিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে, সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ করে এবং গদ্যের বদলে পদ্যে সংলাপ রচনা করে 'জনা'য় প্রাচীনতার ছাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি যে তাতে বহুল-পরিমাণে সফল হয়েছেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

'জনা'র ভাষার মধ্যে সব জায়গায় সৌন্দর্য ও শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া যাব না। কেবলমাত্র জনা ও প্রবীরের সংলাপ সুন্দর ও শিল্পোচিত হয়েছে। এই তুই চরিত্রের সংলাপের ভাষা ওজস্বিনী ও গরিমাপূর্ণ, তার মধ্যে আমরা তেজ, শৌর্য ও ব্যক্তিত্বের বহ্নিদীপ্ত প্রকাশ দেখতে পাই। অন্যান্য চরিত্রেব ভাবায় এই ধরনের সৌন্দর্যের পরিচয পাওয়া যায না। তবে 'জনা'ব প্রতিটি চরিত্রের ভাষা যে ঐ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযাবী হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই নাটকে বিদূষক, গঙ্গারক্ষক প্রভৃতি ভাড-জাতীয় চরিত্রগুলির সংলাপের ভাষা স্থানে স্থানে একটু অমার্জিত ধরনের হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এর জন্য নাট্যকার ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী সেকালেব রুচি। 'জনা'র ভাষায় এমন সব শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেগুলি তখনকার দিনে রুচিসঙ্গত ছিল, কিন্তু এখনকার দিনে সেগুলি রুচিবিগর্হিত বলে গণ্য হয়। এই শব্দগুলির ব্যবহারের জন্য নাট্যকারকে আদৌ অভিযুক্ত করা চলে না।

'জনা' নাটকের পদ্য-সংলাপে "গৈরিশ ছন্দ" ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছন্দ একজাতীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মধুসূদন তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে চরণগুলির অন্ত্যমিল বর্জন করেছিলেন এবং প্রতি চরণের শেষে বাক্যের যতিপাত না করে ছন্দের মধ্যে প্রবহমানতা এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে আগেকার যুগের সমিল পয়ার ছন্দের মত প্রতিটি চরণে চৌদ্দটি করে দল (syllable)

থাকত। "গৈরিশ ছন্দে" তা-ও থাকে না, তাতে বিভিন্ন চরণের দল-সংখ্যার মধ্যে সাম্য নেই। "গৈরিশ ছন্দে" পর্বে-পর্বে দল-সংখ্যার সমতাও দেখা যায় না। এর মধ্যে ছন্দ একটা আছে বটে, কিন্তু তা অত্যন্ত শিথিল ধরনের।

গিরিশচন্দ্র এই ছন্দের আদি প্রবর্তক নন। তাঁর আগে রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর নাটকে এই ছন্দ প্রয়োগ করেছিলেন, এমন কি তাঁরও আগে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রস্তাবনায় এই ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেদিক দিয়ে এই ছন্দের ইতিহাস মাইকেলী ছন্দের চেয়েও প্রাচীন। গিরিশ-চন্দ্রের সঙ্গে এই ছন্দের সম্পর্ক এই যে, গিরিশবাবু তাঁর নাটকে এই ছন্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন; তিনি একটি চিঠিতে এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছিলেন ও নিজেই এর নাম দিয়েছিলেন "গৈরিশ ছন্দ"। পৌরাণিক নাটকের সংলাপ রচনার পক্ষে এই ছন্দ বিশেষভাবে উপযোগী। কারণ ভক্তিরস, বীররস, গীতিরস প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকের প্রধান রসগুলি এই ছন্দের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। সেদিক দিয়ে 'জনা' নাটকে এই ছন্দের ব্যবহার সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু "গৈরিশ ছন্দে"র মধ্যে অনেক ত্রুটিও আছে। এর শিথিলতাই এর প্রধান ত্রুটি। মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে ন্যূনতম বন্ধন ছিল, গিরিশচন্দ্র সেটুকুও রাখেন নি। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তি ছন্দের উৎকর্ষবৃদ্ধির সহায়ক কিনা, তাতে সংশয়ের অবকাশ আছে। মাইকেলী ছন্দে কিছু বন্ধন থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে যে অসামান্য সৌন্দর্য ও দীপ্তি ফুটে উঠেছে, "গৈরিশ ছন্দে' তার একান্তই অভাব। মাইকেল গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দরাজি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দকে একটি অপূর্ব গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য দান করেছিলেন। "গৈরিশ ছন্দে' এই বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় খুব বেশি পাওয়া যায় না। জনার সংলাপের ছন্দোবিচার করতে বসলে "গৈরিশ ছন্দে'র গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে তার এই দোষগুলিও আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক ঃ 'সিরাজদ্দৌলা'

সুদূরের প্রতি, অপরিচিতের প্রতি সাহিত্যিকদের একটি সহজাত আকর্ষণ থাকে। এইজন্য ঔপন্যাসিক ও নাট্যকাররা অনেক সময় একটি অভিনব পটভূমিকায় কাহিনী সংস্থাপিত করে তার অনাস্বাদিত রস সঞ্চয় করে পাত্র পূর্ণ করেন এবং পাঠককে তা উপহার দিয়ে তার বৈচিত্র্য-পিয়াসী রুচি চরিতার্থ করেন। ইতিহাস থেকে আখ্যান আহরণ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ঐতিহাসিক নাটক রচনার পিছনেও আছে এই উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা বৃহৎ ইতিহাসের এক খণ্ডাংশ নির্বাচন করে নিয়ে তার মধ্যে এমনভাবে জীবনস্পন্দন সঞ্চার করেন যে মনে হয় ইতিহাসের সমাধি থেকে উঠে-আসা নরনারীদের কঙ্কালগুলি আবার যেন কোন্ অভিনব মায়ামন্ত্রে রক্তমাংস লাভ করে সজীব সচল হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার উদ্দেশ্য পাঠক বা দর্শককে ইতিহাস-অভিজ্ঞ করে তোলা নয়। এখানেও লক্ষ্য সাহিত্যের সেই আদি কথা—রস সৃষ্টি। ঐতিহাসিক কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ থেকে এমন এক বিশেষ ধরনের রস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যা অন্য কোন শ্রেণীর আখ্যানের দ্বারা সম্ভব নয়। ইতিহাসের যে সব চরিত্রের জীবন-সঙ্গীত মহাকালের সঙ্গীতের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটি স্বাভাবিক বিস্তৃত ব্যবধান আছে। যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে তাঁরা নায়কস্বরূপ ছিলেন, তা সমেত যখন নাট্যকার তাঁদের আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন, তখন আমরা যেন প্রতিদিনের সাধারণ সুখ-দুঃখের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুহূর্তকালের জন্য মুক্তিলাভ করে কালের নিরবধি পারাবারে সন্তরণ করি, এক বিচিত্র রস উপভোগ করি। এই বিচিত্র রসসৃষ্টিই ঐতিহাসিক নাটকের উদ্দেশ্য। এই রসকে আমরা ঐতিহাসিক রস নাম দিতে পারি। যতটুকু ঐতিহাসিক উপকরণ এই রস উদ্বোধনে সহায়তা করে, নাট্যকার ততটুকু গ্রহণ করেন। এই উপকরণগুলিকে নাটকের মধ্যে সার্থকভাবে রূপায়িত করবার জন্য তিনি তাদের আবশ্যকমত রূপান্তরসাধনও করতে পারেন এবং কল্পনার আশ্রয়ও নিতে পারেন। কাল্পনিক পরিস্থিতি সৃষ্টি দ্বারা যদি ইতিহাসের মর্মগত সত্য বিকৃত হয়, তা হলে ঐতিহাসিক রসের বিশুদ্ধি

ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়; তার ফলে নাটক ক্রটিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মর্মগত সত্যকে বিকৃত না করে যদি নাট্যকার নাটকের প্রয়োজনে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন, তা হলে কোন অন্যায় হয় না। এ সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেছেন, "যা ঘটেছে কেবল তাই বর্ণনা করা কবির বা নাট্যকারের কাজ নয়, যা ঘটা সম্ভব তাও ঐতিহাসিক নাটকের লেখক প্রয়োজন হলে দেখাতে পারেন।"

রোমান্টিক্‌ নাটকের সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। উভয় শ্রেণীর নাটকেরই পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা-পরিবেশের সঙ্গে আমাদের একটি সহজাত দূরত্ব আছে। তবে রোমান্টিক নাটকের চরিত্র ও পরিস্থিতি আদ্যন্ত কল্পনা-প্রসূত বলে তাকে পাঠক-দর্শকের প্রত্যয়-গ্রাহ্য করে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ঐতিহাসিক নাটকে পাঠক দর্শকের প্রত্যয়-উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ, সেখানে নাট্যকারের কল্পনা-প্রসূত পরিস্থিতি প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সুনিপুণভাবে গ্রন্থিত হয়।

ঐতিহাসিক নাটকের পাত্রপাত্রীদের কথাবার্তা এবং কাযকলাপেও বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। তাদের জীবনযাত্রা বর্তমান যুগের নরনারীদের জীবনযাত্রার অনুরূপ করে দেখালে ঐতিহাসিক-রসের হানি ঘটবে। তাই বলে যে তাঁদের মধ্যে মানুষের পরিবর্তে অতিমানবের ধর্ম আরোপিত হবে তা নয়। আসলে ঐতিহাসিক নাটকে মানুষেরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত হয়ে এমন এক দূরত্ব ও বিরাটত্ব লাভ করবে, যাতে আমাদের চিত্ত সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। আমাদের পরিচিত জগতের নর-নারীদের সুখ-দুঃখ যতই গভীরভাবে আমাদের মনে রেখাপাত করুক না কেন, তার মধ্য থেকে অনুরূপ অনুভূতি লাভ কখনও সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রধান কথা তার ঐতিহাসিকত্ব কোন সময়েই তার নাটকত্বের পরিপন্থী হয়ে উঠবে না। ভাবের নিবিড় সংহতি, ঘটনাসমূহের কেন্দ্রাভিমুখীনতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বে চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং নাটকীয় সন্ধিসমূহের সুব্যবস্থিত বিন্যাস অন্যান্য নাটকের মত ঐতিহাসিক নাটকেও অবশ্যপ্রয়োজনীয়। হাড্‌সনের ভাষায় "The laws of drama are here paramount to the facts of history." ঐতিহাসিক নাটকে সব সময়েই নাটকের প্রয়োজনকে ইতিহাসের প্রতি আনুগত্যের উপরে স্থান দিতে হবে।

ইতিহাস থেকে আহরিত তথ্য অবলম্বনে যে ক'খানি বাংলা নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পলাশীর যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসের একটি মসীমলিন অধ্যায়। বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও লোভী বিদেশীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ভাগ্যবঞ্চিত অসহায় তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন-চ্যুতি ও প্রাণনাশের করুণ কাহিনী বাঙালীর একান্ত পরিচিত। সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে ঐতিহাসিক রসসৃষ্টির উপাদান রয়েছে এবং তাঁর পতনের কাহিনীকে উপযুক্তভাবে নাট্যরূপ দান করলে তা পাঠক-দর্শকদের মনকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গিরিশচন্দ্রের নাটক এই দিক দিয়ে সফল হয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নই আমাদের বিচার করতে হবে। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন যে তিনি এই নাটক রচনায় বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের বিবরণের উপর নির্ভর করেছেন। এখন আমাদের দেখতে হবে এই সব বিবরণ থেকে সংগৃহীত উপকরণ অবলম্বনে নাট্যকার ঐতিহাসিক রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন কিনা।

প্রথমে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। এই নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি প্রায় সমস্তই ঐতিহাসিক চরিত্র এবং তাদের উক্তি ও আচরণ ইতিহাস-সমর্থিত। এদের মধ্যে কেবলমাত্র জহরা ও করিমচাচা নাট্যকারের কল্পনার সৃষ্টি।* ঐতিহাসিক নাটকে লেখক নাটকের প্রয়োজনে এইরকম কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করতে অবশ্যই পারেন। আমাদের কেবল দেখতে হবে এই নাটকের চরিত্রগুলি ঐতিহাসিকই হোক্ আর কাল্পনিকই হোক্—তারা ঐতিহাসিক রসের আলম্বন হয়েছে কিনা।

এই নাটকের চরিত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান সিরাজদ্দৌলা ও লুৎফউন্নিসা। এঁরাই যথাক্রমে নাটকের নায়ক ও নায়িকা। সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয় ও পতনের কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য। নাট্যকার এই ঘটনাকে সুরু থেকে শেষ

* কোন কোন সমালোচক এই দুটি চরিত্রকেও ঐতিহাসিক বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই দুটি চরিত্র যে কাল্পনিক, সে-কথা নাট্যকার 'সিরাজদ্দৌলা'র পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে জহরার প্রতি করিমচাচার উক্তির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। সেখানে করিমচাচা জহরাকে বলেছেন, "এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা পাবে। বেইমান কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না।"

পর্যন্ত বিশদভাবে নাটকের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। আমরা দেখি, সিরাজ-দ্দৌলা "প্রজাপালক নিরীহ নবাব"। পূর্ব-জীবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সে সব দোষ থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যরক্ষা ও প্রজাদের কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কর্তব্য সম্পাদনের পথে মহাবিঘ্ন শঠ অমাত্যদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত। সিরাজ কখনও অনুনয় করে, কখনও শাসন করে তাদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা মুখে বশ্যতা স্বীকার করে অন্তরালে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলে। সিরাজের শৌর্য ও নির্ভীকতার অভাব নেই ইংরেজদের পরাজিত করে কলকাতা ও তার দুর্গ অধিকার করে তিনি তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উক্তিগুলিও অত্যন্ত তেজস্বিতাপূর্ণ। কিন্তু এতখানি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নীচাশয় সচিবদের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশী-প্রাঙ্গণে তাঁর পরাজয় হ'ল; শেষ পর্যন্ত ঘাতকের ছুরিতে বাংলা বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাবের জীবনাবসান ঘটল। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী লুৎফউন্নিসা, যিনি সম্পদে বিপদে ছায়ার মত স্বামীর অনুসরণ করেছেন, তার বুক ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। নাটকে এই কাহিনী যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, তার মধ্যে করুণরসের অভাব নেই; কিন্তু প্রশ্ন এই যে তার মধ্যে এমন কোন উপাদান আছে কি, যাতে একটা অসামান্য বিরাটত্বের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা যায়? সিরাজের অসহায় অবস্থা ও শোচনীয় পরিসমাপ্তির কাহিনী যতই মর্মন্তুদ হোক, তার মধ্যে মহাকালের সমুদ্রগর্জনধ্বনি শোনা যায় না। নাটকের মধ্যে এই কাহিনীকে এমনভাবে রূপায়িত করা হয়েছে, যে, তাকে আমাদের নিত্যপরিচিত সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা থেকে ভিন্নশ্রেণীর কিছু বলে মনে হয় না। সিরাজদ্দৌলার পতন যে বৃহত্তর ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত, তিনি যে শুধু মাত্র একটি ব্যক্তিসত্তা নন, একটি সমগ্র জাতির ভাগ্য তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত, ইতিহাসের একটি বৃহৎ অধ্যায় যে তাঁর উত্থান-পতনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এই ভাবটি নাট্যকার নাটকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। নাটকটি পড়ার পরে আমরা শুধুমাত্র পতিহারা লুৎফউন্নিসার দুঃখে দুঃখিত হই, একটি সমগ্র জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের হৃদয়-বিদারক রূপটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। সুতরাং এই নাটকের নায়ক সিরাজের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি, এ সিদ্ধান্ত না করে উপায় নেই।

সিরাজ-লুৎফউন্নিসার দাম্পত্য-প্রণয়ের চিত্র এই নাটকে যে ভাবে অঙ্কিত হয়েছে, তা'ও এই রসসৃজনের প্রতিকূল। এ যেন সাধারণ গৃহস্থ-দম্পতির প্রেম ; ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকার মহিমা ও অনন্যসাধারণতা এর মধ্যে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীর প্রণয়-চিত্রও স্থান পেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যেও অনন্যসাধারণত্ব ফুটে ওঠা চাই। সিরাজ ও লুৎফউন্নিসার প্রেমে তা নেই।

ঐতিহাসিক রসের সৃষ্টিতে কল্পনা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক রসকে রক্ষা করতে হবে ইতিহাসেরই আধারে। তা না হলে পাঠক ও দর্শকদের প্রত্যয় ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে কাল্পনিক চরিত্র জহরার উপর নাটকের সমস্ত প্রধান ঘটনার নিয়ন্ত্রণের ভার ছেড়ে দেওয়ায় তা'ই হয়েছে। অবশ্য, সার্থক স্রষ্টার প্রতিভার বলে ঐতিহাসিক নাটকে অনৈতিহাসিক চরিত্রও এমনভাবে অঙ্কিত হতে পারে, যাতে তাকে ইতিহাসের ধারা থেকে ভিন্ন মনে করা যায় না। যে যুগ নাটকের পটভূমি, সেই যুগের ধর্ম কোন কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হলে তা ঐতিহাসিক চরিত্রেব সমতুল্য বলে গণ্য হয়। কিন্তু জহরাব মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের একান্ত অভাব। তার মধ্যে যুগধর্মের কোন লক্ষণই ফুটে ওঠে নি। তা ছাড়া সে যে কাবণের জন্য সিরাজের প্রতি জিঘাংসু হয়ে তাঁর সর্বনাশসাধন করেছে, তা নিতান্তই ব্যক্তিগত ; কারণ তার মধ্যে এমন কোন সার্বজনীন আবেদনের সন্ধান মেলে না, যা ইতিহাসেব সুদূর-বিস্তৃত সুবঝঙ্কারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে। জহরাব স্বামীব হত্যা ব্যাপারটি আমাদের সামনে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরা হয় নি, যাতে জহরার প্রতিশোধ-গ্রহণ-চিকীর্ষা আমাদের মনে বিরাটত্বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে।

এই নাটকে অনৈতিহাসিক কয়েকটি চরিত্রকে হাস্যরসেব আলম্বন করে সৃষ্টি করা হয়েছে সংঘাতসঙ্কুল গুরুগম্ভীর ঐতিহাসিক আবহাওয়ার ভার প্রশমনের জন্য। কিন্তু এই আবহাওয়া সৃষ্টিতেই নাট্যকার তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ফলে এই সব চরিত্রের কৌতুকপ্রদ উক্তিগুলি নাটকের ভাবপরিমণ্ডলকে অপেক্ষাকৃত লঘু ও তরল করে তার রস বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ করেছে। বিশেষ করে শওকতজঙ্গের মত অভিজাত কুলোদ্ভব চরিত্রের মাধ্যমে স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি করে নাট্যকার রসাভাস ঘটিয়েছেন।

'সিবাজদ্দৌলা' নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যের অতি সন্নিবেশের ফলে নাটকের নাট্যগুণ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সিরাজের সিংহাসনে আরোহণ থেকে সুরু করে মৃত্যুর কিছু পর পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। নাটকের মধ্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে সিরাজের মন্ত্রণা, তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ, ইংরেজদের কূট-কৌশল, যুদ্ধের বর্ণনা, বিভিন্ন চরিত্রের পরিণাম প্রভৃতি বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। নাট্যকার যেন সিরাজদ্দৌলার আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণ্য দলিল রচনা করতে বসেছেন। আদর্শ নাটকের সঙ্গে গো-পুচ্ছাগ্রের তুলনা করা হয়, কারণ তার মধ্যে থাকে একটি সুষম গঠনগত ঐক্য, ঘটনা পরম্পরা ও ভাব-পরম্পরার দৃঢ়বন্ধ কেন্দ্রাভিমুখী সংস্থান। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে এই সব বৈশিষ্ট্যের একান্ত অভাব। এজন্য ঐতিহাসিক তথ্যের বাহুল্যই প্রধানত দায়ী। সিরাজের মৃত্যুর পরেও নাট্যকার নাটকের যবনিকাপাত না করে আরও চারটি গর্ভাঙ্ক রচনা করেছেন এবং মীরজাফর, মোহনলাল, করিমচাচা প্রভৃতির পরিণতি প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে পারে না। 'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, "ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাস—ইতিহাস, ইতিহাসবেত্তা ব্যতীত তাহার প্রকৃত রসাস্বাদ সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা হয় না।" অথচ এই শুষ্ক ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে নাটকীয় উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে সর্বসাধারণের আস্বাদ্য রস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে এই দুই বস্তুর বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিদর্শন মেলে; কিন্তু যে শিল্পকৌশলের তাড়িত শক্তি তাদের সম্মিলিত করে, তার অভাবে তারা বন্ধ্যাই রয়ে গেল। তবে তাদের সাময়িক উত্তেজনা ও নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের অম্লরস সঞ্চারিত হওয়ার ফলে সুপ্রচুর লোকপ্রিয়তার বুদ্বুদ উত্থিত হয়ে যথাকালে মিলিয়ে গিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক ঃ 'দুর্গাদাস'

অতীত দিনের সমাধিতে যে সব লোকের জীবন ঘুমিয়ে আছে, ইতিহাস তাদের কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরে। দেশ ও কালের ব্যবধান পার হয়ে আমরা তখন আবার সেই সব মানুষের জীবনলীলার দর্শক হয়ে উঠি; আমাদের হৃদয় সাময়িকভাবে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে মিশে যায়। আর নাটকের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক জগতের নরনারীদের জীবনযাত্রা, কাযকলাপ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ইতিহাস মৃতকে করে জীবন্ত, আর নাটক কল্পনাকে করে রূপময়। তাই ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে নাটক লেখা হলে তা স্বতই প্রাণপূর্ণ, দীপ্তিময় ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে যারা নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিঃসন্দেহে সকলের অগ্রগণ্য। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের, বিশেষভাবে মোগল যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি থেকে আখ্যানভাগ সংগ্রহ করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে তাঁর কল্পনা-শক্তি, কলাকুশলতা ও নাট্যরসবোধের সাহায্যে পরম উপভোগ্য করে নাটকে রূপ দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা প্রতাপসিংহ, মেবার পতন, নুরজাহান, সাজাহান্ ও দুর্গাদাস—এই পাঁচটি নাটকের কাহিনী মোগল যুগের। প্রথমটিতে আকবরের রাজত্বকালের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের, চতুর্থটিতে সাজাহানের রাজত্বকালের এবং পঞ্চমটিতে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এদের মধ্যে 'দুর্গাদাস'ই আজ আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। নাটকে বর্ণিত ঘটনার সময়ের দিক দিয়ে 'দুর্গাদাস' বাকী চারখানি নাটকের তুলনায় পরবর্তী হলেও রচনাকালের দিক দিয়ে এই নাটকটি এক প্রতাপসিংহ ছাড়া সকলেরই অগ্রবর্তী। এই বইখানি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কয়েকটি নাটকের অন্যতম। প্রথমদিকের নাটকগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল এমনভাবে মঞ্চনির্দেশ দিতেন যে তা প্রায় উপন্যাসের কাছাকাছি হয়ে উঠত। 'দুর্গাদাস' নাটকেও তার পরিচয় আছে; যেমন প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে (ত্রয়োদশ মুদ্রণ, পৃঃ ২) সমরসিংহের উক্তির পরে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন,

"ঔরংজীব একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে এরূপ দোষারোপে তিনি কোনকালে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন" ইত্যাদি।

*

'দুর্গাদাস' নাটকের মূল্য বিচার করবার সময় প্রথমে আমাদের দেখতে হবে, 'দুর্গাদাস' ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে সার্থক হতে পেরেছে কিনা।

কাহিনীর দিক দিয়ে 'দুর্গাদাস' নাটকে ঐতিহাসিকতা খুব বেশী। দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকেই এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। মাড়বাররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা দিয়ে 'দুর্গাদাস' নাটকের আরম্ভ এবং সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর কিছু পরে এই নাটকের শেষ। ১৬৭৮-১৭০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনার বাত্যাবিক্ষোভে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ উন্মথিত হয়ে উঠেছিল, তাদের অনেকগুলি এই নাটকে বর্ণিত বা উল্লিখিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলি তারিখ সমেত নীচে প্রদত্ত হল এবং নাটকের কোন্ স্থানে সেগুলির বর্ণনা বা উল্লেখ আছে, তা'ও দেখানো হল।

(১০ই ডিসেম্বর, ১৬৭৮) যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য), (২রা এপ্রিল, ১৬৭৯) ঔরংজেব কর্তৃক জিজিয়া কর প্রবর্তন (১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য), (১৫ই জুলাই, ১৬৭৯) দুর্গাদাস কর্তৃক অজিত সিংহকে দিল্লী থেকে উদ্ধার (১ম অঙ্ক, ৫ম-৬ষ্ঠ দৃশ্য), (নভেম্বর, ১৬৭৯) রাণা রাজসিংহ কর্তৃক যশোবন্ত সিংহের বিধবা রাণী ও শিশু-পুত্রকে আশ্রয় দান (১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য), (৩০শে নভেম্বর, ১৬৭৯) ঔরংজেবের মেবার আক্রমণ (২য় অঙ্ক, ১ম-২য় দৃশ্য), (২২শে অক্টোবর, ১৬৮০) রাণা রাজসিংহের মৃত্যু (৩য় অঙ্ক, ৯ম দৃশ্য), (১লা জানুয়ারী, ১৬৮১) ঔরংজেবের বিরুদ্ধে তাঁর পুত্র আকবরের বিদ্রোহ (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য), (১৬ই জানুয়ারী, ১৬৮১) ঔরংজেবের কৌশলে আকবরের ব্যর্থতাবরণ (৩য় অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য), (জানুয়ারী, ১৬৮১) দুর্গাদাস কর্তৃক আকবরকে আশ্রয়দান ও আকবরকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাদাসের মহারাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা (৩য় অঙ্ক, ৯ম দৃশ্য), (১৪ই জুন, ১৬৮১) রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সঙ্গে ঔরংজেবের সন্ধি (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য), (১৩ই নভেম্বর, ১৬৮১) মহারাষ্ট্ররাজ শম্ভুজীর সঙ্গে আকবরের সাক্ষাৎকার (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য), (ফেব্রুয়ারী-মার্চ,

১৬৮৭) আকবরের পারস্য অভিমুখে যাত্রা ও দুর্গাদাসের মহারাষ্ট্র থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (৫ম অঙ্ক, ১ম ও ৪র্থ দৃশ্য), (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৬৮৯) মোগল সৈন্যের হাতে শম্ভুজী বন্দী (৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য), (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৮৯) শম্ভুজী ঔরংজেবের শিবিরে উপনীত (৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য), (৩রা মার্চ, ১৬৮৯) শম্ভুজী নিষ্ঠুরভাবে নিহত (ঐ), (১৬৯৪) দুর্গাদাস কর্তৃক ঔরংজেবের কাছে আকবরের কন্যাকে সমর্পণ (৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য), (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৭০৭) ঔরংজেবের মৃত্যু (৫ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য)।

উপরে সঙ্কলিত ঐতিহাসিক ঘটনার তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, 'দুর্গাদাসে'র আখ্যানভাগের বৃহৎ অংশে ইতিহাসকে প্রায় যথাযথভাবে ঘটনাবলীর ক্রম অক্ষুণ্ণ রেখে অনুসরণ করা হয়েছে। কেবল দু' একটি জায়গায় ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে দেখি অজিত সিংহ একেবারে শিশু, তখনও তার "চোখ ফুটে নি", কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি সে খেলা করছে, অথচ দুই দৃশ্যের ঘটনাকালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক মাস। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই দুই দৃশ্যের ঘটনাকালের সঙ্গে চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ব্যবধান মাত্র দু' বছর, কিন্তু শেষোক্ত দৃশ্যে অজিতকে কিশোর রূপে দেখানো হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে অজিতকে যুবক রূপে দেখতে পাই, কিন্তু এখানেও সময়ের ব্যবধান নির্দিষ্ট করা হয় নি। তারপর 'দুর্গাদাস' নাটকে দেখানো হয়েছে যে আকবর যখন তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন তাঁর কন্যা রাজিয়া কিশোরী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকবরের বয়স ঐ সময়ে মাত্র তেইশ বছর ছিল। এই নাটকে বলা হয়েছে ঔরংজেবের মৃত্যুর কিছু আগেই তাঁর প্রিয়তমা মহিষী, কামবক্সের জননী গুলনেয়ার আত্মহত্যা করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাস বলে কামবক্সের জননী ঔরংজেবের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। নাটকে দেখি, শম্ভুজী ঔরংজেবের হাতে বন্দী হবার পরে আকবর ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকবরের ভারতবর্ষ ত্যাগের দু' বছর পরে শম্ভুজী বন্দী হয়েছিলেন। নাটকে একই দৃশ্যে শম্ভুজীর বন্দীদশায় ঔরংজেবের শিবিরে আগমন ও শম্ভুজীর বধ দেখানো হয়েছে, কিন্তু আসলে দুই ঘটনার মধ্যে ষোল দিনের ব্যবধান ছিল। নাটক পড়ে মনে হয়, আকবরের কন্যাকে ফিরে পাওয়ার অব্যবহিত পরেই ঔরংজেব প্রাণত্যাগ করলেন, কিন্তু আসলে এই দুই ঘটনার মধ্যে তের বছরের ব্যবধান ছিল।

নাট্যকার কতকগুলি কাল্পনিক ব্যাপারকে নাটকে স্থান দিয়েছেন, যেমন— জয়সিংহের স্ত্রৈণতা, ঔরংজেবের মহিষী কর্তৃক দুর্গাদাসকে প্রেম নিবেদন করা, শম্ভুজীর দুর্গাদাসকে বন্দী করা ও ঔরংজেবের হাতে সমর্পণ করা, অজিত সিংহের সঙ্গে ঔরংজেবের পৌত্রীব প্রণয় প্রভৃতি। জয়সিংহ ও ভীমসিংহের ভ্রাতৃবিরোধ এবং ভীমসিংহেব আত্মবিসর্জনের করুণ কাহিনীটি নাট্যকার টডের রাজস্থান থেকে গ্রহণ করেছেন। কাহিনীটি ঐতিহাসিক নয়। কিন্তু টডের বাজস্থান সে সময ইতিহাস বলেই গণ্য হত, তাই দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেছেন বলা চলবে না। আবও কযেকটি গৌণ ব্যাপার দ্বিজেন্দ্রলাল টডের রাজস্থান থেকে নিয়েছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচাব করলে 'দুর্গাদাস' নাটকে আর একটি ত্রুটি, লক্ষ্য কবা যাব ; এর প্রথম চার অঙ্ক জুড়ে মাত্র দু'বছরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু শেষ অঙ্কটিতে কুড়ি বছবের ঘটনা স্থান পেয়েছে।

'দুর্গাদাস' নাটকে কাহিনী-সংস্থাপনের মত চবিত্রচিত্রণেও নাট্যকাব ইতিহাসের মর্যাদা প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। দুই একটি চবিত্রের নাম পরিবতন কবা হযেছে, যেমন ইতিহাসেব উদিপুবী বেগমেব নাম 'দুর্গাদাস' নাটকে হয়েছে 'গুলনেযার', আকববেব কন্যা সফিযৎ-উন্নেসার নাম নাটকে 'রাজিযা' করা হযেছে। যশোবন্ত সিংহের বাণী ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও 'দুর্গাদাস' নাটকে যে তাঁব 'মহামাযা' নাম দেওযা হযেছে, ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ পাওযা যায না নাটকে তাঁর কাযকলাপও সমস্তই নাট্যকাবেব কল্পনাব সৃষ্টি। এই নাটকে উল্লিখিত জযসিংহের অন্যতমা মহিষী কমলাব নাম টডের রাজস্থানে পাওযা যায। জযসিংহেব অপর স্ত্রী সরস্বতী কাল্পনিক চবিত্র। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে কাশিম ও কাবলেশ খাঁর চরিত্র ও ভূমিকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শম্ভুজীব এক প্রিয় মন্ত্রীর উপাধি ছিল 'কবিকুলেশ'। এই 'কবিকুলেশ' থেকেই কি 'কাবলেশ খাঁ' নামের উৎপত্তি হযেছে ? অবশ্য 'কবিকুলেশ' হিন্দু ছিলেন এবং তিনি শম্ভুজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কবেন নি ; 'দুর্গাদাস' নাটকেব দিলীব খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও এতে তার যে প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানো হয়েছে, তা ইতিহাস-সমর্থিত নয়।

এপর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, তা বহিরঙ্গ ব্যাপার সম্বন্ধে।

ঐতিহাসিক নাটকের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ শুধু মাত্র ইতিহাসের প্রতি তার আনুগত্যের উপরে নির্ভর করে না। ঘটনাসংস্থাপন, চরিত্রচিত্রণ ও কলা-কৌশলবিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন কিনা, সেই প্রশ্নই ঐতিহাসিক নাটকের সার্থকতা বিচারে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

এই দিক দিয়ে বিচার করলেও 'দুর্গাদাস' নাটক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এই নাটকের নায়ক দুর্গাদাস বিরাট পুরুষকার, অটল কর্তব্যনিষ্ঠা ও কলঙ্ক-লেশহীন সততার জীবন্ত বিগ্রহ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এই দেবদুর্লভ চরিত্রের জ্যোতিতে আলোকিত। 'দুর্গাদাস' নাটকে এই চরিত্রটি যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, তা আমাদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করে। 'দুর্গাদাস' নাটকের অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মহামায়ার তেজস্বিনী মূর্তি, রাজসিংহের মহানুভবতা, বিজ্ঞতা ও বিক্রম, ভীমসিংহের আত্মত্যাগ, দিলীর খাঁ ও কাশিমের মহত্ত্ব, গুলনেয়ারের হিংস্রতা আমাদের মনকে অভিভূত করে। এই সমস্ত চরিত্রের কার্যকলাপও নাটকে বর্ণিত সময়েরই উপযোগী হয়েছে। এই নাটকে মধ্যযুগের মহত্ত্ব, বীরত্ব, নীচতা ও ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। তাই এর পরিবেশটি একান্ত-ভাবে ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে।

পরিবেশকে ঐতিহাসিক করে তুলতে নাটকের সংলাপও কম সাহায্য করে নি। এই সংলাপে যে বীরত্বের গরিমা ও দৃপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি হয়েছে, তার তুলনা অন্যত্র বিরল। এখানে আমরা তার সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি,

"বাণী। শুন্‌বে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটীর ছেড়ে চলে' এসো। তরবারি লও। ওঠ, এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে' ওঠো। ওঠো, যেমন তূরী শব্দে সিংহ জেগে ওঠে। ওঠো—যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গকল্লোল ওঠে। ওঠো। রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে, তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।"

এই জাতীয় সংলাপ ঐতিহাসিক রস সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী। সুতরাং ইতিহাস-অনুগতার দিক দিয়ে যেমন, তেমনি রসের দিক দিয়েও 'দুর্গাদাস'

'ঐতিহাসিক নাটক' হিসাবে সার্থক হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ত্রুটিগুলিকেও উপেক্ষা করা যায় না। কতকগুলি চরিত্রে নাট্যকার স্পষ্টই ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করেছেন। এখানে তিনি যে শুধুমাত্র ইতিহাসকে লঙ্ঘন করে দোষ করেছেন তা নয়, তার চেয়েও বড় অপরাধে তিনি অপরাধী : ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি স্থায়ী সংস্কার থাকে, নাট্যকারের অসংযত কল্পনা যদি সেই সংস্কারে আঘাত করে, তাহলে নাটকের শিল্পোৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে, কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্‌টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।"

ইতিহাসের ঔরংজেব অসামান্য ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, কূটনীতিকুশল, প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আমাদের মনে ঔরংজেবের এই মূর্তিই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'দুর্গাদাস' নাটকে যে ঔরংজেবের দেখা পাই, তিনি অক্ষম, অপদার্থ, ব্যক্তিত্বশূন্য। মহিষীর মোহে তিনি নিজের মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছেন। গুলনেয়ার তাঁকে ক্রীড়নকের মত চালনা করেন। নাটকের শেষের দিকে তিনি দিলীর খাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই নাটকের কয়েক জায়গায় ঔরংজেব পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতির জন্য অনুতাপ করেছেন বলেও দেখতে পাই। এই সব অসঙ্গত কল্পনা শুধু ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নি, নাটকের রসও ক্ষুণ্ণ করেছে।

তারপর, এই নাটকে শম্ভুজীর চরিত্রেও অযথা কালিমালেপন করা হয়েছে। শম্ভুজী বিলাসী, দুশ্চরিত্র ও অদূরদর্শী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু 'দুর্গাদাস'-এ শুধুমাত্র এইটুকু দেখানো হয় নি, সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে শম্ভুজী তাঁর আশ্রিত দুর্গাদাসকে বন্দী করে মহাশত্রু ঔরংজেবের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এ কাজ কোন বীর রাজা করতে পারেন না। তাই এ ক্ষেত্রেও আমাদের সংস্কারে আঘাত লাগে ও রসের হানি হয়।

এই নাটকের সংলাপেও কয়েক জায়গায় ঐতিহাসিক রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব আমরা সহজেই উপলব্ধি করি। তাদের মধ্যে একটা স্বতই সম্ভ্রমজাগানো ভাব থাকে। এই কারণে

ঐতিহাসিক চরিত্রের মুখে হাল্‌কা বা সস্তা রসিকতা দিলে রসহানি হয়। এই নাটকে আকবর, তাহবর খাঁ, কাবলেশ খাঁ প্রভৃতির উক্তি কয়েক জায়গায় খুবই লঘু হয়ে গিয়েছে। সম্রাটপুত্র আকবরের মুখে "ওহে জানো বেটা দুগ্‌গোদাস বাবাকে—অর্থাৎ কিনা দুগ্‌গোদাসকে বেটা বাবা ভারি ডরায়" জাতীয় উক্তি দেওয়া মোটেই শোভন হয় নি।

এই সমস্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'দুর্গাদাস' একখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক হতে পেরেছে। এই নাটকের একটি প্রশংসনীয় গুণ এই যে, নাটকটি ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার জন্য নাটকীয় গুণের স্ফূর্তি ব্যাহত হয় নি। ঐতিহাসিক উপাদান ও নাটকীয় উপাদান দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিদ্যুৎ-শক্তিতে এই নাটকে রাসায়নিক সংযোগ লাভ করেছে।

*

এখন, নাটকীয় কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক 'দুর্গাদাসে'র মধ্যে সার্থকভাবে বিকাশলাভ করেছে কিনা তার বিচার করতে হবে। নাটকের তিনটি অঙ্গ—কাহিনী, সংলাপ ও চরিত্র। 'দুর্গাদাস'-এর কাহিনী ও সংলাপ সম্বন্ধে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। এখন, এই নাটকের চরিত্রগুলি কতদূর সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে, আমরা তার বিচার করব।

এই নাটকের দুটি প্রধান চরিত্র—দুর্গাদাস ও গুলনেয়ার। দুর্গাদাস এই নাটকের নায়ক। মহত্ত্ব, বীরত্ব, নির্ভীকতা, স্বজাতিপ্রীতি, ন্যায়নিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা ও কর্তব্যপরায়ণতা—এই কয়েকটি গুণের চরম বিকাশ আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই। প্রভু যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর শিশু-পুত্রকে ভারতসম্রাট ঔরংজেবের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্যে দুর্গাদাস নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। ঔরংজেবের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। লোভ দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে ঔরংজেব দুর্গাদাসকে বশ করতে পারলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েও কিছু করতে পারলেন না। অবিশ্বাস্য বীরত্ব দেখিয়ে অগণিত মোগল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে দুর্গাদাস অজিত সিংহকে নিয়ে মেবারে চলে গেলেন। তারপর সুরু হল যুদ্ধ। দুর্গাদাস মিলিত রাজপুত সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু কিছুদিন যুদ্ধ চলার পর ঔরংজেবের পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ করে রাজপুতদের শরণাপন্ন হলেন। সমস্ত রাজপুত নেতা আকবরকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হলেন,

দুর্গাদাস হলেন না। এইখানে দুর্গাদাসের এক নতুন মহত্ত্বের আমরা পরিচয় পাই। আশ্রিতের প্রতি দায়িত্ব এখন তাঁর কাছে দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্বের চাইতেও বড় হয়ে দেখা দিল। তিনি অসম্পূর্ণ সমস্ত কর্তব্যভার পিছনে ফেলে রেখে মুষ্টিমেয় সৈন্য সঙ্গে নিয়ে আকবরকে মহারাষ্ট্ররাজ শম্ভুজীর আশ্রয়ে পৌঁছে দিলেন। কিন্তু সেখানেও তেজস্বী ন্যায়নিষ্ঠ দুর্গাদাস স্থির থাকতে পারলেন না। দুশ্চরিত্র শম্ভুজীর গ্রাস থেকে এক অনাথা বালিকাকে রক্ষা করতে গিয়ে দুর্গাদাস বন্দী হয়ে মহাশত্রু ঔরংজেবের কাছে প্রেরিত হলেন। স্বজাতির কাছে এই লাঞ্ছনা দুর্গাদাসের মন ভেঙে দিল। ঔরংজেবের কারাগারে দুর্গাদাস মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—কিন্তু মৃত্যুর পরিবর্তে তার কাছে এল সম্রাজ্ঞীর প্রণয়নিবেদন। এই পরীক্ষায়ও দুর্গাদাস উত্তীর্ণ হলেন, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সম্রাজ্ঞীকে প্রত্যাখ্যান করলেন, দিল্লীর সিংহাসনের প্রলোভন, মৃত্যুভয় কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারল না।

কিন্তু এই দেবপ্রতিম মানুষটির জন্য চরম আঘাত তখনও অপেক্ষা করছিল। সারাজীবন যিনি কর্তব্যপালন করে এসেছেন, কর্তব্যেরই অনুরোধে তিনি আকবরের কন্যা রাজিয়াকে ঔরংজেবের হাতে সমর্পণ করলেন। তখন রাজিয়ার প্রেমে মগ্ন অজিত সিংহ ক্রোধে অন্ধ হয়ে দুর্গাদাসকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন, উপরন্তু তিনি বললেন, "প্রচুর উৎকোচ নিয়েছ বুঝি, সেনাপতি ?" দুর্গাদাস বললেন, "উৎকোচ মহারাজ! তা' যদি নিতাম—না ক্ষমা কর্বেন মহারাজ।" এই অসমাপ্ত উত্তরের মধ্যেই দুর্গাদাসের অন্তরের অবরুদ্ধ হাহাকার গুমরে উঠেছে। যাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তিনি নিজের সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই অজিত সিংহের কাছ থেকে এত বড় আঘাত—এ যে "The most unkindest cut of all"। এই আঘাত দুর্গাদাসকে ট্র্যাজিক চরিত্র করে তুলেছে। ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হয়েছে দুর্গাদাসের এই আক্ষেপোক্তির মধ্যে, "ব্যর্থ হয়েছি। পার্লেম না এ জাতিটাকে টেনে তুলতে। মোগল সাম্রাজ্য থাকবে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না।" যে হিন্দু জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দুর্গাদাস এত সংগ্রাম করলেন, তাদের মধ্যে অশেষ ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি—দলাদলি, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, অদূরদর্শিতা প্রভৃতি দেখেই দুর্গাদাস নিজের ব্যর্থতা উপলব্ধি করেছেন।

দুর্গাদাস-চরিত্রের মধ্যে যে মহত্ত্ব ও উন্নত আদর্শ দেখানো হয়েছে, তা

অবাস্তব হয় নি। ইতিহাসের দুর্গাদাসের মধ্যেও অনুরূপ মহত্ব ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠ যদুনাথ সরকার দুর্গাদাসকে "The flower of Rathor Chivalry" বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

"Durgadas, one of the several sons of Jaswant's minister Askaran, the baron of Drunera, was born at the lesser Mandesor. When quite a lad he had shown his keen regard for his king's good name by slaying some royal grooms who had been feeding the State camels with the standing corn of the peasantry and wickedly asserting that it was done by the Rajah's command. But for his twenty-five years' unflagging exertion and wise contrivance, Ajit Singh could not have secured his father's throne. In scorn of the frequent risk of capture and other dangers of the long journey, he volunteered to escort the luckless rebel prince Akbar to the Maratha Court and thus saved him from the horrors of Aurangzib's vengeance. A soul of honour, he kept the deserted daughter of Akbar free from every stain and provided her with every facility for religious training in the wilderness of Marwar. Fighting against terrible odds and a host of enemies on every side, with distrust and wavering among his own countrymen, he kept the cause of his chieftain triumphant. Mughal gold could not seduce, Mughal arms could not daunt that constant heart. Almost alone among the Rathors he displayed the rare combination of the dash and reckless valour of a Rajput soldier with the tact, diplomacy and organising power of a Mughal minister of State. No wonder that the Rathor bard should pray that every Rajput mother might have a son like Durgadas :

Eh mātā esā put jin
jesā Durgā-dās.*"

(History of Aurangzib, vol. III)

ঐতিহাসিক দুর্গাদাস চরিত্র এবং নিজের পিতার "দেবচরিত্র সম্মুখে" রেখে দ্বিজেন্দ্রলাল এই চরিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু একথা ভুললে আমাদের চলবে

* এর অর্থ, 'হে মাতা ! এমন পুত্রের জন্ম দাও, যেমন দুর্গাদাস।'

না যে, মহৎ লোকেরও চরিত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্বলতা থাকে। কর্তব্য-পালনের সময় তাঁকে বারবার দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। এই নাটকে দুর্গাদাস চরিত্রের কোন দ্বন্দ্ব দেখানো হয় নি ; এই কারণে চরিত্রটির মধ্যে সামান্য অপূর্ণতা থেকে গিয়েছে। বিশেষত যেখানে গুলনেয়ার দুর্গাদাসকে প্রেম-নিবেদন করছিলেন, সেখানে তা প্রত্যাখ্যানের আগে দুর্গাদাসের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখানো উচিত ছিল বলে মনে হয়। তাহলে দুর্গাদাস চরিত্র আরও স্বাভাবিক ও মানসিকতাপূর্ণ হত।

গুলনেয়ার চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ব সৃষ্টি। এক বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জেবউন্নিসাকে বাদ দিলে এই শ্রেণীর চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর নেই বলা চলে। গুলনেয়ারের রূপ যেমন অসামান্য, যৌবনও তেমনি দীর্ঘস্থায়ী। এই রূপযৌবনের মায়াবন্ধনে সে ভারতসম্রাট ঔরংজেবকে বন্দী করেছিল, তাই ঔরংজেব নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে তার হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। গুলনেয়ারের ব্যক্তিত্ব লৌহের মত কঠিন, তাই সে তর্জনীর ইঙ্গিতে ঔরংজেবকে পরিচালিত করতে পারত। তার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি সীমাহীন। যোধপুরের রাণী তাকে যে অপমান করেছিলেন, তার প্রতিশোধের জন্যে তাঁর স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্রের হত্যাই তার কাছে যথেষ্ট মনে হয় নি, তাঁকে আরও ভয়ঙ্কর শাস্তি দানের জন্যে গুলনেয়ার তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। বিবেকের কোন বালাই-ই তার নেই। তার মন কতকটা পশুর মত, তার মধ্যে যেমন কোন উচ্চ প্রবৃত্তি নেই, তেমনি সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই ; কোকিলের ডাক বা গানের সুরের মাধুর্য সে উপলব্ধি করতে পারত না।

গুলনেয়ারের দম্ভ অটল। কোন অবস্থাতেই সে নতি স্বীকার করবার পাত্রী নয়। বন্দী অবস্থায় যখন তাকে যোধপুরের রাণীর কাছে উপস্থিত করা হল, তখন সে শাস্তির কথা শুনে এতটুকু কাতরতা প্রকাশ করল না, বলল "আমি তোমার বন্দী ; যা ইচ্ছা হয় কর।" রাণী যখন প্রশ্ন করলেন, "তুমি আমাকে বন্দী করলে কি কত্তে, ভারতসম্রাজ্ঞী ?" তখন গুলনেয়ার নির্ভীকভাবে উত্তর দিয়েছে, "কি কত্তাম ? তোমায় আমার পাদোদক খাওয়াতাম ; পরে বধ কর্ত্তাম।" এইখানে গুলনেয়ারের ব্যক্তিত্ব আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে !

দুর্গাদাসকে দেখে গুলনেয়ারের হৃদয় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

দুর্গাদাসের প্রতি গুলনেযারের মনোভাবকে প্রেম না বলে কামোন্মত্ততা বললেই ঠিক্ বলা হয। সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ও আভিজাত্য বিসর্জন দিযে সে কারাগারে গিযে দুর্গাদাসকে প্রেম নিবেদন কবল। কিন্তু দুর্গাদাস তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন আমরা গুলনেযারের বিবেকহীনতাব আর এক পবিচয পেলাম। যে দুর্গাদাস একদিন তার প্রাণ বাঁচিযেছিলেন, তাঁকেই সে বধ কববার আদেশ দিল।

প্রসঙ্গত বলা যায, এই দৃশ্যে নাট্যকারেব ঔচিত্যজ্ঞানেব অভাব স্থচিত হযেছে। সম্রাজ্ঞীর পক্ষে এতখানি নীচে নামা সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও অন্য প্রশ্ন ওঠে। এই বযসে কোন নারীর পক্ষে এতখানি প্রেমবিহ্বলা হওযা সম্ভব কি? আব বযঃপ্রাপ্ত পুত্র কামবক্সকে সঙ্গে নিযে গুলনেযাব দুর্গাদাসের কারাগারে অভিসারে যাচ্ছেন, এরকম দৃশ্যও আমাদেব সঙ্গতিবোধ ও শোভনতাবোধকে পীড়িত করে।

দুর্গাদাসেব প্রত্যাখ্যান দাম্ভিকা গুলনেযাবের প্রথম বৃহৎ পরাজয। ব্যর্থ-প্রেমের জ্বালা গুলনেযারকে উন্মাদ করে তুলল। শুধু তাই নয, এব পব থেকেই তার দ্রুত পতন স্থরু হ'ল। আকাশেব আসন থেকে নেমে সে পাতালেব অন্ধকার আবর্তের মধ্যে তলিযে গেল। যে ঔরংজেবকে এতদিন সে ক্রীড়নকেব মত চালিত করেছে, তিনিই তাকে প্রায বন্দী করলেন। কামবক্সকে বিজাপুবে না পাঠাবার জন্যে গুলনেযাবের অনুবোধ তিনি প্রত্যাখান কবলেন। গুলনেযার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে তিনি জানালেন সময নেই। অপ্রত্যাশিত এই আঘাতের মধ্য দিযে গুলনেযার উপলব্ধি করল, "মানুষের যখন পতন হয, এই রকমই হয বটে। সময বদলেছে। কিন্তু আমি এ কথা আজ নীরব হযে শুনলাম। আশ্চয্য। আমি কি সেই গুলনেযার?"

এরপর গুলনেযার পেল সবচেযে বড আঘাত। এই আঘাত এল যখন সে আযনায নিজেব মূর্তি দেখল। তখন সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "এ কি! সত্যই ত, আমি সে গুলনেযার নই। চক্ষু কোটরে সেঁদিযেছে, গণ্ড বসে গিযেছে: চুল সব পেকে গিযেছে। আমি ত সে গুলনেযাব নই।" গুলনেযারের এই উপলব্ধি প্রকৃত ট্র্যাজেডিব স্থষ্টি কবেছে। মানুষেব জীবনে সময সময এমন একটা আঘাত আসে, যখন জীবনের মূল্যবোধ (value-sense of life) পরিবর্তিত হযে যায আর সেইখানেই স্থষ্টি হয সত্যকার ট্র্যাজেডি। যে রূপ আর যৌবনের

শক্তিতে গুলনেয়ার একদিন ভারতসম্রাটকে নিজের পদানত করেছিল, যার গর্বে সে পৃথিবীতে কাউকে গ্রাহ্য করে নি, সেই রূপযৌবন আজ বাতাসের মত মিলিয়ে গিয়েছে। গুলনেয়ারের জীবনের মূল্যবোধই আজ পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল যে, সে এতদিন চোরাবালির উপর দাঁড়িয়েছিল। এখন আর তার কিছুই নেই, সে ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন তাকে "একটা বাঁদিও চোখ রাঙিয়ে যায়।"

এই চরম পরাজয়ের পরে গুলনেয়ার নিজের জন্যে যে পথ স্থির করে নিল, তা তার অটল ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। যে একদিন সকলের উপর প্রভুত্ব করেছিল, সে সকলের অবহেলা ও অনুকম্পার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই নিজের জীবন সে নিজেই শেষ করল। ঔরংজেব তাকে ক্ষমা করতে এলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে বলল, "স্থবির শীর্ণ ঔরংজীব! তোমার তাচ্ছিল্য নিয়ে আমি জীবন ধারণ কর্ব্বো মনে করেছিলে? তোমার কৃপা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকবো ভেবেছিলে? ঐ সূর্য্যের পানে তাকাও, তার পরে আমার পানে চাও—বল দেখি, দেখে বোধ হয় না কি যে, আমরা দুই ভাই বোন! সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্তরেখায় উঠেছিলুম, সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্তরেখায় অস্ত যাচ্ছি।" সারাজীবন যে মাথা উঁচু রেখেছিল, মাথা উঁচু রেখেই, সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। মৃত্যুকালে সে পরিপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঔরংজেবের কাছে নিজের মুখে দুর্গাদাসের প্রতি তার প্রেমের কথা ঘোষণা করেছে। গুলনেয়ারকে দিয়ে [illegible] কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ না করিয়ে নাট্যকার উচ্চস্তরের শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

গুলনেয়ারের চরিত্রে আগাগোড়াই প্রচণ্ড উগ্রতা দেখানো হয়েছে, কেবল বাজিয়ার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে তার মনের কোমল দিকটির পরিচয় পাই। এর মধ্য দিয়ে গুলনেয়ারকে মানুষ বলে চেনা যায়।

'দুর্গাদাস' নাটকের অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে দুর্গাদাসের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের একটি মন্তব্য অন্যান্য কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই নাটকের দিলীর খাঁ, কাশিম প্রভৃতি চরিত্রকে অবিমিশ্রভাবে মহৎ করে এবং শ্যামসিংহ, কাবলেশ খাঁ প্রভৃতি চরিত্রকে অবিমিশ্রভাবে নীচ করে আঁকা হয়েছে। কিন্তু মানুষ অবিমিশ্রভাবে মহৎ বা নীচ হয় না। ভালমন্দ, দোষগুণ, সুপ্রবৃত্তি-দুষ্প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে

মিলেমিশে থাকে। অতি মহৎ লোকের মনেও সঙ্কট মুহূর্তে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, অতি বড পাপিষ্ঠের মনেও ঘৃণিত কাজ করবার সময় সাময়িকভাবে দ্বিধা দেখা দেয়। আদর্শ নাট্যকার চরিত্রচিত্রণের সময় চরিত্রগুলিকে দোষেগুণে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বহির্দ্বন্দ্বে জীবন্ত ও জটিল করে তোলেন। 'দুর্গাদাস' নাটকে চরিত্রচিত্রণের এই রীতি অনুসৃত না হওয়ায় তার উৎকর্ষ ও আকর্ষণীয়তা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে সন্দেহ নেই।

*

'দুর্গাদাস' নাটক সম্বন্ধে আর একটি প্রধান বিচার্য বিষয় এই যে নাটকটিকে ট্র্যাজেডির পর্যায়ভুক্ত করা চলে কিনা। ইতিপূর্বে আমরা দুর্গাদাস ও গুলনেয়ারের চরিত্র যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছি, তাতে দেখানো হয়েছে যে দুটি চরিত্রের মধ্যেই সত্যকার ট্র্যাজেডি রয়েছে।

এই দুটি প্রধান ট্র্যাজেডি ছাড়া নাটকটিতে আরও দুটি ট্র্যাজেডি আছে। প্রথমটি রাণা রাজসিংহের ট্র্যাজেডি। রাজসিংহ একদিন ভ্রমবশত তার যে পুত্রকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, সে-ই হ'ল চরম যোগ্যতা ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী। তার ফলে রাজসিংহের অন্তর অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল; তারপরে যখন তাঁকে কঠিন সমস্যা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেই পুত্র চরম স্বার্থত্যাগ করল, তখন রাজসিংহের পিতৃহৃদয় তুষানলে দগ্ধ হয়েছে। তাঁর ট্র্যাজেডি এই। শেষ পর্যন্ত ভীমসিংহের মৃত্যু তার ট্র্যাজেডিকে সম্পূর্ণ করেছে এবং তাঁর নিজের জীবনেও মৃত্যুর যবনিকা টেনে দিয়েছে।

দ্বিতীয়টি রাজিয়ার ট্র্যাজেডি। যে রাজিয়া একদিন বালিকাসুলভ সরলতায় তার ভালবাসার পাত্র হিসাবে মেনি বেড়াল আর বুড়ো বাবুর্চির নাম করেছিল, সে-ই পরবর্তীকালে ভালবাসায় পড়ে নিজের মনপ্রাণ দয়িতকে নিঃশেষে সমর্পণ করেছে এবং সেই ভালবাসা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে চিরদিনের মত সাথী করেছে হাহাকার আর চোখের জলকে।

এছাড়া সুন্দরী স্ত্রীর মোহে পড়ে জয়সিংহের মনুষ্যত্ব বিসর্জন এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্য দিয়ে তার মোহভঙ্গ—এর মধ্যেও ট্র্যাজেডির ভাব আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'দুর্গাদাস' নাটকে কয়েকটি ট্র্যাজেডি রয়েছে। প্রত্যেকটি ট্র্যাজেডির মূলেই আছে সূক্ষ্ম বেদনা। এই কারণে আমরা 'দুর্গাদাস' নাটককে নিঃসন্দেহে 'সার্থক ট্র্যাজেডি' আখ্যায় অভিহিত করতে পারি।

শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসের পটভূমি বাঙালীর ঘরোয়া জীবন। এ জীবন আমাদের একান্ত পরিচিত। এর মধ্যে অসাধারণ কিছুই বোধ হয় নেই। নেই বিশেষ কোন রহস্য, রোমাঞ্চ ও রোমান্স। কিন্তু তারও মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-বেদনার কত তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মিলন-বিচ্ছেদের আলোছায়া খেলায় কত মধুর মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, তার খবর কে রাখে? কেবল শরৎচন্দ্রের মত সহানুভূতিশীল সাহিত্যিকের দৃষ্টিতেই সেইগুলি ধরা পড়ে, তিনিই তাদের রূপায়িত করে তুলতে পারেন তাঁর রচনার মধ্যে। তাঁর যে সমস্ত উপন্যাসে বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও মধুর আলেখ্য পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে 'নিষ্কৃতি' অন্যতম।

'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের মধ্যে একটি নিতান্ত সাধারণ সচ্ছল অবস্থাপন্ন বাঙালী পরিবারকে দেখতে পাই। সেখানে আছেন গিরীশের মত উদাসীন ভোলানাথ প্রকৃতির কর্তা; আইন-কানুনের খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে, কিন্তু নিজের সংসারের কোন খবর তিনি রাখেন না; অন্তরে তাঁর স্নেহমমতা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু স্থান পায় না। আছেন সিদ্ধেশ্বরীর মত গৃহিণী; তিনি সংসারের কর্ত্রী হয়েও কড়াগণ্ডার হিসাব জানেন না এবং ছোট জা-কে অভিভাবকের মত ভয় করে চলেন; তাঁর স্নেহভালবাসা কেবলমাত্র নিজের সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সংসারের সমস্ত ছেলেমেয়ের উপরেই তা সমানভাবে বর্ষিত হয়; এই স্নেহ অন্ধ এবং বিচারবুদ্ধিহীন। এই পরিবারে আরও আছে রমেশের মত দায়িত্বজ্ঞানহীন, পরনির্ভর, নিষ্কর্মা যুবক, যে গিরীশের সহোদর ভাই না হয়েও তাঁর স্নেহের সুযোগ নিয়ে নিজেকে তাঁর পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আছে শৈলজার মত কর্তব্যপরায়ণ, কর্মনিষ্ঠ, বুদ্ধিমতী বধূ—যে নিজের সুখসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে হাসিমুখে অক্লান্তভাবে সংসারের সেবা করে যায়। আর আছে কয়েকটি অবোধ শিশু, যারা অন্যসব বড় বড় ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে বড়মার পাশে শোয়া নিয়ে ঝগড়া করে।

স্রোতে-ভেসে-আসা শেওলার মতই অনির্দিষ্ট যাদের ভবিষ্যৎ, সেই রমেশ-শৈলজা স্থান পেয়েছিল এই একান্নবর্তী পরিবারের বাঁধা ঘাটে। কিন্তু

গিরীশ-সিদ্ধেশ্বরী কোনদিনই তাদের উপর আশ্রয়দাতার অনুকম্পা বর্ষণ করেন নি। তাঁদের ও এঁদের মধ্যে ছিল একটি অফুরন্ত ভালবাসার সুনিবিড় বন্ধন। এই ভালবাসার জোরেই শৈলজা সিদ্ধেশ্বরীর উপর শাসন ফলাত এবং সিদ্ধেশ্বরী তার কথার অবাধ্য হলে উপবাস সুরু করে দিত। এই সংসারে কলহ-বিবাদও কখনো কখনো হত। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে সত্যকার ভালোবাসা থাকার জন্য তা মিটে যেতে বেশী দেরী হত না।

কিন্তু যেমন লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাসরের ছোট একটি ছিদ্রপথ দিয়ে কালনাগিনী প্রবেশ করেছিল, তেমনি এই ভালবাসায় ভরা সংসারের মধ্যেও একদিন একটুখানি ফাটল সৃষ্টি হ'ল এবং তার মধ্য দিয়েই এল বিচ্ছেদ। এই ফাটল সৃষ্টি করল হরিশ এবং নয়নতারা। তাদের ঈর্ষ্যা ও পরশ্রীকাতরতা, বিশেষত শৈলজার প্রতি নয়নতারার বিদ্বেষ এই শান্তি-নীড়ের নির্মল আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলল। সংসারের গৃহিণী সিদ্ধেশ্বরী দুবল প্রকৃতির লোক। তোষামোদে তাঁকে বশ করা বা কারো বিরুদ্ধে তাঁর কান ভারী করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। তাই নয়নতারার উদ্দেশ্য পরিণামে সফল হ'ল। তার হিংসার সুড়ঙ্গ বেয়ে যে কালসর্প নেমে এল, তার বিষে সমস্ত সংসার নষ্ট হয়ে গেল। এমনি করেই বাঙালীর সংসার ভাঙে। এমনিভাবেই কারো নীচতা আর কারো দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও মনোমালিন্যের কলুষিত বাতাস এসে সেই সংসারকে তছনছ করে দিয়ে যায়। 'নিষ্কৃতি'তে শরৎচন্দ্র শুধু একটি সুন্দর সংসারের আলেখ্য দেখান নি, তার ভেঙে যাওয়ার ছবিটিও তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসের উপসংহারে শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনের আর এক দিক্ দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন পৃথিবীতে এমন এক-শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁদের হিংসার বিষবাষ্প স্পর্শ করতে পারে না; এরাই সংসার-মরুভূমিতে পান্থপাদপ। গিরীশ এই শ্রেণীর একজন লোক। তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র এই গৃহবিচ্ছেদের কাহিনীটিকে একটি মধুর সুরে সমাপ্ত করেছেন।

'নিষ্কৃতি'র একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে শরৎচন্দ্র বিচ্ছেদের অবসান ও পুনর্মিলন দেখান নি। না দেখিয়ে তিনি তাঁর অভ্রান্ত বাস্তব-বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন। জীবনে হৃদয়ের বন্ধন একবার ছিন্ন হলে আর জোড়া লাগে না—"ভিন্নশ্লিষ্টা তু যা প্রীতির্ন সা স্নেহেন বর্ধতে।" সিদ্ধেশ্বরীর সংসারে

রমেশ-শৈলজার প্রত্যাবর্তন ও আগেকার অকৃত্রিম স্নেহ-সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবাস্তব ব্যাপার। তাই শরৎচন্দ্র তার অবতারণা করেন নি।

'নিষ্কৃতি'র প্রধান সম্পদ তার চরিত্রগুলি। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চরিত্র-চিত্রণে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চারটি—গিরীশ, সিদ্ধেশ্বরী, নয়নতারা এবং শৈলজা। এই চরিত্রগুলি সম্বন্ধেই এখন আমরা আলোচনা করব।

এদের মধ্যে গিরীশের চরিত্র সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে এক শ্রেণীর উদাসীন অন্যমনস্ক ভোলানাথ প্রকৃতির পুরুষের চরিত্র দেখা যায়। 'বিরাজ বৌ'-এর নীলাম্বর, 'দত্তা'র নরেন এবং 'নিষ্কৃতি'র গিরীশ এই শ্রেণীর চরিত্র। কিন্তু এঁদের মধ্যে গিরীশই সবচেয়ে উদাসীন আপনভোলা প্রকৃতির লোক। তিনি তাঁর মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত যে আর কোন কথা তার মনে স্থান পায় না। এমন কি নিজের সংসারের কোন খবরও তিনি রাখেন না। নিজের ছেলে কলকাতায় আছে কি নেই, সে কথাও তিনি জানেন না।

গিরীশের কিছুই মনে থাকত না। একদিন যখন সিদ্ধেশ্বরী তাঁর কাছে শৈলজা, অতুল, রমেশ প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেলেন, তখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, "আমি বেশ করে ধমকে দেব'খন।" কিন্তু রাত্রিতে তিনি বেমালুম উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে অতুলের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্যে রমেশকে বকতে লাগলেন। তারপর, কোন কথা তাঁর কানে ভাল করে ঢুকত না। সিদ্ধেশ্বরী যখন তাকে বললেন, "কেবল শূয়ারের পাল খাওয়াবার জন্যই কি দিবারাত্রি খেটে মরবে?" তখন কেবলমাত্র খাওয়ার কথাটাই গিরীশের কানে গেল, তিনি উত্তর দিলেন, "না, আর দেরি নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্ছি।" সিদ্ধেশ্বরীর মুখে ছোট বউরা বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে শুনে তিনি নির্বিকারভাবে বললেন, "ছোটবৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল।" এ কথায় সিদ্ধেশ্বরী উত্তেজিত হয়ে উঠলে গিরীশ জিজ্ঞাসা করলেন ছোট বউমা কোথায় যাচ্ছেন। সিদ্ধেশ্বরী তা জানেন না বলাতে গিরীশ বললেন, "ঠিকানাটা লিখে নাও না।" তাঁর কথায় কোন সান্ত্বনা না পেয়ে সিদ্ধেশ্বরী ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন অর্থাৎ কাঁদতে লাগলেন। গিরীশ তখন তার কর্তৃত্বের পরিচয় দিলেন, হাতের কাছে আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে তাঁর

ছেলে হরিচরণকে ডেকে তিনি ধমকাতে লাগলেন এবং তার ফলে মাঝখান থেকে হরিচরণের শিক্ষকের চাকরী যাবার হুকুম হয়ে গেল। হরিচরণের শিক্ষকের নাম যে ধীরেনবাবু, তা শোনামাত্রই গিরীশ ভুলে গেলেন এবং সিদ্ধেশ্বরীকে বলতে লাগলেন, "রমেশকে ব'লে দিয়ো কালই যেন এই পরাণবাবুকে জবাব দিয়ে অন্য মাষ্টার রেখে দেয়।"

গিরীশের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কোন কথা শোনামাত্র তিনি অম্লানবদনে তাতে সায় দিতেন। সিদ্ধেশ্বরী যখনই তাঁর কাছে শৈলজা বা রমেশ সম্বন্ধে কোন কথা বলে জিজ্ঞাসা করতেন, "এটা কি ভাল?" গিবীশ তক্ষণি উত্তব দিতেন, "বড খারাপ।" রমেশ পাটের ব্যবসাতে চার হাজার টাকা লোকসান দিয়েছে, গিরীশ অম্লানবদনে তাকে আরও আট হাজার টাকা দিতে চান; কিন্তু হরিশ যে মুহূর্তে তার বিরোধিতা করলেন, তিনি হরিশের কথায় সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক বলেচ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা, ঠিক ত।" কানাই-পটলের বিচ্ছেদে কাতর সিদ্ধেশ্বরী যখন মামলা করে তাদের ফিরিয়ে আনবার অসম্ভব কল্পনা করতে লাগলেন এবং গিরীশকে জিজ্ঞাসা করলেন মামলায় তিনি জিতবেন কিনা, তখন গিরীশ অম্লানবদনে তাঁকে আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু এই নিতান্ত উদাসীন প্রকৃতিব মানুষটিব অন্তরে যে ঐশ্বর্য ছিল, তার তুলনা হয় না। রমেশ এবং শৈলজাকে গিরীশ অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। এই ভাল-বাসা চিরস্থায়ী, সিদ্ধেশ্বরীর ভালবাসার মত তা বাইরের আঘাতে চুরমার হয়ে যাব না। অপদার্থ রমেশের প্রতি গিবীশের প্রাণঢালা ভালবাসা ছিল বলেই তাকে তিনি নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে অকাতরে অর্থের পর অর্থ দিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন রমেশের সঙ্গে তাঁর মামলা চলতে লাগল, তখনও তাঁব অন্তরের নিবিড় স্নেহের ভিত্তি লেশমাত্র বিচলিত হ'ল না। রমেশের প্রতি তাঁর ভৎর্সনার অন্তরালে সেই অফুরন্ত স্নেহই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর স্নেহ ও সরলতাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত সঙ্কটের অবসান ঘটিয়েছে,—শৈলজা নিষ্কৃতি পেয়েছে, চাটুজ্যে বংশও নিষ্কৃতি পেয়েছে।

গিরীশ-চরিত্রের আকর্ষণীয়তা খুব বেশী। তার কথাবার্তা, কার্যকলাপ—সমস্ত কিছু শরৎচন্দ্র এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যা মধুর হাস্যরসের খোরাক জোগায়। এর মধ্যে কতকটা অতিরঞ্জন রয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু বাস্তব জগতেও এই শ্রেণীর চরিত্র একেবারে বিরল নয়।

অতঃপর সিদ্ধেশ্বরী-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। সিদ্ধেশ্বরী সংসারের গৃহিণী, কিন্তু সংসার পরিচালনা করার শক্তি তাঁর ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর ছোট জা শৈলজার দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তাই সিদ্ধেশ্বরী তার উপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী নিজে পঞ্চাশ টাকা যে কত গণ্ডা টাকা তা পর্যন্ত জানতেন না। শৈলজা যে শুধু সংসার পরিচালনা করত তা'ই নয়, তার কর্তৃত্ব সংসারের সকলের উপর বিস্তৃত হয়েছিল, এমনকি স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরীর উপরেও। সিদ্ধেশ্বরী শৈলজাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাই শৈলজার কর্তৃত্ব তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "শৈল আমার পুরুষমানুষ হইলে এতদিনে জজ হইত।" বলা বাহুল্য, স্নেহের আধিক্যের দরুণ শৈল সম্বন্ধে তাঁর উচু ধারণাটি একটু অতিরিক্ত রকমের হয়ে গিয়েছিল। শৈলজার সমস্ত শাসনই সিদ্ধেশ্বরী মেনে নিতেন, কারণ না মানলে শৈলজা উপবাস সুরু করে দেবে।

বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহের অন্ত ছিল না। এ বিষয়ে তার আপন-পর ভেদ ছিল না। নয়নতারা ও শৈলজার সন্তানদের তিনি নিজের সন্তানদের চেয়ে কম ভালবাসতেন না। শিশুদের তিনি নিজের হাতে খাওয়াতেন, তারা যতটা খেতে পারত, তিনি তার চাইতে বেশী খেতে বাধ্য করতেন, অথচ সব সময়েই তার মনে হত তারা কম খাচ্ছে। রাত্রে তিনি শিশুদের নিয়ে শুতেন। তার প্রকাণ্ড বড় বিছানার অধিকাংশই শিশুরা অধিকার করে থাকত। সেখানে তাঁর নিজের জন্যে সামান্য একটু জায়গার বেশী আর কিছু থাকত না। এতে তাঁর কষ্ট হত, কিন্তু তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। কেউ তাঁকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে এলে তিনি বিরক্ত হতেন। সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহ ছিল, কিন্তু ব্যক্তিত্ব ছিল না; তাই শিশুরা তাঁকে ভালবাসত, কিন্তু এতটুকু ভয় করত না।

সিদ্ধেশ্বরীর বুদ্ধি খুব বেশী ছিল না। তার ফলে তিনি ভালো-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্যের প্রভেদ ধরতে পারতেন না। তাঁর বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। তাছাড়া, খোশামোদ করে তাঁকে সহজেই বশ করা যেত। তাঁর এই সমস্ত ত্রুটির রন্ধ্রপথ দিয়েই শনি প্রবেশ করে তাঁর সংসারকে জ্বালিয়ে দিল। নয়নতারা সিদ্ধেশ্বরীর এই সব ত্রুটির পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে শৈলজার বিরুদ্ধে তাঁর মনকে বিষিয়ে দিল। স্ত্রীলোকের কাছে তার স্বামী-পুত্রের চেয়ে প্রিয় আর কেউই

নেই। তাই নয়নতারা যখন তাঁর মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিল যে শৈলজা ও রমেশ সংসারে থাকলে তাঁর স্বামী-পুত্রের সর্বনাশ হবে, তখন তিনি তাদের সংসার থেকে বিদায় দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। অথচ নয়নতারার অভিযোগ কতখানি সমূলক, তা নির্বোধ সিদ্ধেশ্বরী অনুসন্ধান করে দেখলেন না।

রমেশ শৈলজা ও তাদের ছেলেরা চলে গেলে কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। "শৈলর ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কে যেন তাহার বুকে মুগুর দিয়া মারিল।" কিন্তু তার মনের হাহাকার চরম রূপ নিল যখন তিনি দেখলেন তাঁর বিছানার অনেকখানি খালি, সেখানে কানাই-পটল নেই। এর চাইতে বড় শাস্তি বোধ হয় সিদ্ধেশ্বরীর আর কিছুই হতে পারে না। এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সিদ্ধেশ্বরী তার অপূর্ব বুদ্ধি দিয়ে এক চমৎকার পরিকল্পনা করলেন, তিনি স্থির করলেন উকীলের চিঠি পাঠিয়ে কানাই-পটলকে তাদের মা-বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবেন।

যাহোক, "বৃষ্টির জলও শুকোয়, চোখের জলও শুকোয়।" কালক্রমে সিদ্ধেশ্বরীর মনোবেদনা অনেক কমে গেল। এমনি করে প্রায় এক বছর কেটে গেল। এমন সময় একদিন সিদ্ধেশ্বরী শুনতে পেলেন যে রমেশ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে দেশের সম্পত্তি নিয়ে মামলা চালাচ্ছে। তার ফলে সিদ্ধেশ্বরী শুধু যে রমেশের উপর সমস্ত সহানুভূতি হারালেন তা'ই নয়, তিনি রমেশকে মামলায় হারাবার জন্যে হরিশকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। এই ব্যাপারও সিদ্ধেশ্বরীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক, কারণ রমেশের সঙ্গে মামলায় হারলে তার স্বামী-পুত্রের ক্ষতি হবে।

কিন্তু সব গেলেও ভালবাসা যায় নি। তাই তার স্বামী যখন দেশে গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী তাকে কানাই-পটলের খবর নেবার কথা বলতে গেলেন। কিন্তু বলতে গিয়ে তাঁর গলা ধরে এল। শৈলজার সম্বন্ধে তার আগেকার ভালবাসা এবং উঁচু ধারণার একটু তখনও অবশিষ্ট ছিল। তাই নয়নতারা যখন বলল যে শৈলজা গিরীশকে বিষ খাওয়াতে পারে, তখন সিদ্ধেশ্বরী বললেন, "সে তুমি পার মেজ বৌ। শৈলর গলা কেটে ফেললেও সে তা পারবে না।'

সরল ভোলানাথ গিরীশ সমস্ত মামলার উপর যবনিকাপাত করে দিলেন। তখন হরিশ প্রভৃতি গিরীশকে যা তা বলতে লাগল, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী তাতে যোগ দিলেন না। যা তা বলে তারা চলে গেলে তিনি গিরীশকে তাঁর অন্তরের

শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এর থেকে বোঝা যায় সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্রে মহত্ত্বের অভাব ছিল না। পরের কুমন্ত্রণায় তাঁর সাময়িক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল মাত্র, কিন্তু তিনি সত্য সত্যই নীচ হয়ে যান নি।

সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সিদ্ধেশ্বরীর মধ্যে তিনি বিশেষভাবে একটি ভাবই ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটি তার বাৎসল্য। এই বাৎসল্য শুধু নিজের সন্তানদের উপরে নয়, পরের সন্তানদের উপরেও বিস্তৃত হয়েছে; তাই সিদ্ধেশ্বরী তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণ দেবার জন্য কানাই পটলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে চান; কানাই-পটলকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না। শরৎচন্দ্র 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দু, 'রামের সুমতি'র নারায়ণী, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'মামলার ফল'-এর গঙ্গামণি এবং 'নিষ্কৃতি'র সিদ্ধেশ্বরী—এই চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে নারীর পরের সন্তানদের জন্য মাতৃস্নেহের অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন।

সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে সরল বলে মনে হলেও তার মধ্যে কোথায় যেন একটা জটিলতা আছে। শরৎচন্দ্র তার সম্বন্ধে লিখেছেন, "তার প্রকৃতিটা ঠিক বুঝা যাইত না, এই জন্যই বোধ করি পাড়ায় তাহার সুখ্যাতি অখ্যাতি দুই একটু অতিমাত্রায় ছিল।" সিদ্ধেশ্বরীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখা যায়। একদিকে দেখি সিদ্ধেশ্বরী স্নেহময়ী, আবার অপরদিকে তাঁর স্নেহ ও বিশ্বাসের মেরুদণ্ড নেই। একদিকে দেখি তিনি সংসার পরিচালনায় অক্ষম, ছেলে পুলে মানুষ করা ছাড়া আর কোন কথায় তিনি কথা বলেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার তার মধ্যে গৃহিণীসুলভ বুদ্ধি ও কর্তব্যবোধের স্ফুরণ দেখা যায়,—এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই শৈলজাকে গঞ্জনা দেওয়ার জন্য হরিশকে একাধিকবার ভর্ৎসনা করার মধ্যে এবং নয়নতারাকে চাবি না দেওয়ার মধ্যে।

মোটের উপর সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্রটি বেশ স্বাভাবিক এবং সুচিত্রিত হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরীর সংলাপ রচনার মধ্যেও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংলাপ এমনই স্বাভাবিক যে এর মধ্য দিয়ে চরিত্রটি রক্ত-মাংসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সংলাপের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীর শারীরিক অসুস্থতাও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখযোগ্য। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে সংলাপ-রচনায় শরৎচন্দ্রের সমকক্ষ আজ অবধি কেউ আবির্ভূত হন নি। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "বাংলা উপন্যাসে 'dialogue' অর্থাৎ

পাত্র-পাত্রীর বাক্যালাপকেই তাহাদের মূর্তি-নির্মাণ বা চিত্র-চিত্রণের এত বড উপকরণ করিতে তাঁহার পূর্বে বা পরে আর কেহ পারে নাই ; সেই মুখনিঃসৃত কথাগুলিতেই তাহাদের মুখ-চোখের ভঙ্গিমার সহিত মনোভঙ্গিমাও ফুটিযা উঠিযাছে।" ('শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', বুকল্যাণ্ড সংস্করণ, পৃঃ ৩৫৬)

এরপর আমরা নযনতারা-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করব। শরৎচন্দ্র তার বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে নারীর নানা মূর্তি অঙ্কিত করেছেন। তার অনেক নারী-চরিত্রে যেমন তিনি নারীর স্নেহ, প্রেম ও মাধুর্যের ছবি ফুটিযে তুলেছেন, তেমনি নারীর নীচতা ও মালিন্যের চরম দৃষ্টান্তও তিনি একশ্রেণীর নারী-চরিত্রের মধ্য দিযে তুলে ধরেছেন। 'নিষ্কৃতি'র নযনতারা শেষোক্ত শ্রেণীর নারী-চরিত্র।

নযনতারার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ঈর্ষ্যা। শৈলজার প্রতি নযনতারার তীব্র ঈর্ষ্যা ছিল। এই ঈর্ষ্যার কারণ দুটি। প্রথম কারণ, সিদ্ধেশ্বরী সবসময শৈলজার প্রশংসা করতেন এবং তাকে সর্বগুণে গুণবতী বলে মনে করতেন, নযনতারা নিজেকে শৈলজার তুলনায কোন অংশে কম যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করত না, তাই সে শৈলজাকে ঈর্ষ্যা করত। দ্বিতীয কারণ, শৈলজার কাছে সিদ্ধেশ্বরীর চাবি থাকত। শৈলজার প্রতি এই ঈর্ষ্যা নযনতারাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তাই সে শৈলজাকে সিদ্ধেশ্বরীর অপ্রীতিভাজন করে তোলবার জন্য এবং সংসারে শৈলজার কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যের অবসান ঘটাবার জন্য তার সবশক্তি নিযোগ করেছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরীর নির্বুদ্ধিতার জন্য তার প্রচেষ্টা সফল হল। শৈলজার প্রাধান্যই শুধু সংসার থেকে লোপ পেল না, শৈলজা সংসার থেকে একেবারে বিদায নিযেই চলে গেল।

নযনতারা ছিল তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির অধিকারিণী। তারই বলে সে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিত্য নতুন উপায উদ্ভাবন করত এবং বহু বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করত। সে জানত শৈলজাকে সিদ্ধেশ্বরীর দু'চোখের বিষ করে তুলতে হলে সিদ্ধেশ্বরীর কানে অনবরত শৈলজার বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে যেতে হবে। এই কাজ সে অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন ধরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে গিযেছিল। এজন্য নযনতারা বিভিন্ন সমযে অবস্থা বুঝে বিভিন্ন উপায অবলম্বন করত। কখনও সে সিদ্ধেশ্বরীকে উপদেশ দিত, কখনও অনুনয় করত, কখনও তোষামোদ করত। সিদ্ধেশ্বরী রাগ দেখালে সে

তা সহ্য করত। কিন্তু এত করেও যখন সে দেখল তার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হচ্ছে না, তখন সে বুদ্ধি খাটিযে আর এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করল এবং এই উপায় অবলম্বন করেই সে সাফল্য লাভ করল। নযনতারা জানত যে স্বামীপুত্রবতী নারীর কাছে স্বামীপুত্রের চেযে বড আর কিছুই নেই। সেইজন্য সে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল, যাতে নিবোধ সিদ্ধেশ্বরীর মনে ধারণা জন্মে গেল যে রমেশ-শৈলজাকে সংসারে রাখলে তাঁর স্বামীপুত্রের অকল্যাণ হবে। তাই তখন আর সিদ্ধেশ্বরী রমেশ-শৈলজাকে সংসার থেকে বিদায দিতে আপত্তি করলেন না।

এইভাবে নযনতারার বুদ্ধি জযযুক্ত হ'ল। কিন্তু এই জযের পরেই তার পরাজযের পালা সুরু হল। অনেক চেষ্টা করেও সে সিদ্ধেশ্বরীর চাবি হস্তগত করতে পারল না। এইখানে তার বুদ্ধির ক্রটি হযে গিযেছিল। সে বুঝতে পারে নি যে একবার নিরীহ লোকের মনে সন্দেহের বীজ উৎপন্ন করে দিলে তার ফলভোগ থেকে নিজেকেও দূরে রাখা চলে না।

রমেশ-শৈলজার অনিষ্ট করার প্রচেষ্টা থেকে নযনতারা শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নি। কলকাতার বাড়ী থেকে তাদের তাডিযেও তার আক্রোশ মেটে নি। এর পরে সে তার সুযোগ্য স্বামী হরিশকে দিয়ে রমেশের বিরুদ্ধে মামলা করিযে তাকে সর্বস্বান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। শৈলজা স্বামীপুত্রের হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষা না করা পর্যন্ত যেন নযনতারার স্বস্তি নেই। কিন্তু এই নীচ স্ত্রীলোকটির মনোবাঞ্ছা শেষ পর্যন্ত সফল হ'ল না সরল আত্মভোলা গিরীশের জন্য।

নযনতারার চরিত্রে আর একটি মহা দোষ দেখা যায। নিজের ছেলেকে সে অত্যধিক আদর দিযে নষ্ট করেছিল। তার ছেলে অতুল তারই প্রশ্রযের ফলে অন্যান্য গুরুজনদের অমান্য করত। অতুলকে নযনতারা অতিমাত্রায বিলাসী এবং শৌখীন করে তুলেছিল এবং অতুলের বিলাসিতা ও বাবুযানার জন্য সে গর্ব করত। অতুলকে যদি কেউ তার অবাধ্যতা ও অসভ্যতার জন্য শাস্তি দিতেন তাহলে নযনতারা কেঁদে কেটে ও ঝগডা করে পাডা মাথায করত।

মোটের উপর, কোন গৃহস্থ নারীর মধ্যে যতখানি নীচতা ও অপগুণ থাকতে পারে, তার প্রায সবই নযনতারা-চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। এতখানি হীন বর্ণে চিত্রিত হওয়া সত্ত্বেও নয়নতারা অস্বাভাবিক চরিত্র হয় নি। কারণ এই শ্রেণীর নারী-চরিত্র বাস্তব জীবনেও দুর্লভ নয। শরৎ-সাহিত্যে নযনতারার

মত আরও কযেকজন নারীর দেখা পাওয়া যায। 'বিন্দুর ছেলে'র এলোকেশী, 'রামের সুমতি'র দিগম্বরী, 'মেজদিদি'র কাদম্বিনী প্রভৃতি এই শ্রেণীব চরিত্র।

এবাব শৈলজা-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা কবতে হবে। শৈলজা 'নিষ্কৃতি'ব অন্যান্য চরিত্রের মত বিশুদ্ধভাবে বাস্তবধর্মী নয, তার মধ্যে খানিকটা আদশবাদের প্রভাব দেখা যায। শৈলজা সাধারণ একটি বাঙালী পরিবাবের বধূ হযেও সব দিক দিযেই অনন্যসাধারণ। সে সবগুণে গুণবতী। শবৎচন্দ্রের ভাষায "শৈলকে সকলের ছোট ও ছোটবৌ কবিযাও (ভগবান) বাশি প্রমাণ বুদ্ধি দিযাছেন। হিসাব করিতে, চিঠিপত্র লিখিতে, কথাবাতা কবিতে, রোগে শোকে চাবিদিকে নজর রাখিতে, সকলকে শাসন কবিতে, রাঁধিতে বাড়িতে, সাজাইতে গুছাইতে ইহার জুড়ি নাই।" এই জন্য সিদ্ধেশ্বরী প্রাযই বলতেন, "শৈল আমাব পুরুষ-মানুষ হইলে এত দিনে জজ হইত।"

শৈলজার মধ্যে একটি লৌহকঠিন ব্যক্তিত্ব ছিল, যাব বলে সে সকলকে শাসন করতে এবং সকলেব উপর কর্তৃত্ব কবতে পারত। পবিবাবেব ছোট ছোট ছেলেরা সব সমযে তার ভযে তটস্থ হযে থাকত। কিন্তু শৈলজা শুধু শিশুদেব উপর নয, সংসারের গৃহিণী এবং তার বড জা সিদ্ধেশ্বরীর উপরেও তাব শাসন চালাত। সিদ্ধেশ্বরীর নিযমিতভাবে ওষুধ খেতে মোটেই আগ্রহ ছিল না, কিন্তু শৈলজার ভযে তিনি ওষুধ খাওযার অনিযম করতে পারতেন না। অবশ্য সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজার মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল বলেই সিদ্ধেশ্বরী শৈলজার শাসন মেনে চলতেন। সিদ্ধেশ্বরী শৈলজার কোন কথা না শুনলে শৈলজা অনশন করে তাঁকে শুনতে বাধ্য করত।

শৈলজার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। সিদ্ধেশ্বরী যখন নযনতারার চক্রান্তে ভুলে শৈলজাব আত্মমযাদায আঘাত করলেন, তখন আর শৈলজা তা সহ্য করতে পারল না। সিদ্ধেশ্বরীর প্রতি তার সমস্ত ভালবাসাই চলে গেল। এখন সে আর অনশন করে সিদ্ধেশ্বরীকে ঠিক পথে চালাবার কোন চেষ্টা করল না। ভালবাসা থেকেই সিদ্ধেশ্বরীর উপর শৈলজার জোর এসেছিল, সেই জোর প্রকাশ পেত অনশন করে সিদ্ধেশ্বরীর মত পরিবর্তন করানোর মধ্যে। এখন যখন ভালবাসাই নেই, তখন জোরও নেই। তাই এখন আর অনশন করার প্রশ্নই ওঠে না। সিদ্ধেশ্বরী এর পরেও শৈলজার প্রতি স্নেহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শৈলজা তাতে সাড়া দিল না। সে সিদ্ধেশ্বরীকে তাঁর চাবি ফিরিযে

দিল। তাতে আহত হয়ে সিদ্ধেশ্বরী তাকে আবার দুর্বাক্য বললেন। তখন শৈলজা এতদিনকার সমস্ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে স্বামীপুত্রের হাত ধরে দেশের বাড়ীতে চলে গেল। যে সিদ্ধেশ্বরী তাকে নিজের হাতে এইটুকুবেলা থেকে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাঁর কয়েকটি রাগের সময়কার কটূক্তি শৈলজা ক্ষমা করল না, তারই জন্য সে তাঁকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেল।

দেশের বাড়ীতে যাবার পর শৈলজার জীবনে এক নতুন পরীক্ষা সুরু হল। কুচক্রী হরিশ নিরীহ রমেশের বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে উত্যক্ত করতে লাগলেন এবং তার শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এত বিপদেও কিন্তু শৈলজা হাল ছেড়ে দিল না, গা থেকে একের পর এক গয়না খুলে দিয়ে সে স্বামীকে মামলার খরচ জোগাতে লাগল। এর থেকে শৈলজার ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত গিরীশ শৈলজার গুণের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার ফলে শৈলজা বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

শৈলজার প্রভূত গুণপনা, প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং আপোষহীন আত্মমর্যাদাবোধ তার চরিত্রকে কতকটা অবাস্তব করে তুলেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি চরিত্রটিকে অবাস্তব হতে দেন নি। কারণ তিনি শৈলজার মধ্যে কেবল গুণ ও দৃঢ়তা নয়, কিছু কিছু দুর্বলতাও দেখিয়েছেন। নিজের স্বামী সম্বন্ধে শৈলজার অপরিসীম দুর্বলতা ছিল। স্বামীর সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় কথা সে শুনতে পারত না, সে কথা যতই সত্য হোক্ না কেন। এ ছাড়া শৈলজার নিজের কর্তৃত্ববোধ এবং সংসারের নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্বন্ধেও দুর্বলতা ছিল। কেউ তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে বা সংসারের নিয়মশৃঙ্খলা সামান্য পরিমাণেও লঙ্ঘন করলে শৈলজা তাকে ক্ষমা করতে পারত না। এইজন্যে অতুলকে সে ক্ষমা করতে পারে নি। তবে অতুলের মার খাওয়ার সময় শৈলজার ভূমিকা খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। মণীন্দ্র যখন শৈলজার চোখের সামনে অতুলকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল, তখন শৈলজা মণীন্দ্রকে নিরস্ত করবার কোন চেষ্টাই করল না। অতুল যতই দুষ্ট হোক্, কোন নারীর পক্ষে, বিশেষতঃ সন্তানের জননীর পক্ষে তার এতখানি নির্যাতন দাঁড়িয়ে থেকে দেখা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

শৈলজার মধ্যে কূটনীতিজ্ঞানেরও অভাব দেখা যায়। সে নয়নতারার সামনেই তার সমালোচনা করত ও তার সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বলত। তার ফলে

নয়নতারা তার শত্রু হয়ে উঠল। শৈলজা যদি একটু সাবধানতা অবলম্বন করত, তাহ'লে নয়নতারা তার কোন ক্ষতি করতে পারত না। কিন্তু শৈলজা সেবিষয়ে কোন চেষ্টাই করে নি। তার স্বভাবই তা নয়।

শৈলজার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত রকমের কাঠিন্য ছিল। এরই জন্য বাড়ীর ছেলেরা তাকে যতটা ভয় করত, ততটা ভালবাসত না। নারীর স্বাভাবিক কোমলতা শৈলজার মধ্যে নেই, এটি তার চরিত্রের একটি বড় ত্রুটি।

'নিষ্কৃতি' সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা দেখলাম যে এই বইটির মধ্যে শরৎচন্দ্র বাঙালীর ঘরোয়া জীবনকে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করেছেন এবং এর মধ্য চরিত্রগুলিকে তিনি রক্ত মাংসে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ছোট উপন্যাসখানি সৃষ্টি হিসাবে অসামান্য হয়ে উঠেছে। তবে এই উপন্যাসের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। এগুলির বেশীর ভাগই অসাবধানতাজনিত ত্রুটি। নীচে এগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, গিরীশের চরিত্র তাঁর পেশার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নি। উকীলরা সাধারণত অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হন। গিরীশ অতবড় উকীল হয়ে কী করে এরকম অন্যমনস্ক, বাস্তবজ্ঞানহীন হতে পারেন, তা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গিরীশ যে শুধু নিজের সংসারের কোন খবর রাখতেন না, তা নয়, তিনি তার মক্কেলদেরও অনেক খবর ভাল করে জানতেন না। বাগবাজারের খাঁ-রা তাঁর মক্কেল, অথচ তারা পাটের দালালি করে, না, খড়ের দালালি করে, তা-ও তার জানা নেই দেখতে পাই। প্রশ্ন উঠতে পারে—তাহ'লে তিনি তাদের মামলা পরিচালনা করতেন কীভাবে? গিরীশকে শরৎচন্দ্র যদি দার্শনিক, অধ্যাপক বা সাহিত্যিক রূপে উপস্থাপিত করতেন, তাহ'লে তাঁর অন্যমনস্কতা মানিয়ে যেত।

দ্বিতীয়ত, সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্র অঙ্কনেও দু' জায়গায় ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। আমরা দেখি, সিদ্ধেশ্বরী বারবার অকপটে গিরীশের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করছেন ও পরিণামে ঠকছেন। সিদ্ধেশ্বরীর নির্বুদ্ধিতার কথা মনে রাখলেও এই ব্যাপার অস্বাভাবিক লাগে। কারণ এতদিন গিরীশের সঙ্গে ঘর করার পর গিরীশকে তাঁর না চেনার কথা নয়। তারপর এক জায়গায় দেখি সিদ্ধেশ্বরী শৈলজার বিরুদ্ধে নয়নতারার কান-ভাঙানি শুনে বলে উঠছেন, "তাহ'লে সে যেন তার ছেলেপুলে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকে। আমি তার সাত-গুষ্ঠিকে

দুধেভাতে খাওয়াবো কি নিজের সর্বনাশ করবার জন্যে? খুড়তুতো ভাই, ভাজ তাদের ছেলেপুলে—এই ত সম্পর্ক? ঢের খাইয়েছি, ঢের পরিয়েছি—আর না; দাসী-চাকরদের মত মুখ-বুজে আমার সংসারে থাকতে পারে, থাক্, না হয় চলে যাক্।" এ কথা সিদ্ধেশ্বরীর মুখে একেবারে বেমানান হয়েছে।

তৃতীয়ত, শৈলজার চরিত্রেও এক জায়গায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। সিদ্ধেশ্বরীকে সিন্দুকের চাবি ফিরিয়ে দেবার সময় সে সিদ্ধেশ্বরীকে বলেছে, "ক'দিন ধরেই ভেবে দেখ্‌ছিলুম দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে—মতিভ্রম হতে কতক্ষণ, কি বল মেজদিদি?" এই "কি বল মেজদিদি?" বলা শৈলজার চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না, কারণ শৈলজা স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, তাছাড়া নয়নতারার সঙ্গে তার তীব্র বিদ্বেষের সম্পর্ক ছিল এবং বইয়ের অন্য কোথাও-ই শৈলজা নয়নতারার সঙ্গে এইভাবে গায়ে পড়ে কথা বলে নি।

এই বইয়ের মধ্যে কতকগুলি ছোটখাট ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রথম পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "শয্যার উপরেই তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল।...যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া বিছানার উপর খেলা করিতেছিল, ইহারা সকলেই মেজকর্তা হরিশের সন্তান।" কিন্তু বইয়ের অবশিষ্ট অংশ থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে হরিশের তিনটি ছেলে—অতুল, বিপিন, ক্ষুদে এবং একটি মেয়ে—খেঁদি। বলা বাহুল্য, বড় ছেলে অতুলের পক্ষে বিছানায় বসে ঐভাবে খেলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং উদ্ধৃত অংশের প্রথম বাক্যে "তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে"র জায়গায় "তিনটি ছেলেমেয়ে" লেখা উচিত ছিল। 'নিষ্কৃতি'র মধ্যে ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গ উল্লেখের সময় শরৎচন্দ্র অনেক স্থানেই এই জাতীয় ছোটখাট ভুল করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখি বিপিন কানাইকে "মেজদা" বলছে, আবার তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখি হরিচরণ "মেজদা" সম্বোধন পাচ্ছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে লেখা রয়েছে যে খেঁদি রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে শুত, কিন্তু নবম পরিচ্ছেদে দেখি নয়নতারা নিজের ঘরের খাটে খেঁদিকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

তারপর, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে এতদিন বাইরে থাকার জন্য নয়নতারার ছেলে অতুল "ছোটখুড়িমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই।"

কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদে দেখি নয়নতারার অন্যান্য ছেলেরা শৈলজাকে ভালভাবেই চেনে এবং গোলমাল করার সময় শৈলজা এসে পড়লে তারা ভয়ে লেপের মধ্যে গিয়ে লুকোয়। প্রশ্ন উঠতে পারে তারা "ছোটখুড়িমা"কে চেনবার অবকাশ পেল কেমন করে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে অতুল অভদ্র আচরণ করার জন্য শৈলজার নির্দেশ অনুযায়ী বাড়ীর কোন ছেলে অতুলের সঙ্গে কথা বলত না। শৈলজা এ সম্বন্ধে নয়নতারার সামনেই সিদ্ধেশ্বরীকে বলেছে, "অমন ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ির কোনও ছেলেকেই মিশতে দিতে পারি নে দিদি"। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তা'হলে কি নয়নতারার অন্যান্য ছেলেরাও শৈলজারই নির্দেশ মান্য করত এবং তারাও অতুলেব সঙ্গে কথা বলত না? কিন্তু এ ব্যাপার সম্ভব বলে মনে হয় না। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখি শৈলজা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে নয়নতারার ছেলেদেরও রোজ রাত্রে তার কাছে শুতে আদেশ দিচ্ছে। কিন্তু নযনতারা যে চরিত্রের মেয়ে, তাতে সে যে শৈলজাকে তাব ছেলেদের উপর কর্তৃত্ব করতে দেবে, এ কথা বিশ্বাস করা যায না।

এই উপন্যাসের দ্বিতীয থেকে পঞ্চম পবিচ্ছেদে অতুল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। শৈলজা বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের অতুলের সঙ্গে মিশতে বারণ করার ফলেই নয়নতারার সঙ্গে শৈলজার বিরোধ চরমে পৌছেছে এবং তারই পরিণামে সংসার ভেঙেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয, পঞ্চম পরিচ্ছেদেব পর অতুল উপন্যাস থেকে বিদায় নিয়েছে। অতুলের সঙ্গে অন্য ছেলেদের কথা না বলাব ব্যাপারটার (যার জন্য নয়নতারাদের জিনিষপত্র বাঁধা হযে গিযেছিল) কী পরিণতি হ'ল, তা আমরা জানতে পারি না। উপন্যাসের অবশিষ্ট অংশে অতুলের নামও কোথাও উল্লিখিত হয় নি। নবম পরিচ্ছেদে দেখি হরিশ সিদ্ধেশ্বরীকে বলছেন, "দেখ্‌লুম আমরা গেলে আমাদের মণি হরি বিপিন ক্ষুদে এক কাঠা জমি জাযগা পাবেই না—দেশের বাড়িতে হয়ত ঢুকতে পর্যন্ত পাবে না।" এখানে হবিশ গিরীশের ছেলে হিসাবে "মণি হরি" এবং তার নিজের ছেলে হিসাবে "বিপিন ক্ষুদে"র নাম বলেছে, কিন্তু অতুলের নাম করে নি, এ বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার! আর একটি বিষয় অদ্ভুত লাগে; মণীন্দ্র অতুলকে নির্মমভাবে মেরেছিল, এজন্যে অতুল, নয়নতারা, হবিশ সকলেই শৈলজাকে দোষ দিয়েছে, মণীন্দ্রের উপরে কেউ-ই দোষারোপ করে নি, এমন কি স্বয়ং অতুলও নয়!

সর্বশেষ পরিচ্ছেদেও দুটি ভুল আমাদের নজরে পড়েছে। এই পরিচ্ছেদে হরিশের আদালত থেকে ফেরার কথা এই ভাবে লেখা হয়েছে, "বাইশে (রমেশের সঙ্গে) মোকদ্দমার দিন, অপরাহ্ন-বেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া হুগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন"। কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে গিরীশ-হরিশ-রমেশের দেশ "হাওড়া জেলার ছোট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ছিল।" তাহ'লে দেশের সম্পত্তি নিয়ে হুগলীর আদালতে মামলা হয় কী করে? তারপর লেখা হয়েছে যে, গিরীশ যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন শৈলজাকে দেশের সম্পত্তি দানপত্র করে দেওয়ার জন্যে "কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকি রাখিল না। ....গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন। শুধু সিদ্ধেশ্বরী একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, ভাল মন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে, তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।" সিদ্ধেশ্বরী যখন গিরীশকে কোন কথা বলেন নি, তখন শরৎচন্দ্র "সকলে" এবং "সবাই" বলতে কাকে বুঝিয়েছেন? নয়নতারা তার লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে ভাশুরকে লাঞ্ছনা করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিল ধরে নিলেও হরিশ এবং নয়নতারা ছাড়া গিরীশকে লাঞ্ছনা করার মত আর কাউকে পাওয়া যায় না। মাত্র দুজন লোক সম্বন্ধে "সকলে" বা "সবাই" লেখা যায় না।

এই সব ত্রুটি 'নিষ্কৃতি'র উৎকর্ষ খর্ব করতে পারে নি। তবে এরকম একটি সুলিখিত উপন্যাসে এই জাতীয় ছোটখাট ত্রুটি না থাকলেই ভাল হ'ত।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' : পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড

স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের প্রতিভার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর মেলে 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস কিনা সে সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এই গ্রন্থের ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সংহতির অভাব দেখা যায়। এই কারণে অনেকে এই বইটিকে উপন্যাসের শ্রেণীতে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, এই বইয়ের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে একই বস্তু নানাভাবে দেখানো হয়েছে ; তা হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে প্রেমের মোহিনী শক্তির লীলা। শ্রীকান্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেন প্রণয়-মহাকাব্যের নতুন নতুন ভাষ্য রচনা করা হয়েছে। 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের এই আভ্যন্তরীণ ঐক্যসূত্রটি তার উপন্যাস পদবাচ্য হবার দাবীকে শক্তিশালী করেছে। যাই হোক্, 'শ্রীকান্ত' যদি উপন্যাস বলে শেষ পর্যন্ত গণ্য নাও হয় তাহ'লেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ সব দেশেই দেখা যায় যে শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকরা উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট ধারাকে লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এমন কিছু সৃষ্টি করেন, যাকে কোনো প্রচলিত সংজ্ঞা দিয়ে ঠিকমত চিহ্নিত করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' ; প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এবং বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এই জাতীয় সৃষ্টি।[১] "উপন্যাস" আখ্যা পাক বা না পাক,—সাহিত্যকীর্তি হিসাবে 'শ্রীকান্ত' অতুলনীয় বলেই স্বীকৃত হবে।

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে'র চারটি পর্ব রচনা করে গিয়েছেন। প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের প্রথম জীবন বর্ণিত হয়েছে। একদিকে মহৎহৃদয় দুঃসাহসী কিশোর

---

১ 'শ্রীকান্ত' যখন প্রথম লেখা হয়, তখন শরৎচন্দ্র তার একটি উপোদ্ঘাত লিখেছিলেন। সেটি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সূচনায় ভীষ্মদেব খোশনবীশের যে ভূমিকা আছে, এই উপোদ্ঘাতটি তারই অনুকরণ। এতে শ্রীকান্তকে কমলাকান্তের মতই আফিংখোর বানানো হয়েছে। 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় শরৎচন্দ্র এই উপোদ্ঘাতটি বর্জন করেছেন। করে তিনি ভালই করেছেন। 'কমলাকান্তে'র সঙ্গে 'শ্রীকান্তে'র কোন মিলই নেই। কমলাকান্ত আফিংখোরের মোহজড়িত দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেছে, কিন্তু শ্রীকান্তের দৃষ্টি সম্পূর্ণ সুস্থ ও মোহমুক্ত।

ইন্দ্রনাথ, অপরদিকে সর্বসংহা, সর্বত্যাগিনী অন্নদা দিদির চরিত্র বাল্যকালেই শ্রীকান্তের মনকে এক ভিন্নতর জগতের দিকে আকৃষ্ট করেছে। বাল্যবয়সেই তার জীবনে রাজলক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজলক্ষ্মী সেদিন হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীকান্তেব পরবর্তী জীবনে আবার সে একদিন দেখা দিল এক অবাঞ্ছিত পরিবেশের মধ্যে। এই সময় থেকেই সুরু হ'ল শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমেব আকর্ষণ-বিকর্ষণ। তার ফলে শ্রীকান্ত একদিন উপলব্ধি করল,—বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়।

'শ্রীকান্তে'র দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে অনেক দূরে ব্রহ্মদেশে গিয়ে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার মধ্যে সে প্রেমের দুর্জয় শক্তির লীলাটিকেই নানাভাবে উপলব্ধি করেছে। শেষ পর্যন্ত সে অভয়ার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হযে রাজলক্ষ্মীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে মনস্থির করে দেশে ফিরেছে। কিন্তু একদিকে রাজলক্ষ্মীর সংস্কার, অপরদিকে শ্রীকান্তেব সম্ভ্রমজ্ঞান এই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে বাধা দিয়েছে। অবশেষে রাজলক্ষ্মী যখন তার সমস্ত সংকোচ বিসর্জন দিযে শ্রীকান্তের রোগশয্যার পাশে এসে উপস্থিত হ'য়েছে, তখন শ্রীকান্তের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছে। তখন সে প্রতিবেশীদের সামনে রাজলক্ষ্মীকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়েছে।

তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর ধর্মনিষ্ঠা বেড়ে উঠে শ্রীকান্তের সঙ্গে আবার তার ব্যবধান রচনা করেছে। গঙ্গামাটিতে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বাস করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকান্ত এই সময়ে তার মনের মধ্যে একটা একটানা ক্লান্ত নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছে। শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী ধর্মের খেলায় মেতে উঠে শ্রীকান্তের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। শ্রীকান্তও কোন অনুযোগ না করে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

চতুর্থ পর্বে পুঁটু নামে একটি বালিকার সঙ্গে শ্রীকান্তের বিবাহের প্রস্তাব হওয়াতে রাজলক্ষ্মী নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং ধর্মচর্চা বিসর্জন দিয়ে সে আবার শ্রীকান্তেব পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীকান্ত তার বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে এবং তারই সূত্র ধরে কমললতা নামে একজন বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীকান্তের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি রাজলক্ষ্মীরই জয় হয়েছে। গহরের মৃত্যু ও কমললতার বিদাযের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি করুণ সুরে এই পর্ব শেষ হয়েছে।

'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বকে আমরা 'শ্রীকান্তে'র পূর্বখণ্ড এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বকে উত্তরখণ্ড বলতে পারি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের তুলনা করলে শেষ দুই পর্বকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। অনেক সমালোচকই এই দুই পর্বকে অপকৃষ্ট বলেছেন। এই মত সত্য বলেই আমাদের মনে হয়। কেন মনে হয়, তার কারণ নীচে প্রদর্শন করছি।

'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে শরৎচন্দ্র ঘটনার পর ঘটনার অবতারণা করেছেন। কিন্তু ঐ দুই পর্বের কোন ঘটনাকেই অবাস্তব বা অসার্থক বলে মনে হয় না। বর্ণনার গুণে সেগুলি প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বেও আমরা বহু ঘটনার সমাবেশ দেখতে পাই। কিন্তু তাদের অনেকগুলিকে অপ্রয়োজনীয় ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চতুর্থ পর্বের কালিদাসবাবু-ঘটিত ব্যাপারটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে তৃতীয় পর্বের ডোমদের বিবাহসভার দৃশ্য ও অগ্রদানী পরিবারের কাহিনী এবং চতুর্থ পর্বের পোড়ো ভিটে ও অসহায় কুকুরের দৃশ্যটি ছাড়া আর কোন বর্ণনাই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে নি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে আমরা বহু চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। তাদের মধ্যে বৃহৎ চরিত্রগুলির তো কথাই নেই, নিতান্ত ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও নিপুণ শিল্পীর হাতের দু'একটি টানের মধ্যদিয়ে উজ্জ্বল, সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের অধিকাংশ চরিত্রকেই সে তুলনায় নিষ্প্রভ বলে মনে হয়। সুনন্দা, বজ্রানন্দ, কমললতা প্রভৃতি চরিত্রকে বহুলাংশে অবাস্তব ও অশরীরী ছায়ার মত লাগে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের রাজলক্ষ্মী বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্র। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে, বিশেষত চতুর্থ পর্বে আমরা যে রাজলক্ষ্মীর দেখা পাই, সে কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্লজ্জ, স্বার্থপর। তার প্রতি আমাদের সহানু-ভূতি জাগ্রত হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে এমন একটা তৃপ্তিদায়ক সাবলীল গতি ও সজীবতা রয়েছে, যা পাঠকের মনকে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে রাখে; শেষ দুই পর্বে যেন তার একান্ত অভাব। প্রথম দুই পর্বে লেখকের প্রশংসনীয় সংযম ও মিতভাষিতার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু শেষ দুই পর্বে তা' রক্ষিত হয়নি, এই দুই পর্বের বর্ণনায় বাগ্‌বিস্তার ও পুনরুক্তিদোষ প্রায়ই চোখে পড়ে। চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তকে বৈঁচিফলের মালা দেওয়ার ব্যাপারটি বার বার এমন সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে যে তার মাধুর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যে উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হতে পেরেছে, তার প্রধান কারণ, এই দুটি পর্বের আগাগোড়াই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে অসামান্য ভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে। যে কোন বিষয়েরই বর্ণনায়—ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তের নৈশ-অভিযান বা আঁধারের রূপ বা সমুদ্রে সাইক্লোনের মত গভীর ভাবের বর্ণনায় কিংবা গৌরী তেওয়ারীর মেয়ে বা প্রবঞ্চিতা বর্মী তরুণীর করুণ কাহিনী বর্ণনায় অথবা নতুনদাদা বা টগর-নন্দমিস্ত্রীর হাস্যরসাত্মক কাহিনী বর্ণনায়—সর্বত্র শরৎচন্দ্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে ভাব ব্যঞ্জিত করেছেন। তাঁর বর্ণনা-রীতি সংক্ষিপ্ত; যেটুকু তিনি বলেছেন, তার পূর্ব-ইতিহাস ও পরবর্তী পরিণাম সম্বন্ধে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব থেকেছেন, কিন্তু এইসব বর্ণনায় তিনি যে সমস্ত ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন, সেইগুলির সূত্র ধরে আমরা যেন না-বলা কথাগুলি মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না বললেই চলে। এই দুই পর্বের অধিকাংশ স্থানেই বর্ণনাগুলির বাচ্যার্থের অতিরিক্ত কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

অবশ্য শেষ দুই পর্বের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনার নিদর্শন যে একেবারেই মেলে না, তা নয়। তৃতীয় পর্বে রতনের মনস্তত্ত্ব যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং যেভাবে শরৎচন্দ্র তাকে ধীরে ধীরে সাধারণ ভৃত্যের পর্যায় থেকে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মাঝখানের সংযোগসেতুর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, তার মধ্যে পরিণত কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতেরও নিদর্শন মেলে। চতুর্থ পর্বের মধ্যেও কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, এই পর্বে কমললতার ট্র্যাজেডিটি খুবই সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। কমললতার ট্র্যাজেডি এই যে সে সারাজীবন একের পর এক পুরুষের মধ্যে তার অবলম্বন খুঁজে ফিরেছে, কিন্তু নিজের প্রকৃতি আর ভাগ্যের জন্যে বারবার তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, কাউকে সে শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করতে পারেনি, কোথাওই সে দাঁড়াবার জায়গা পায়নি। এই ট্র্যাজেডি রচনার মধ্যে শরৎচন্দ্র উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশলের নিদর্শন দিয়েছেন। তারপর, চতুর্থ পর্বের মধ্যে তিনি বৈষ্ণবদের আখড়ার পরিবেশটিকে খুব বিশদভাবে মনোহরমূর্তিতে অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে যে একটা বিরাট ফাঁকি রয়েছে, তা-ও তিনি খুব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, তরুণী বৈষ্ণবী পদ্মা ভোরবেলায় শ্রীকান্ত-কমললতাকে একসঙ্গে বেড়িয়ে ফিরতে দেখে মুখ টিপে হাসে এবং

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা চলার সময় সে "আমি বুঝেছি" বলে হাততালি দিযে ওঠে; বৈষ্ণবের আখড়ায় মানুষ হওয়া এবং বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সে দুটি যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে প্রেম ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এইভাবেই শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব-আখড়ার জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা পরিস্ফুট করে তুলেছেন। কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র তৃতীয ও চতুর্থ পবের মধ্যে এই জাতীয বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন সর্বত্র মেলে না। যে সমস্ত দৃষ্টান্ত-গুলির আমরা উল্লেখ করলাম, সেগুলি এই দুই পর্বের সমগ্র কলেবরের মধ্যে এত অল্প স্থান অধিকার করে আছে যে তাদের এ বিষযে ব্যতিক্রমই বলতে হয। শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যস্রষ্টার কোন রচনাই একেবারে অক্ষম ও অসার হতে পারে না। তার মধ্যে কিছু না কিছু শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ছাপ থাকবেই; স্বর্ণশিল্পীর হাতের ধুলোতেও সোনা থাকে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায, 'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয পর্বের তুলনায তৃতীয ও চতুর্থ পর্বে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মধ্য দিযে ভাবব্যঞ্জনার নিদশন অনেক কম মেলে। এইজন্যে এই দুটি পবকে প্রথম-দ্বিতীয পর্বের তুলনায নিকৃষ্ট না বলে উপায নেই।

কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র শেষ দুই পবের এই অপকর্ষ সম্বন্ধে সমস্ত সমালোচক একমত নন।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে 'শ্রীকান্তে'র তৃতীয পর্বকে মোটেই নিকৃষ্ট বলা যায না।[২] শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায[৩], ৺মোহিতলাল মজুমদার[৪], অধ্যাপক

---

২ দ্রঃ 'শরৎচন্দ্র' (৮ম সং পৃঃ ১৭৭-১৭৫)। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, '(শ্রীকান্তের) তৃতীয পর্ব প্রথম পর্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, ইহা ভিন্ন জাতীয রচনা।' সুবোধচন্দ্র কিন্তু চতুর্থ পবকে নিকৃষ্ট বলেছেন।

৩ দ্রঃ 'রঙের পরশ' (পরিশিষ্ট)। শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পব সম্বন্ধে দিলীপকুমারের আলোচনা পড়ে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হযেছিলেন। তিনি দিলীপকুমারকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হযেছি বলতে পারি নে—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন করে মন দিযে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকদের ভালো লাগার জন্যেই।' (শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায সম্পাদিত পৃঃ ১২৮)

৪ দ্রঃ 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' (পৃঃ ১৯৫ ১৯৬, পৃঃ ২৫৩)। মোহিতলাল লিখেছেন 'বস্তুত, শ্রীকান্তে'র এই চতুর্থ পর্বে শরৎচন্দ্র একাধারে উৎকৃষ্ট লিরিক কবি ও ঔপন্যাসিকরূপে এক অনন্যসাধারণ গৌরবের অধিকারী হইযাছেন।"

বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী[৫] এবং অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী[৬] 'শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পর্বকে উচ্চস্তরের সৃষ্টি বলে মনে করেন। এদের মধ্যে মোহিতলালের অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমতের পরে 'শ্রীকান্তে'র শেষ দুই পর্বের অপকর্ষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা খুব নিরাপদ নয়। তবে আমাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী আমাদের মনে হয়, 'শ্রীকান্তে'র শেষ দুই পর্বের স্থান প্রথম দুই পর্বের অনেক নীচে। আমাদের এই ধারণার কারণ আমরা উপরে ব্যাখ্যা করেছি।

'শ্রীকান্তে'র শেষ দুই পর্ব রচনা অপরিহার্য ছিল কিনা সে প্রশ্নের বিচারও এখানে করা যেতে পারে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেম নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এসে দ্বিতীয় পর্বের শেষে যে পরিণতি লাভ করেছে সেইখানেই এই কাহিনীর যবনিকাপাত না করে আরো দুটি পর্ব রচনার পিছনে শরৎচন্দ্রের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বলে মনে হয়। তা হচ্ছে এই প্রেমের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশদ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করে তোলা।

শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর প্রেম যে শুধু আন্তরিক তা'ই নয়, এই প্রেমের জন্য সে প্রয়োজন হলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত নয়, সে সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের একটা আপস করে চলতে চায়। রাজলক্ষ্মীর ভালবাসার মধ্যে স্বার্থপরতার ভাবও আছে। শ্রীকান্ত তার কাছেই থাকুক, আর দূরেই থাকুক, শ্রীকান্তকে সে অপরের হাতে তুলে দিতে পারবে না। দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখি যে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের বিবাহে আপত্তি জানিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্তের কাছে সে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে যে শ্রীকান্ত সারাজীবন অবিবাহিত থাকবে শুধু তারই জন্য।[৭]

---

৫ দ্রঃ ঢাকা জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত 'বাসন্তিকা' পত্রিকা (একবিংশ বার্ষিকী সংখ্যা) এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধ 'রাজলক্ষ্মী ও কমললতা' (বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা)।

৬ অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। অধ্যাপক চৌধুরী উপন্যাস ও নাটক সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। শরৎসাহিত্যেরও তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে আমার তার কাছে শরৎসাহিত্য পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিশ্বপতিবাবু লিখেছেন খুবই অল্প এবং শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি আমাদের পক্ষে এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

৭ দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম অধ্যায় (সপ্তদশ মুদ্রণ, পৃ: ২৩-২৬ দ্রঃ)।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে আমরা রাজলক্ষ্মীর প্রেমের এই বৈশিষ্ট্যগুলির সূক্ষ্ম আভাসমাত্র পাই। পরের পর্ব দুটিতে লেখক বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রেমের সঙ্গে সংস্কারের আপস করতে না পেরে সংস্কারের কাছে সাময়িক আত্মসমর্পণ দেখানো হয়েছে। চতুর্থ পর্বে পুঁটুর সঙ্গে শ্রীকান্তের বিবাহ-প্রস্তাবে রাজলক্ষ্মীর মুখর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের স্বার্থপরতার দিকটা অনাবৃতভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। কমললতার আবির্ভাবও রাজলক্ষ্মী-চরিত্রের এই অন্ধকার দিকটা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কমললতার প্রেম রাজলক্ষ্মীর প্রেমের ঠিক বিপরীত। কমললতার প্রেম আন্তরিক, কিন্তু স্বার্থ-লেশহীন। এ প্রেম প্রেমাস্পদকে নিজের করে ধরে রাখতে চায় না। তাকে হাসিমুখে অপরের হাতে তুলে দেয়। কমললতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া রাজলক্ষ্মীর প্রেমের স্বার্থপরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুতরাং 'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে শরৎচন্দ্র যে মূল বিষয়বস্তুকে রূপায়িত করেছেন, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে তিনি তাকেই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যেন সূত্র, আর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব তার ভাষ্য। এই ভাষ্য রচনা না করলেও কোন ক্ষতি হত না। শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত অবলম্বনে আমরা নিজেদের মনের মধ্যেই তাকে তৈরী করে নিতে পারতাম। এক কথায় বলতে গেলে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে'র শেষ দুই পর্ব রচনা করাতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি।

সূত্রের তুলনায় ভাষ্য আয়তনে বৃহৎ হয়। কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব আয়তনে প্রায় সমান সমান। আসলে ভাষ্যটির রচনা সম্পূর্ণ হয়নি। 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, তা মোহিতলাল মজুমদার লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বইয়ে লিখেছিলেন যে আর একটি পর্ব লিখলে শ্রীকান্ত সম্পূর্ণ হত।[৮] তিনি

৮ "এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, আর কেহ বলিয়াছেন কিনা জানি না—তাহা এই যে, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত'-কথা শেষ করেন নাই। এ কাহিনীতে রাজলক্ষ্মীর কথাটা সমাপ্ত হয় নাই—হওয়া খুব আবশ্যক ছিল।......আর একটা পর্বেই তাহা হইবার কথা"। ('শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', বুকল্যাণ্ড সংস্করণ, পৃঃ ১১১-১১৫)

মোহিতলাল অনুমান করেছেন 'শ্রীকান্তে'র পঞ্চম পর্ব লিখলে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু দিয়ে তার উপসংহার করতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠিতে লিখেছেন পঞ্চম পর্বে অভয়ার কথা থাকবে।

বোধহয় জানতেন না যে শরৎচন্দ্রের মনে আর একটি পর্ব লেখার পরিকল্পনাই ছিল। সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখি দিলীপ-কুমার রায়কে লেখা এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র বলছেন, "পঞ্চম পর্ব 'শ্রীকান্ত, লিখে শেষ করে দেবো—অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে।"[৯] এখানে লক্ষ্য করতে হবে, শরৎচন্দ্র বলেছেন—"পঞ্চম পর্ব 'শ্রীকান্ত' লিখে শেষ করে দেবো"। চতুর্থ পর্বে 'শ্রীকান্ত' যে সম্পূর্ণ হয়নি, সে কথা শরৎচন্দ্র এই উক্তির মধ্য দিয়ে স্বীকার করেছেন। শরৎচন্দ্র যদি 'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বই রচনা করতেন, তাহলে শ্রীকান্ত' স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ হ'ত। কিন্তু আরো দুটি পর্ব লেখার ফলে 'শ্রীকান্ত' অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের তুলনায় তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব নিকৃষ্ট কিনা সে সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকলেও শেষ দুটি পর্ব যে স্বতন্ত্র ধরনের সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে কোনো মতপার্থক্য নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে ঘটনা-প্রবাহের অবিরাম বর্ণনার মধ্যে যে সুস্থ প্রাণবন্ততার পরিচয় মেলে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে তা পাওয়া যায় না। তৃতীয় পর্বে চিন্তাশীলতার প্রভাব অত্যন্ত বেশী, তাই এই পর্বটি বর্ণবিরল হয়ে পড়েছে। চতুর্থ পর্বটি যেন গীতিকবিতার সুরে বাঁধা। এর কাহিনীতে বিকাশ নেই, অগ্রগতি নেই, পরিণতি নেই—একটা কোমল সুকুমার সুর আগাগোড়া একইভাবে সমগ্র পর্বটির মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়েছে।[১০] প্রথম-দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে তৃতীয়-চতুর্থ পর্বের এই প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকার জন্য তাদের জনপ্রিয়তা বিভিন্ন রকমের হয়েছে। প্রথম-দ্বিতীয় পর্ব সর্বশ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকের কাছে সমাদর ও প্রশংসা লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বিদ্বিষ্ট সমালোচক বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত 'শ্রীকান্তে'র প্রথম ও

---

৯ এর ঠিক পরেই শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব ভালো হয়নি তবে থাকলো এইখানেই রথ।" ('শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১২৪)

'শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পর্ব জনপ্রিয় না হওয়ার ফলেই সম্ভবত শরৎচন্দ্র পঞ্চম পর্ব লেখার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন।

১০ মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "কমললতার কাহিনীতে নাটকীয় ঘটনার ধারা—উত্থান-পতনের অবস্থান্তর বা চরিত্রের ক্রমবিকাশ নাই। এ কাহিনী নাটক নয়—নাটকীয় গীতি-কাব্যও নয়, একেবারে খাঁটি লিরিক, সেই বৈষ্ণব কবিদের গান।" ('শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', বুকল্যাণ্ড সংস্করণ, পৃঃ ২১৪ দ্রঃ।)

দ্বিতীয় পর্বকে “flawless” রচনা বলেছেন।[১১] কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ পর্ব অনেকের ভালো লেগেছে, আবার অনেকের লাগেনি।

‘শ্রীকান্তে’র পূর্বখণ্ডের সঙ্গে উত্তরখণ্ডের এই গুরুতর প্রভেদের কারণ কী? প্রথম কারণ শরৎচন্দ্রের স্রষ্টা-মানসের রূপ পরিবর্তন। শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে তরল হৃদযোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। দেবদাস, বড়দিদি প্রভৃতি এই পর্বের রচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি এই পর্বের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে মানব মনের জটিল রহস্য এবং আমাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ‘শ্রীকান্তে’র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব এবং গৃহদাহ, চরিত্রহীন প্রভৃতি উপন্যাস এই পর্যায়ের রচনা। চতুর্থ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র কাহিনী-বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণকে প্রাধান্য না দিয়ে তত্ত্বান্বেষণ ও তর্ক-বিতর্কের দিকে ঝুঁকেছেন। ‘শেষ প্রশ্ন’, ‘নববিধান’, ‘শেষের পরিচয়’ প্রভৃতি উপন্যাস এই পর্যায়ের রচনা। ‘শ্রীকান্তে’র তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বও এই পর্যায়ের রচনা, তাই প্রথম দুই পর্বের তুলনায় তারা ভিন্ন গোত্রের সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের পিছনে আর একটি কারণ আছে। প্রথম দুই পর্ব রচনার সময়ে শরৎচন্দ্র লেখক হিসাবে আদৌ প্রতিষ্ঠালাভ করেন নি। তার ফলে এই দুই পর্ব অসচেতন স্রষ্টার হাতের সহজ স্বচ্ছন্দ সৃষ্টি হতে পেরেছে। ‘শ্রীকান্তে’র প্রথমাংশ রচনা করে ‘ভারতবর্ষে’ পাঠাবার সময় শরৎচন্দ্রের মনে বইটি ‘ভারতবর্ষে’ প্রকাশিত হবার যোগ্য কিনা সে সম্বন্ধেই সংশয় ছিল[১২]। কিন্তু শেষ দুই পর্ব রচনার সময় শরৎচন্দ্রের এই সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বাংলার অদ্বিতীয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন; ‘শ্রীকান্তে’র প্রথম ও

১১ An Acre of Green Grass, 1948, p 34 দ্রঃ।

১২ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র এই সময়ে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, “ ‘শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী’ যে সত্যই ‘ভারতবর্ষে’ ছাপিবার যোগ্য, আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম।” (‘শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৪৪)

দ্বিতীয় পর্বও ইতিমধ্যে পাঠক ও সমালোচকদের কাছে অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করেছে। নিজের ও 'শ্রীকান্তে'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এই সচেতনতা 'শ্রীকান্তে'র শেষ দুই পর্ব রচনার সময় লেখকের লেখনীকে প্রভাবিত করেছে ; তার ফলেও এই দুই পর্ব স্বতন্ত্র ধরনের সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'শ্রীকান্তে'র প্রথম দুই পর্বের কাহিনীর মূল ভিত্তি বাস্তব ঘটনা। কিন্তু শেষ দুই পর্বের কাহিনী আগন্ত কাল্পনিক বলে মনে হয়। তারও ফলে এই দুই পর প্রথম দুই পর্বের সমজাতীয় রচনা হতে পারে নি।

মোটের উপর 'শ্রীকান্তে'র শেষ দুই পর প্রথম দুই পর্বের তুলনায় নিকৃষ্ট কিনা সে সম্বন্ধে তর্কস্থলে সংশয় থাকলেও এই দুই পর যে কতকটা অপ্রয়োজনীয় রচনা হয়েছে এবং এরা যে প্রথম দুই পর্বের তুলনায় স্বতন্ত্রজাতীয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে ভিন্ন মতের অবকাশ নেই। তার ফলে সমগ্র গ্রন্থটির স্বচ্ছন্দতা ও ঐক্য অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে সন্দেহ নেই।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাঙালী কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি যে প্রথম শ্রেণীর কবি, সে সম্বন্ধে সমস্ত সমালোচকই একমত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাভঙ্গীর অভিনবত্বই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলে সমালোচকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব কোথায়, সে-সম্বন্ধে সমালোচকেরা বলেন, প্রথমত যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী কবি; দ্বিতীয়ত তিনি যখনই তাঁর কবিতায় কোন বিষয়কে রূপায়িত করেছেন, তখনই সে সম্বন্ধে প্রচলিত মতের পুনরাবৃত্তি না করে তাকে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখেছেন। কবির রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে এঁরা বলেন, তিনি সুললিত ও মসৃণ ভাষাকে পরিহার করে কর্কশ ও শুষ্ক শব্দরাজির সমাবেশে গঠিত এক নতুন বলিষ্ঠ ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করেছেন, এই ভাষার শক্তি ও দীপ্তি অসামান্য।

যতীন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত কবিতাই পূর্বোক্ত সমালোচকদের অভিমতকে সমর্থন করে। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা 'ঘুমের ঘোরে', 'দুঃখবাদী' প্রভৃতি কবিতায় এবং শেষ জীবনে লেখা 'কবি নহি' কবিতায় যতীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন যে তিনি দুঃখবাদী। তাঁর 'শিবস্তোত্র', 'গঙ্গাস্তোত্র', 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ,' 'শর-শয্যায় ভীষ্ম', 'মর্ত্য হইতে বিদায়', 'বিভীষণ' প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীন বিষয়গুলির অভিনব ব্যাখ্যা দেবার এবং ঐ সব বিষয়ের যুগযুগ-প্রচারিত গরিমা-কীর্তনের পুনরাবৃত্তি না করে তাদের মধ্যে করুণ ব্যর্থতা আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা যায়। তাঁর ভাষার কর্কশতা, শুষ্কতা ও বলিষ্ঠতার নিদর্শনও এইসব কবিতা থেকেই মেলে।

শুধু তাই নয়, যতীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেও এই সব সমালোচকদেব মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 'যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন (১০ই অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখের 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত), তাতে তিনি যতীন্দ্রনাথের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন; তাদের কয়েকটি আমরা নীচে পুনরুদ্ধৃত করছি।

"যদি পুরাতন বিষয় নিয়েই লিখতে হয়, তা'হলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে

দেখে বিভিন্ন উৎসপথে রস আদায় করতে হবে। গঙ্গা নিয়ে আমিও লিখেছি, কিন্তু আমার গঙ্গা চিরক্রন্দনময়ী।······

"বর্তমান যুগের উপযোগী নতুন ব্যাখ্যা দিতে না পারলে পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে না লেখাই ভালো। ···

"তোমরা আমাকে দুঃখবাদী কবি বানিয়েছ—তাতে দুঃখিত নই, গৌরবই অনুভব করি।"

পূর্বোক্ত সমালোচকেরা যতীন্দ্রনাথের কাব্যের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন, সেগুলি যতীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতায় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, একথা সত্য। কিন্তু এই সব বৈশিষ্ট্য যতীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, এ কথা মানতে আমি রাজী নই। আমার মতে যে কবিতাগুলির মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বা প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা নয়। ঐ কবিতাগুলি এক সময় বক্তব্য ও ভাষার অভিনবত্বের জন্য সকলের মনে চমক লাগিয়েছিল, কিন্তু আজ সেই সাময়িক উত্তেজনার অবসান ঘটেছে। এখন স্থিরভাবে বিবেচনা করবার সময় এসেছে এই কবিতাগুলি রচনা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর কিনা। আমার মনে হয়, এগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনা নয়। কারণ এদের মধ্যে যে সব অভিনব বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে সেগুলি কবির অন্তর থেকে আসেনি এবং সহজ স্বচ্ছন্দভাবে ভাষায়িত হয়নি বলে মনে হয়। এই কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, এদের মধ্যে সযত্ন চিন্তার দ্বারা লব্ধ কতকগুলি ভাবকে ছন্দ ও মিলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, সে প্রকাশের মধ্যে যেন একটা কৃত্রিমতা অনুভব করা যায়; তাছাড়া এদের মধ্যে কবি যেভাবে বর্ণিতব্য বিষয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের বদলে কুশ্রীতা, আনন্দের বদলে বেদনা, গরিমার বদলে গ্লানি আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে একদেশদর্শিতা-দোষ প্রকট হয়ে উঠেছে।* এদের ভাষায় ইচ্ছাকৃতভাবে কর্কশ ও অমার্জিত শব্দের প্রয়োগ আগে যতটা মনে চমক জাগাত, এখন আর ততটা জাগায় না, তার বদলে মনে হয়, এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগের ফলে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ স্থানে স্থানে ব্যাহত হয়েছে।

* আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কবির তথাকথিত দুঃখবাদ তাঁর অন্তরের গভীর প্রত্যয় থেকে সঞ্জাত নয়; এটি একটি কৃত্রিম pose মাত্র; কবিতাকে অভিনব ও চমকপ্রদ করবার জন্য কবি এই pose-এর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তা আমি স্বীকার করি। এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব যে প্রধানত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের জন্যই, তাতেও আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচকেরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে ধরনের অভিনবত্ব আবিষ্কার করেছেন, আমার মতে সেই ধরনের অভিনবত্বের জন্য যতীন্দ্রনাথের কবিতা উৎকর্ষ লাভ করেনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাদের মধ্যে জীবনের সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করেছেন। বিষয়টি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার।

কবিরা সকলেই সৌন্দর্যের পূজারী। কিন্তু সাধারণত তাঁরা পৃথিবীর এবং জীবনের নিজস্ব রূপ থেকে কুৎসিত অংশটুকু বর্জন করে কেবল সুন্দর অংশটুকুকে নিজেদের কাব্যের মধ্যে রূপায়িত করে তোলেন। ফলে, সেই রূপায়ণের মধ্যে সৌন্দর্য থাকলেও স্বাভাবিকতা বা সামগ্রিকতা থাকে না। যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন সৃষ্টি করেছেন, তিনি নানা বিসদৃশ ধাতুকে বিষম অনুপাতে মিশিয়েছেন। তাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য আর কুৎসিত দুইই আছে। যতীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যে দেখা যায়, তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন, তাই অন্যান্য কবির মত তিনি জীবনের কুৎসিত অংশ থেকে সুন্দর অংশকে ছেঁকে বার করে নেননি, জীবনকে সমগ্রভাবে সুন্দর-কুৎসিত মিলিয়েই গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে 'কেতকী' কবিতাটি অন্যতম। এই কবিতাটির দুটি চরণ যেন কবির উপলব্ধিরই রূপক। চরণ দুটি এই,

বৌবাজারের মোড়ে—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কশাইএ মাংস থোড়ে

এই হচ্ছে জীবনের সত্যকার রূপ। এখানে ফুলেব দোকান আর মাংসের দোকান পাশাপাশি। এই রূপ যতীন্দ্রনাথ যে-সব কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, সেগুলি অনন্যসাধারণ। ঐ কবিতাগুলিতে কবি জীবনের সৌন্দর্যকেই সার বলে আঁকড়ে ধরে না থেকে তার কুৎসিত দিকটার উপরেও আলোক-সম্পাত করেছেন, সেইরকম আবার কুৎসিতকে বড করবার অতি আগ্রহে সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেননি। ঐ কবিতাগুলির মধ্যে কাব্যসৌন্দর্যও মূর্ত হয়েছে। কবিতায় সুন্দর-কুৎসিত যারই রূপায়ণ হোক্ না কেন, কবিতাকে সুন্দর হতেই হবে; এই মূল সত্যটি যতীন্দ্রনাথ অনেক প্রসিদ্ধ কবিতা লেখার সময় মনে রাখেননি, কিন্তু এই কবিতাগুলি লেখবার সময়ে রেখেছেন। এদের ভাষাও

কবিতারই উপযুক্ত ভাষা ; কর্কশ শব্দ এদের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কবি যত্ন ও কুশলতার সঙ্গে এদের ভাষাকে শিল্পগুণসমৃদ্ধ করেছেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'কেতকী' কবিতাটির আর দুটি চরণ উদ্ধৃত করছি,

শয়নঘরের হুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।

প্রথম চরণের 'হুক' শব্দটি সংস্কৃতও নয়, শ্রুতিমধুরও নয়। কিন্তু দ্বিতীয় চরণের 'সুখে'র সঙ্গে 'হুকে'র যে অপ্রত্যাশিত মিল রচিত হয়েছে, তা কবিতা-টির ভাষার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই শ্রেণীর কবিতা যতীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থেই কয়েকটি করে পাওয়া যায়। সংখ্যায় এগুলি স্বতই খুব বেশী নয় ; কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কোন কবিই ভূরি ভূরি প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করতে পারেন না। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির সৌন্দর্যের কিছু পরিচয় আমরা এখানে দেবার চেষ্টা করব।

প্রথমে আমরা 'পাষাণ-পথে' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। সৌন্দর্যের নেশায় মেতে মানুষ যুগে যুগে কত অবিচার, কত শোষণ করে এসেছে, তার পরিচয় কবি এই কবিতায় পাষাণ-পথের বকুল গাছের রূপকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতাটিব শেষে কবির সত্যোপলব্ধি জ্বলন্ত ও স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে,

পাষাণ-পথের বকুল-গন্ধে সহসা লাগিল হাঁফ,—
বুঝিনু,—এ চির-প্রবঞ্চিতের মর্মের অভিশাপ !
ফুলের গন্ধ নাই নাই ভাই,—কোমলের ব্যথা যত
কঠিনের বুকে বিফল ঘা দি'লে লাগে গন্ধেরি মতো !

কিন্তু কবিতাটির মধ্যে কবি সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেননি, বরং তাকে অত্যন্ত রমণীয় ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই ক'টি ছত্র উদ্ধৃত করতে পারি,

শ্যামল বনের অমল স্মৃতি কি ফুলে ফুলে আজও ফুটে ?
নবতৃণ তরে যে চুম্ব ঝরে,—তপ্ত পাথরে লুটে !

মনে নাই তার বনের বর্ষা, শোনেনি সে কুহুতান,
দলে দলে কাক ডালে ডালে বসি করে তারে অপমান।
আকাশের চাঁদ কখন উঠিয়া কখন যে ফিরে ঘর,—
পাষাণ-কারায় ফাঁক নাহি পায় বুলাইতে স্নেহকর।
ঈশানের মেঘ বিষাণ বাজায়, পূবে মেঘে বারি ঝরে,—
জন-শ্মশানের পাষাণ-সোপানে বকুল ঝুরিয়া মরে।

'কচি ডাব' কবিতাটিও একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই কবিতায় কবি দুঃখের অন্তরালে সুন্দরের যে মনোহর মূর্তি বিরাজ করছে, তাকেই অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাই তিনি বুড়ো ডাবওয়ালার উদ্দেশে বলেছেন,

দারুণ শীতের সাঁঝ হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগরমন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ।
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে।
...
সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।
কৃষ্ণা চতুর্দশী-শেষে তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা।
তোমার মাথার ভার, ধরেছি যে একবার,
তাহে মোর মিটিযাছে সাধ।
দিয়েছি তামার চাকি,— সে মোর হযনি ফাঁকি,
সোনায ঘটিত অপবাধ।

'এসিয়ার আশা' কবিতাটির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাষা, ভাব এবং চিত্রসম্পদ,—সব দিক দিয়েই কবিতাটি অতুলনীয়। কবি এই কবিতাটিব মধ্যে এসিযার প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নস্তূপেব উপর দিয়ে শকুনদের উড়ে চলার অপূর্ব ব্যঞ্জনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলতে চান, শকুনদের এই যাত্রা শুধু এক প্রাচীন সভ্যতারই মৃত্যু ঘোষণা করছে না, যে বঞ্চনা ও

বেদনার উপর এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তারও অবসান সূচনা করছে। কবি তাই লিখেছেন,

সাত সাগরের তলে তলে যত
বেদনা গুমরি' মরে—
সে ব্যথা কি আজ হাল্‌কা হয়েছে
ওদের পক্ষভরে?
শত শৈলের পাঁজরে পাঁজরে
পুঞ্জিত ব্যথাভার—
সহসা আকাশে ছাড়া পেয়ে হাসে?
মুক্তির হাহাকার?

কিন্তু বক্তব্যই এই কবিতাটির একমাত্র আকর্ষণ নয়। এর মধ্যে কবির সৌন্দর্যোপলব্ধি ও সৌন্দযবর্ণনাশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যিই অসামান্য। এর নিদশনস্বরূপ আমরা শকুনদের যাত্রাপথ-বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি,

মেরু-অরোরার ঝর্ণাঝারায়—
করিযাছে উষাস্নান,
কুরুবর্তের আকাশ ভাসায়ে
অবিরাম অভিযান।
বারেক গৌরীশঙ্কর-চূড়ে
চিরতুষারের বুকে,
রেখে এলো ক্ষণচরণচিহ্ন
বিশ্রাম-কৌতুকে।
বারেক শুনিল, বাঁকা চঞ্চুতে
ঘসি' চঞ্চল পাখা,—
দেওদারতলে সুবগঙ্গার
কুলু কুলু পিছুডাকা।
মানস-সরসে মরালমিথুন
দেখাল মৃণাল তুলে,
শ্যাম-উপকূলে নারিকেল-শ্রেণী
ডাক দিল দুলে' দুলে'।

পারসী-গোলাপে গাহে বুলবুল
কাস্পিয়ানের পারে,
দূর ককেশাস ইশারা জানায়—
পাইনে ও পপ্‌লারে।

এই অংশটিতে প্রধানত কয়েকটি স্থানের উল্লেখের মধ্য দিয়ে কবি যে উজ্জ্বল নয়নাভিরাম চিত্র-পরম্পরা রচনা করেছেন, তার তুলনা বিরল। আমার মনে হয়, যতীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে এই কবিতাটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

জীবনের ক্ষেত্রে যেমন যতীন্দ্রনাথ তার সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করেছেন, অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন; যে সব বিষয়ের একটি বিশেষ দিককেই সকলে চিরদিন গুরুত্বদান করে এসেছে, যতীন্দ্রনাথ তাদের অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁর 'শিবের গাজন' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। আধুনিক বাঙালী কবিরা শিবের মহান সুন্দর নটরাজ মূর্তিটিকেই বিশেষভাবে তাঁদের কবিতায় রূপায়িত করেছেন। কিন্তু এ শিব পুরাণের শিব, কালিদাসের কাব্যের শিব। বাংলাদেশে এই পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনার সঙ্গে লৌকিক ঐতিহ্য মিশে শিবকে পাগল, ভিখারী, নেশাখোর বানিয়েছে। যতীন্দ্রনাথ 'শিবের গাজন' কবিতায় শিবের যে ছবি এঁকেছেন, তার মধ্যে তিনি বাংলার শিবের পরিপূর্ণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন; লৌকিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন করেছেন। শিবের লৌকিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন পাই কবিতাটির প্রথম স্তবকে,

পাগলা শিবের বছুরে গাজনে
বেজেছে ঢাক!
কাল হবে দেনা-পাওনার কথা
আজকে থাক্।
আগুন জ্বালিয়ে সন্ন্যাসী সবে
ওই 'ফুল' খেলে ব্যোম্ ব্যোম্ রবে;
পিঠমোড়া-বাঁধা খায় ওরা বুঝি
চড়ক পাক!
থেকে থেকে থেকে বাজে ঝোঁকে ঝোঁকে
গাজুনে ঢাক।

আবার, কবিতাটির শেষ দিকে দেখি শিবের পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুস্মৃতি,

নাচে শিব, নাচে সুন্দর, নাচে
রুদ্র কাল!
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী, গলে
অস্থিমাল!
সাথে নেচে ফিরে আদি ও অন্ত,
ঘোরে দিক ওরে ঘোরে দিগন্ত,
সুখে দুখে ঠু'ক ঘুরপাকে বাজে
রুদ্রতাল।
উছলে গঙ্গা, হাসে শশী, দোলে
অস্থিমাল।

এর পরের স্তবক অর্থাৎ সর্বশেষ স্তবকে আবার দেখি লৌকিক ঐতিহ্যের প্রভাব,

জড়জীব তাঁর ঢেকে ঘুরিয়া
হল 'বেভুল';
তথাপি পড়ে না পাগল শিবের
মাথার ফুল!
বল্ সন্ন্যাসী মুখ ফুটে বল্
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল?
রক্তনয়ন ডুবিছে তপন
না পেয়ে কূল,
দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের
মাথার ফুল॥

কবিতাটি এক কথায় অপূর্ব। যতীন্দ্রনাথ যে শুধু কুৎসিতকে নয়, সুন্দরকেও তাঁর কাব্যে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে জানতেন, এই কবিতা থেকে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে।

আর একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেটির নাম 'প্রত্যাবর্তন'। এই কবিতায় কবি যৌবনের প্রশস্তি রচনা করেছেন। যৌবন কবিদের কাছে মদনমহোৎসবের লগ্নক্ষণ হিসাবেই প্রশস্তি লাভ করে। যৌবনের যে অন্যান্য

দিক আছে এবং তারও মধ্যে যে অপরিসীম সৌন্দর্য আছে, এই সত্যের উপলব্ধি তাঁদের কাব্যে সাধারণত দেখা যায় না। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু এই কবিতায় যৌবনের অন্যান্য দিকগুলির কথা বলে তার সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। যৌবন যে শুধু নবীনের কাছেই আকর্ষণীয় তা নয়, প্রবীণের কাছেও তা অপূর্ব মধুর মূর্তি নিয়ে দেখা দিতে পারে। আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে কবি যৌবনের বিচিত্র লীলা উপলব্ধি করেছেন, যে লীলায় তাঁর নিজের মেয়ে চলে গিয়েছে পরের ঘরে, আবার পরের মেয়ে এসেছে নিজের ঘরে। যৌবন তরুণের মনে মাদকতার সঞ্চার করে, তাকে পুষ্পশরে বিদ্ধ করে, কিন্তু প্রবীণ কবির অন্তরকে তা স্নেহে উদ্‌বেল করে তুলছে; তাই তিনি বলছেন,

খেয়ালীর সেরা ওরে ক্ষ্যাপা ছেলে
ফুলের ধনুটা কোথা এলি ফেলে ?
খালি তূণে আজি করেছিস সাজি
ভরিয়া ভোরের শেফালি,
সেবার আমারে দিয়ে গেলি ফাঁকি,
এবার হয়েছে অনুশোচনা কি ?
বুঝেছিস্ তো রে না হেরিলে তোরে
কেন এ জীবন বিফলই ?

এই কবিতায় কবি যৌবনের শক্তির কথাও বলেছেন এবং তাকে আশীর্বাদ করেছেন,

অমেয় হউক তোর পরমায়ু
অজেয় হউক ও-যুগল বাহু,
কুলিশকুসুম সম দুর্দম
হোক অন্তরখানি,
হে বীর কুমার, হে কল্যাণীয়,
স্বর্গ জিনিয়া মর্ত্যে আনিও,
তোমারি বিজয়-শঙ্খে ধ্বনিও,
কবির আশীর্বাণী।

এখানে কবির "দুঃখবাদ"-এর বিন্দুবাষ্পও আমরা দেখতে পাই না। এক সুস্থ সুন্দর বলিষ্ঠ প্রার্থনা এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে।

এইজাতীয় শ্রেষ্ঠ কবিতার নিদর্শন যতীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আরও পাওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্যবোধে আমরা আর দৃষ্টান্ত দেব না। যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম সম্বন্ধে সমালোচকমহলে যে ধারণা প্রচলিত আছে এবং স্বয়ং কবি যার সমর্থন করেছেন, তা যে তাঁর প্রতিভার সত্যকার পরিচয় নয়, এই কথাটিই আমরা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহযোগে এই প্রবন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। যে কবিতাগুলির ভিত্তিতে ঐ ধারণা গড়ে উঠেছিল, সেগুলি অভিনবত্বের আকর্ষণে এক সময় সকলের মনে নেশা ধরিয়েছিল। সে নেশা এখন প্রায় কেটে গিয়েছে। যেটুকু আছে, তাও বেশীদিন থাকবে না। কিন্তু যে কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর নিজস্ব কবিদৃষ্টির পরিচয় আছে এবং যেগুলি কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেছে, তাদের আকর্ষণ চিরদিন অটুট থাকবে।

তারাশঙ্করের 'কবি'

আগেকার দিনের বাংলা গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত হত প্রধানত সমাজের উচ্চস্তরের নরনারীদের কাহিনী। কিন্তু এখন তার মধ্যে সমাজের সর্বস্তরের অধিবাসীদের কথা স্থান পাচ্ছে। যাদের অন্ত্যজ বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, যাদের জীবনযাত্রাকে সকলে বৈচিত্র্যহীন ভেবে উপেক্ষা করে আসছিল, তাদের কাহিনীর ভিতরেও যে রসের একটা গভীর উৎস লুকিয়ে রয়েছে, তা আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিকদের চোখে ধরা পড়েছে। তাই আজ তাঁরা তাঁদের রচনায় এই সব উপেক্ষিত অবহেলিত নরনারীদের জীবনের কথা শোনাচ্ছেন। এদিক দিয়ে আমরা বলতে পারি, বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে একটা বিস্তার সাধিত হয়েছে।

বিস্তার সাধিত হয়েছে আর এক দিক দিয়েও। আগেকার কালের বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমি ছিল প্রধানত কলকাতা অঞ্চল এবং তার আশপাশের ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে বর্ণিত অঞ্চলের স্থানিক বৈশিষ্ট্য তেমন জীবন্তভাবে ফুটে ওঠেনি। এখনকার বাংলা কথাসাহিত্যে কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হচ্ছে। সেইজন্য তার মধ্যে একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। এইসব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্বন্ধে লেখকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। তাই তার রস একান্তভাবেই বাস্তব। এই বাস্তব রস আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলি থেকে আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের মাটির প্রত্যেকটি কণাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন এবং সেই মাটি তাঁর সৃষ্টির গায়ে মাখিয়ে দিয়েছেন। এই অঞ্চলের প্রকৃতির উন্মুক্ত ও পরিপূর্ণ রূপ তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। এ অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোলকে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ধরে দিয়েছেন; শুধু তাই নয়, তাঁর হাতে পড়ে নীরস

ইতিহাস-ভূগোলের বর্ণনা রসময় হয়ে উঠেছে। এ দেশের নরনারীদের জীবন-যাত্রা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, হাসি-কান্না, চলন-বলন সমস্ত কিছুকেই তিনি অশেষ যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গল্প-উপন্যাসে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন; কোন সুনিপুণ আলোকচিত্রকারও এ কাজ এতখানি পরিপাটিভাবে করতে পারতেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

স্রষ্টা তারাশঙ্করের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মাটির বড় কাছাকাছি আছেন। তাঁর দৃষ্টি মানবজীবন ও মানবসমাজের শুধুমাত্র উপরের স্তরে নয়, সর্বনিম্ন স্তরেও পৌঁছেছে। জীবনকে নিয়ে তিনি সুলভ ভাবের বিলাস করেননি। জীবনের গভীরে অতল অন্ধকারের মধ্যে যে মহার্ঘ সম্পদ লুকিয়ে আছে, তাকে উদ্ধার করার জন্যে তিনি তার ভিতরে ডুব দিয়েছেন। তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে মানুষের চরিত্র রূপায়িত করেছেন বৈজ্ঞানিকের নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মন নিয়ে—তাঁর পদ্ধতি একান্তভাবেই বিশ্লেষণী পদ্ধতি। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনের দলিলে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু দলিল বললেও সবটুকু বলা হয় না। দলিলের কাজ শুধু তথ্য নিয়ে, তারাশঙ্করের গল্পে বা উপন্যাসে তথ্যের অতিরিক্ত বস্তুর সন্ধানও পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর যে-সমস্ত মানুষের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাদের জীবনের বাস্তব চিত্রই শুধু আমাদের তিনি উপহার দেননি; সেইসঙ্গে তিনি তাদের জীবন যে সব ভাবের তরঙ্গে নিত্য উদ্বেল হয়ে ওঠে, তাতে যে "কান্না-হাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা" অনুষ্ঠিত হয়ে চলে, ভাবুকের দৃষ্টি দিয়ে দেখে তাদের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেছেন এবং আপনার অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে সেগুলিকে রূপায়িত করে তুলেছেন। একদিকে বাস্তবতা, অপরদিকে ভাবময়তা—এই দুই আপাত-বিষম উপাদানের আশ্চর্য সমাবেশই তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য, সত্যের অনুরোধে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর সমস্ত রচনায় এই দুই উপাদানের সর্বাঙ্গীণ সমন্বয় সাধিত হয়নি। তাঁর প্রথম দিককার গল্প-উপন্যাস-গুলিতে ভাবোচ্ছ্বাস প্রাধান্য লাভ করেছে, আবার শেষ দিককার লেখাগুলিতে

বাস্তবতারই প্রাবল্য দেখা যায়। কিন্তু এই দুই পর্বের মাঝখানে রচিত তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে এই দুই উপাদানের সুষ্ঠু সমন্বয়ের দুর্লভ নিদর্শন মেলে।

এই সমন্বয়েরই একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত পাই 'কবি' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক একজন ডোমজাতীয় যুবক। তার বংশে শিক্ষাদীক্ষা, সুরুচি বা সংস্কৃতির কোন ঐতিহ্য নেই। উপরন্তু সে বংশে সকলেই পুরুষানুক্রমে চুরি-ডাকাতি করে আসছে। এহেন একটি যুবকের মধ্যেও একদিন কবিত্বের উন্মেষ হল এবং তারপর তার হৃদয়ে ঘটল প্রেমের আবির্ভাব। দুটি নারী তার জীবনে এসে দেখা দিল। এরাও কেউ কুলীনবংশীয়া নয়। এদের মধ্যে একজন জাতিতে মুচি, কাজ তার দুধ বিক্রী করা। অপর জন স্বৈরিণী, ঝুমুরদলের নর্তকী। আমাদের সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের এই তিনটি নরনারীর হৃদয়রাজ্যের রহস্য 'কবি' উপন্যাসে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। এর কাহিনীটি বীরভূম অঞ্চলের সমাজ ও ভূপ্রকৃতির পটভূমিকায় রচিত। সমগ্র উপন্যাসটিতেই তারাশঙ্করের বিপুল অভিজ্ঞতা, অভ্রান্ত পর্যবেক্ষণশক্তি এবং নিপুণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় মেলে। কিন্তু সেই সঙ্গে এর মধ্যে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন—মানুষ সম্বন্ধে ও মানুষের প্রেম সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণাটিও অভিব্যক্তি লাভ করেছে। জীবনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করে তারাশঙ্কর যে সত্য লাভ করেছেন, তাকে যেমন তিনি এই উপন্যাসে রূপায়িত করে তুলেছেন, তেমনি ধ্যানযোগে তিনি যে প্রত্যয় লাভ করেছেন, তাকেও এরই ভিতরে তিনি বাঙ্ময় করে তুলেছেন।

উপন্যাসখানি চরিত্রপ্রধান। চরিত্রগুলির বিকাশের মধ্য দিয়েই কাহিনীটিও বিকাশ লাভ করেছে। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর চরিত্রসৃষ্টিতে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল; কেবলমাত্র প্রধান চরিত্রগুলি নয়, ছোট ছোট চরিত্রগুলিও নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অথচ এর জন্যে তারাশঙ্করকে পৃথক্ কোন প্রযত্ন স্বীকার করতে হয়নি, চরিত্রগুলি যেন নিজের থেকে অবলীলাক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মোহিতলাল বলেছেন, "তিনি প্রত্যেক চরিত্রের মর্মস্থানটিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাই তাহারা এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

প্রাণ ও দীপ্তির দিক দিয়ে এই উপন্যাসের নায়ক নিতাইয়ের চরিত্র বাংলা

সাহিত্যে তুলনারহিত। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র এই নিতাই। তার চেহারাতেও বংশগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। "দীর্ঘ সবল কঠিনপেশী দেহ, রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙ। কিন্তু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে।" পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য সে অনুসরণ করেনি, চুরি-ডাকাতিকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতে শিখেছে। মা যখন তাকে বলল, "তোর মামা বলছে, এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে"—তখন সে ঘৃণাভরে উত্তর দিল, "ছি! ছি! ছি! গব্যধারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে!" ধর্মনিষ্ঠ নিতাই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে, এমন কি নিজের মার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সৎপথে, কুলিগিরিতে জীবিকা নির্বাহ করে।

জাতির চিরন্তন ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম করে নিতাই কিছুদূর লেখাপড়া শিখেছিল। বাইরের প্রতিবন্ধকের জন্যে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু তার মনে পুরাণকাহিনী ও কবিতার প্রতি একটি স্থায়ী অনুরাগ জন্মেছিল। তার একটি দপ্তর ছিল। তাতে খানকয়েক বই ছিল। এছাড়া সে পথে-ঘাটে যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা কুড়িয়ে পেত, তা'ও সংগ্রহ করত। এমনই অসীম তার জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসতৃষ্ণা। নিতাই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদই বটে।

এই নিতাই একদিন একটা আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে চিন্‌ল, সে উপলব্ধি করল যে সে কবি। তার মুখে মিলযুক্ত ছন্দোবদ্ধ কাব্য নিজের থেকেই এসে পড়ে, প্রাণে ভাব জাগলেই তা শ্লোকের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে। নিজের এই অলোকসামান্য শক্তি উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্থির করল আর সে কোন হীন কাজ করবে না। কুলিগিরি আর তার দ্বারা হবে না। সে কবিয়াল হবে—আসরে আসরে গান গাইবে—মানুষকে সে কবিতাব অমৃতরস বিতরণ করবে। এই স্বপ্ন কবিরই উপযুক্ত। কিন্তু এ কবি আমাদের পরিচিত অভিজাত শিক্ষিত বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন কবি নয়, গ্রাম্য মূর্খ কবি। তাই তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নও তার নিজস্ব ধরনের। এই বৈশিষ্ট্যটি তারাশঙ্করের লেখনীর চাতুর্যে, সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন-কৌশলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তারপর নিতাইয়ের মনের মুকুরে ছায়া পড়ল একটি তরুণীর। সে তার বন্ধু রাজার 'ঠাকুরঝি'। এই দিঘল কালো মেয়েটির সর্বাঙ্গের কচিপাতার মত কোমল শ্রী নিতাই-এর মনকে আবিষ্ট করল। ঠাকুরঝি যখন দুধ নিয়ে

আসত, নিতাই তখন প্রতীক্ষা করত তার জন্যে, তার দূর থেকে আসার দৃশ্যটি দেখবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। রেললাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে থাকত যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরেছে, সেই দিকে। তারপর এক সময়ে দেখত, সেখানে একটি চলন্ত শুভ্র রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু; ক্রমশ রেখাটি পরিণত হয় একটি মেয়েতে, তার মাথায় একটি পিতলের ঘটি। ক্রমে সে কাছে আসে, নিতাইয়ের বাসায় আসে, এসে দুধ দেয়, নিতাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। নিতাইয়ের কবিপ্রতিভা ধরা পড়ে ঠাকুরঝির কাছে, ঠাকুরঝি হয়ে ওঠে তার একনিষ্ঠ অনুরাগিণী। দু'জনের পরিচয় পরিণত হয় প্রেমে। নিতাই উপলব্ধি করে শুধু সেই ঠাকুরঝিকে ভালোবাসেনি, ঠাকুরঝিও তাকে ভালোবেসেছে।

কিন্তু এ প্রেমে জ্বালা নেই, লালসা নেই, নেই প্রাণের দুর্নিবার পিপাসা। এ প্রেম পরিপূর্ণভাবে প্লেটোনিক প্রেম। ঠাকুরঝির মধ্যে এমন একটা শান্ত কমনীয় পবিত্র ভাব ছিল, যে তার প্রেমে পড়ে নিতাইয়ের মনে দাহ জাগেনি, নিবিড করে পাওয়ার আকুতি জাগেনি, জেগেছিল একটি অনাবিল অনির্বচনীয় শান্তি। তাছাডা নিতাই ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ। সে জানত ঠাকুরঝির স্বামী আছে, সংসার আছে, সমাজ আছে। তার সুখের নীড ভেঙে দিয়ে তাকে স্বার্থপরের মত নিজের কাছে টেনে নেওয়া তার পক্ষে সঙ্গত হবে না। না! কাজ নেই! ঠাকুরঝি দূরেই থাকুক, তাকে ভালোবেসেই নিতাই তৃপ্ত, আপনার করে তাকে পেতে সে চায় না, তার মন গায়,

> চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
> ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।

তাই নিতাই যখন দেখল তাকে ভালোবাসার জন্যে ঠাকুরঝির জীবনে অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, তখন সে পরম প্রশান্ত চিত্তে ঠাকুরঝিকে ছেড়ে চলে গেল।

ঠাকুরঝির সঙ্গে বিচ্ছেদের ঠিক পূর্বাহ্ণে নিতাই-এর জীবনে আবির্ভাব ঘটল আর একটি মেয়ের। এর জীবনে গৌরব বা শালীনতার কণামাত্রও নেই। মেয়েটির নাম বসন্ত। সে ঝুমুরদলের নর্তকী, দেহোপজীবিনী। কিন্তু তার রূপ আছে। সে রূপ ঠাকুরঝির মত শান্ত পবিত্র নয়। "একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন

ছুরির ধার,—সেই শাণিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। সাদা আগুনের শিখার মধ্যে নাচিয়া ফিরিতেছে যেন দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী কালো ভ্রমর দুইটা।" আর তেমনি বিচিত্র তার হাসি। "মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধূলায় লুটাইয়া দেয়।"

বসন্তের সঙ্গে নিতাইয়ের পরিচয়ের প্রথম পর্ব উদ্‌যাপিত হল তিক্ত শ্লেষ-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ক্রমশ দুজনে দুজনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হল। ফলে এক রাত্রিতে নিতাইয়ের শয়নঘরে প্রীতি-আলাপনের মধ্য দিয়ে দুজনের মধুর সম্পর্কের সূচনা ঘটল। কিন্তু তা ঠাকুরঝির চোখে ধরা পড়ে গেল। তারই ফলে ঠাকুরঝির মনোবিকার দেখা দিল, আর নিতাই ঠাকুরঝির মঙ্গলের জন্য দেশ ত্যাগ করল।

দেশত্যাগ করে সে যোগ দিল বসন্তেরই ঝুমুরের দলে। এইখানে আমরা নিতাই-চরিত্রে একটি নতুন দিক্-পরিবর্তন দেখতে পাই। যে নিতাই কোনদিন অশ্লীল কিছু রচনা করবার বা গাইবার কল্পনা করতে পারেনি, তার কাছে এল মেলার মধ্যে ঝুমুরদলের আসরে খেউড়গান গাইবার আহ্বান। নিতাই এক প্রবল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হল। প্রথমে তার আবাল্যপোষিত সুরুচি ও সংযমেরই জয় হল, সে খেউড়গান গাইল না। কিন্তু তার ফলে সে পেল শ্রোতৃবৃন্দের অনাদর, তার উপরে বসন্তের অবজ্ঞা ও অপমান। বসন্তের অপমান নিতাইকে উন্মত্ত করে তুলল, তার রক্ত হয়ে উঠল উত্তাল। যে মদ সে এর আগে কোনদিন স্পর্শ করেনি, তা'ই আকণ্ঠ পান করে সে আসরে গিয়ে গাইল খেউড়। তার শোণিতে ছিল ভীষণ বীরবংশী জাতির হিংস্র বর্বরতা, পুঞ্জীভূত পাপ, কদর্য অশ্লীলতা। বসন্তের অপমানের জ্বালায় এবং উগ্র সুরার প্রভাবে তার রক্তের সেই সুপ্ত গরল আজ আবার জাগ্রত হয়ে অনর্গলভাবে উদ্‌গীরিত হতে লাগল। শান্ত সচ্চরিত্র রুচিমান্ নিতাই আজ মাতাল খেউড়-গায়কে পরিণত হল।

নিতাইয়ের এই পরিবর্তনকে বসন্তের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ বলা যেতে পারে। এই আত্মসমর্পণের প্রতিদানস্বরূপ নিতাই পেল বসন্তের প্রেম। রূপোপজীবিনী বসন্ত দেহ দান করেছে শত শত পুরুষকে, কিন্তু এই প্রথম

একজন পুরুষকে সে মনপ্রাণ সমর্পণ করল। নিতাইও বসন্তকে ভালোবাসল। এ ভালোবাসা ঠাকুরঝির প্রতি ভালোবাসার ঠিক বিপরীত। এ প্রেমে আছে দুর্নিবার ক্ষুধা, প্রচণ্ড আকর্ষণ, পরস্পরকে নিঃশেষে পাওয়ার আকুতি। নিতাইয়ের মধ্যে যে অসুরের শক্তি ও পৌরুষ ছিল, তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা মিটল বসন্তকে পেয়ে। "উচ্ছৃঙ্খল বর্বর বীরবংশীর সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি" নিয়ে বসন্তকে উপভোগ করতে লাগল। কখনও সে "সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথাব উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। আর একটা অদ্ভুত খেয়াল আছে তার। সে হঠাৎ শুইযা পড়িয়া বলে—নাচ বসন, আমার বুকের ওপর চড়ে কালীর মত নাচ। বসন্ত নির্জীবের মত ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহাব নিষ্কৃতি।" এখানে প্রচণ্ড পৌরুষের দুর্বার লেলিহান ক্ষুধার যে ছবি পাই, বাংলা সাহিত্যে তা যেমনি অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর। অবশ্য সব সময়েই নিতাই এ রকম করে না, সহজ শান্ত অবস্থায় সে বসন্তকে আদরে যত্নে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রাখে, কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে থাকে বসন্তের নাগালের বাইরে।

নিতাইয়ের জীবন বসন্ত-ময়। সে এখন "বসন্তের কোকিল" নামে নিজের পরিচয় দেয়। বসন্তের সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে, দু'জনের একজন না মরলে তা আর খোলা হবে না। কখনও কখনও ঠাকুরঝির স্মৃতিও নিতাইয়ের মনকে উতলা করে তোলে বটে, কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য।

বসন্তের প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের জীবনে এসেছে সাধনায় সিদ্ধিলাভ। কবি হিসাবে এখন তার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঝুমুর দলের কলুষিত পরিবেশ নিতাইয়ের মার্জিত মনকে থেকে থেকে পীড়া দেয়। তখন তার মন বিদ্রোহ করে, চলে যেতে ইচ্ছা করে তার। কিন্তু মন শান্ত হতেও বেশী দেরী লাগে না।

কিছুদিন এইভাবে কাটাবার পর বসন্ত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হল। এই শ্রেণীর নারীর এই জাতীয় ব্যাধিব আভাসমাত্রেই প্রণয়ী তাকে ছেড়ে পালায়, কিন্তু নিতাই প্রাণ দিয়ে, ঘৃণাভয় বিসর্জন দিয়ে বসন্তের সেবা করতে লাগল। এইখানে নিতাইয়ের এক নতুন মূর্তির পরিচয় পাই।

কিন্তু বসন্ত শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে চলে গেল। নিতাইয়ের জীবনে এল চরম

আঘাত। এই আঘাতের ফলে নিতাইয়ের কাছে জীবনটা শূন্য বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু তার পরেই এল তার এক দিব্য উপলব্ধি ; সে গাইল—

মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।

এর পর নিতাইয়ের মন আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

ঝুমুর দল সে ছেড়ে দিল। সে ঠিক করল এবার সে তার কবিপ্রতিভাকে ভগবানের সেবায় লাগাবে—গান শোনাবে বিশ্বনাথকে, অন্নপূর্ণাকে, রাধা-রাণীকে। এই ভেবে সে কাশী গেল। কিন্তু সেখানকার লোক অপরিচিত, ভাষা অপরিচিত, পরিবেশ অপরিচিত। তার গান সেখানে কে বুঝবে? তাই সে আবার দেশে ফিরে এল।

ফিরে এসে খবর পেল ঠাকুরঝি বেঁচে নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিতাই উপলব্ধি করল ভালোবেসে তার সাধ মেটেনি, তার কারণ মানুষের জীবন বড়ই ছোট। নিতাই কাঁদল। কিন্তু "কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল হিল-হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন। সে আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ।··· আঃ! ঠাকুরঝি, বসন—দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।"

নিতাই-চরিত্রের এই ক্রম-পরিণতির ইতিহাস আসলে একটি কবির কবিত্ব উন্মেষের ইতিহাস। এ কবি একান্তভাবে বাংলা দেশের পল্লী-জীবনের কবি। আঘাতে প্রতিঘাতে, বহিঃশক্তির অনুকূলতা ও প্রতিকূলতায়, প্রেমের সার্থকতা ও ব্যর্থতায় একটু একটু করে এই কবিত্বের দল উন্মীলিত হয়েছে। শেষে যে চরম বেদনা এসেছে, তারই মধ্যে এই কবিত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে। এই বেদনার উপলব্ধি ভিন্ন কোন কবিরই পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ সম্ভব হয় না। নিতাই-চরিত্র যেভাবে বিকশিত হয়েছে, তার প্রতিটি সূক্ষ্ম রেখা তারাশঙ্কর সুস্পষ্ট করে এঁকেছেন। এরকম পূর্ণাঙ্গভাবে অঙ্কিত চরিত্র বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল।

বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্রের তুলনায় পুরুষচরিত্র নিষ্প্রভ বলে যে অভিযোগ শোনা যায়, নিতাই-চরিত্র সেই অভিযোগের গুরুত্ব খর্ব করে। নিতাইয়ের মধ্যে জাগ্রত পৌরুষের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার তুলনা দুর্লভ। মোহিত-লাল মজুমদার লিখেছেন, "পৌরুষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যদি ইহাও হয় যে, সকল অপরাধ সকল পাপকে সে ক্ষমা করিতে পারে; নীলকণ্ঠের মত সকল বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়াও ওষ্ঠে করুণার সুধা-হাস্য কখনো হারায় না; ঝড়কে বক্ষ-কপাট উন্মুক্ত করিয়া দেয়—তাহার পূর্ণবেগে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও অটল ও অবিচলিত থাকে; সে এমনই একটি জ্ঞান বা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাহা শক্তিরই আরেক রূপ;—তবে ঐ নিতাই-কবিয়ালের চেয়ে কাহারও পৌরুষ বড় নয়।"

এই উপন্যাসে নিতাই-চরিত্রের পরেই ঠাকুরঝি ও বসন্তের চরিত্র প্রধান। ঠাকুরঝি-চরিত্রে কোন অভিনবত্ব বা জটিলতা নেই, কিন্তু চরিত্রটি অত্যন্ত মনোরম। রেল লাইনের ধার দিয়ে মাথায় দুধের ঘটি নিয়ে আসা এই মেয়েটি বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। এই সলজ্জ মেয়েটির ভীরু প্রেমের মধ্যে এমন একটি সুকুমার কোমলতা ও অপার্থিব মাধুর্য আছে, যা আমাদের মনের নিভৃত তন্ত্রীকে স্পর্শ করে। ঠাকুরঝির প্রতি নিতাইয়ের প্রেমের মত নিতাইয়ের প্রতি ঠাকুরঝির প্রেম কিন্তু জ্বালাহীন নয়। তাতে আছে ঈর্ষার কণ্টক। সেই কণ্টক ঠাকুরঝিকে দংশন করল, যখন সে বসন্তের সঙ্গে নিতাইকে দেখল। কিন্তু ঠাকুরঝি বড়ই দুর্বল। এই প্রথম আঘাতও সে সহ্য করতে পারল না। এই আঘাতের ফলেই তার এল উন্মত্ততা, তারপর মৃত্যু।

বসন্তের চরিত্রটি সরলও নয়, গতানুগতিকও নয়। স্বৈরিণীব চরিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল নয়, কিন্তু এই চরিত্রের প্রতিটি অণুপরমাণু যেরকম স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তার তুলনা নেই। বসন্ত শুধু বারবনিতা নয়, সেইসঙ্গে সে ঝুমুরদলের নর্তকীও। তার রূপ আছে, যৌবন আছে, সেই সঙ্গে আছে একটি লোকদুর্লভ গুণ—নৃত্যগীতে দক্ষতা। বসন্তের দক্ষতা ঐ শ্রেণীর অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু অসাধারণ। এই অসাধারণত্ব তার অন্য বিষয়েও দেখা যায়। তার মধ্যে একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল, যার জন্যে সে তিলমাত্র অবজ্ঞা বা অনাদর সহ্য করতে পারত না, আঘাতের আভাসমাত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যের সঙ্গে প্রতিঘাত করত। বসন্তের দেহে প্রায় সর্বক্ষণই জ্বরের তাপ, সে তাপ তার

সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছে। তার হাসিতে ক্ষুরের ধার, সে শুধু মুখ ভরে হাসত না, সর্বাঙ্গ ভরে হাসত।

তার দলের অন্য মেয়েদের সঙ্গে বসন্তের আর একটা বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ছিল। "সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেয়েটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে। সেখানে মান-অভিমান আছে, সাধ্য-সাধনাও আছে। কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না। কেহ পতঙ্গের মত তাহার শাণিত দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিলে মেয়েটার ক্ষুরধারে তাহার কেবল পক্ষচ্ছেদই নয়, মর্মচ্ছেদও হইয়া যায়।" কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটাল নিতাই। নিতাইও প্রথমে এই মেয়েটির ধারে আহত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে স্পর্ধিতা ফণিনীকে মন্ত্রবলে শান্ত করল, প্রখরা বসন্তকে বাঁধল প্রেমের বন্ধনে। নিতাইয়ের মধ্যে যে প্রচণ্ড পৌরুষ ছিল, যে বিপুল শক্তি ছিল, বসন্ত তার কাছে ধরা দিল। নিতাইয়ের প্রেম শুধু তাকে বশীভূত করল না, জীবনের প্রতি তার মায়াও বাড়িয়ে তুলল।

বসন্তের মধ্যে শুধু তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নয়, শ্রেণীবৈশিষ্ট্যও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কোনরকম আক্ষরিক শিক্ষা লাভ না করেও এই শ্রেণীর মেয়েরা একটা অদ্ভুত সংস্কৃতির অধিকারিণী। পালাগানের মধ্য দিয়ে তারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়ে ব্যঙ্গ-শ্লেষ করলে বুঝতে পারে, প্রশংসা-সহানুভূতি উপলব্ধি করতে পারে। শুধু সস্তা চটুল গান নয়, মহাজন-পদাবলীও তারা জানে। রূপযৌবন নিয়ে তাদের অহঙ্কার আছে—কিন্তু সে শুধু অহঙ্কারই—জীবনের মর্যাদা নয়। পুরুষেরা এসে অর্থের বিনিময়ে রাক্ষসের মত তাদের ভোগ করে রূপযৌবনের অহঙ্কারকে পায়ে দলে চলে যায়। তাই গান আর নাচের কুশলতাই তাদের একমাত্র মর্যাদাময় অহঙ্কার। তাদের নাচগান যখন সমজদার দর্শক ও শ্রোতার সমাদর পায়, তখনই তারা সত্যকার গর্ব অনুভব করে। বাংলা দেশের স্বৈরিণীদের মধ্যে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী উপাদানের বিস্ময়কর সমাবেশ দেখা যায়। বসন্ত এবং তার সঙ্গিনীদের কার্যকলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের দেহ যে কোন লোকের কাছেই অনায়াসলভ্য, কিন্তু মন তারা সহজে কাউকে দিতে চায় না, যদি বা দেয় সেখানে তারা একনিষ্ঠতা রক্ষা করে। দেহবিক্রয় ও উচ্ছৃঙ্খল ঘৃণিত জীবন-যাপনের মধ্যেই তারা এক একদিন শুচি সাজসজ্জা করে আন্তরিক ভক্তি ও

নিষ্ঠা নিয়ে দেবতার পূজা করে। দিনের পর দিন দেহের বেসাতি করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিরক্তি ও প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু কয়েক দিন এ কাজের বিরতি ঘটলেই তারা অস্থির হয়ে ওঠে। বসন্ত ও তার সঙ্গিনীদের মধ্যে আমরা এই বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীদের প্রকৃতি, রুচি ও জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি পাই।

বসন্তের অন্তিম মুহূর্তে যখন নিতাই তাকে ভগবানের নাম করতে বলল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মত মুমূর্ষু বসন্তের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল, "না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।" অভাগিনী স্বৈরিণীর এই হাহাকারে নিতাইয়ের মত আমরাও নির্বাক হয়ে যাই এবং আমাদের সমস্ত বিচারবুদ্ধি, নীতি-দুর্নীতিবোধ সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বসন্তের চরিত্র সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "বসন্তের চরিত্রে তীক্ষ্ণ, হিংস্র আঘাত করিবার প্রবৃত্তি ও উদ্দাম, বেপরোয়া জীবনোপভোগ-স্পৃহার সঙ্গে আত্মগ্লানি ও একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা-উপলব্ধির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে।"

এই তিনটি চরিত্র ছাড়া আর একটি চরিত্র তারাশঙ্করের প্রতিভার অভ্রান্ত পরিচয় বহন করছে। এ হচ্ছে ঝুমুরদলের নেত্রী 'মাসী'র চরিত্র। মাসী দলের কর্ত্রী। তার ব্যক্তিত্ব অপরিসীম। দলের সকলেই তাকে ভয় করে। লেখকের ভাষায় "ওই এক অদ্ভুত মেয়ে! মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আবার মুহূর্তে চোখ দুইটা রাঙা করিয়া এমন গম্ভীর হইয়া উঠে যে, দলের সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার পরমুহূর্তেই সে হাসে। গানের ভাণ্ডার উহার পেটে। অনর্গল ছড়া, গান মুখস্থ বলিয়া যায়। গৃহস্থালি লইয়া চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত। উন্মত্ত বুনো একপাল ঘোড়াকে রাশ টানিয়া চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রথ-রথী-সারথি সবই সে একাধারে নিজে।"

কিন্তু এইটুকুই 'মাসী'র প্রধান পরিচয় নয়। চরিত্রটি আরও জটিল। নারীর মাতৃমূর্তি সম্বন্ধে আমাদের মনে এক স্থায়ী সংস্কার আছে। সে মূর্তি পবিত্র, মহনীয়, কলুষলেশশূন্য। ঘৃণিতা স্বৈরিণীর কলঙ্কিত রূপের সঙ্গে তার কোনরকম সামঞ্জস্য আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু এই সামঞ্জস্য তারাশঙ্কর করেছেন মাসীর চরিত্রে। মাসী বিগত-যৌবনা বারাঙ্গনা, বয়সকালে সে যে দুষ্কর্ম করেছিল, জীবন-সায়াহ্নে তার চেয়েও বেশী দুষ্কর্ম সে করছে অন্য মেয়েদের দলে টেনে এনে ও তাদের নিয়ে ব্যবসায় খুলে। তার

জীবনযাপনের মধ্যে কোনই গরিমা নেই। প্রৌঢ় বয়সেও তার একজন মনের মানুষ আছে, মদ খাওয়ার ব্যাপারেও সে কারও চাইতে কম যায় না। কিন্তু এই দুশ্চরিত্রা প্রৌঢ়ার মধ্যেই আবার আছে একটি স্নেহময়ী জননী, বাৎসল্যরসের একটি অফুরন্ত নির্ঝর। নিতাইয়ের প্রতি তার স্নেহ সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের চাইতে কোন অংশে কম নয়। এই স্নেহ এত গভীর যে দলনেত্রীর স্পর্ধা ও অভিমান তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। বাৎসল্যরস মাসীর কাছে সিদ্ধ রস, তাই নারীদেহলোলুপ নাগর সম্প্রদায়কেও সে বাৎসল্যরস দিয়েই আপ্যায়িত করে, “কে গো বাবা? এস, এগিয়ে এস। লজ্জা কি ধন? ভয় কি? এস এস।”

দলের যে লোক উপার্জন করতে পারবে না, তাকে মাসী দলে রাখবে না। তাই বলে কি দলের লোকের প্রতি তার কোন স্নেহ-মমতা নেই? তা'ও আছে। কিন্তু সেখানে আত্মরক্ষার অনুরোধে সে স্বার্থের কাছে স্নেহকে বলি দিতে বাধ্য হয়। মৃত্যু এসে যখন দলের কোন মেয়ের সঙ্গে মাসীর বিচ্ছেদ ঘটায়, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চোখের জল তার স্নেহকে প্রকাশ করে। কিন্তু তাই বলে মৃতদেহ থেকে গয়নাগুলি খুলে নিতেও সে ভোলে না। আবার সেই সঙ্গে দুঃখ করে বলে, “আমার অদেষ্ট দেখ বাবা। আমিই হলাম ওয়ারিশান।”

মাসী-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য মোহিতলালের চোখে ধরা পড়েছে, তা তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি,

“এই ‘মাসী’টির জীবনে মানবভাগ্য-বিধাতার যে ক্রূর পরিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার মত দুর্জ্ঞেয়-ভীষণ আর কিছু কল্পনা করা যায় না। সে তাহার হৃদয়কে শ্মশান করিয়া, সেই শ্মশানে, তাহারই মত কয়েকটি নারীর আত্ম-হত দেহে শবাসন রচনা করিয়া শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে; সকল হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া—স্নেহ-দয়াকে দূর না করিয়া, দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। সংসারের যে দিকটা তাহার ভাগে পড়িয়াছে সে দিকটার দেনা-পাওনা সে এমন পাকা করিয়া লইয়াছে যে, কোন তন্ত্রসিদ্ধা ভৈরবীও তাহার মত নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার নহে। কিন্তু সেই নির্ম্মমতারও কোন্ অতল তলে তাহার দুই চক্ষের অশ্রুধারা জমাট হইয়া আছে—সে অশ্রু গলিয়া উপরের দিকে প্রবাহিত হয় না কেন—রসনের চিত্র সাজাইবার কালে, কথায় ও কাজে, সে তাহার একটা চকিত আভাসমাত্র দিয়াছে।”

এই সমস্ত প্রধান চরিত্র ছাড়া, অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যেও তারাশঙ্করের সৃষ্টিকুশলতার উজ্জ্বল পরিচয় রয়েছে। 'কবি' উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যে চরিত্র তার মধ্যে একবার একটুখানির জন্যে উঁকি দিয়েছে, সে-ও নিজের বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। নিতাইয়ের বন্ধু সরল উদার বন্ধুবৎসল ভুল-হিন্দী-নবীশ রাজা, তার গরলমুখী স্ত্রী, গঞ্জিকাসেবী দুর্মদ দুর্দান্ত ভূতনাথ, পাকাবুদ্ধি মহান্ত, সজীব বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ, ঝুমুরদলের তার্কিক দোহার, উদাসীন বেহালাদার, চোর-প্রেমিক বাজনদার, মহিষের মত সেই লোকটা, স্বৈরিণী অথচ নিতাইয়ের প্রতি ভগ্নীস্নেহময়ী নির্মলা, প্রখরা ললিতা, কাশীর সেই বিধবা মহিলা—প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। প্রত্যেকটি চরিত্রের হাবভাব, চলনবলন এমন কি মুখভঙ্গী পর্যন্ত যেন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, উপন্যাসে তাদের ভূমিকা যতই অল্প হোক্।

*

'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাইয়ের জন্মগত কবিত্বশক্তি ছিল। কিন্তু তার সেই শক্তি বিকশিত হয়েছে আরেকটি মহাশক্তির সাহায্যে—তার নাম প্রেম।

এই প্রেমশক্তিরই লীলা ও মহিমা 'কবি' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ প্রেম সৌখীন, বায়বীয়, ভাবজগৎসম্ভূত প্রেম নয়। এ প্রেম সহজ, অকৃত্রিম, অকর্ষিত প্রেম, বাস্তবজীবনের গভীরে যার মর্মমূল প্রসারিত। এই প্রেম নিতাইয়ের জীবনে এসেছে দু'বার। তার মধ্যে প্রথমবারের প্রেম দেহসংস্পর্শবর্জ্জিত মৃদু মধুর প্রেম: তা নিতাইয়ের কবিত্বশক্তিকে উন্মীলিত করেছে, কিন্তু পূর্ণবিকশিত করতে পারেনি; কারণ নিতাইয়ের কবিত্ব তো শুধুমাত্র ভাবজগতের সামগ্রী নয়, পল্লীজীবনের সর্ব্বনিম্ন স্তরের ধুলো মাটি-কাদাতে সেই কবিত্বের জন্ম, সেই জীবনের কথাকে ভাষা দেওয়াই তার কাজ। তাই সেই কবিত্ব স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণতা লাভ করেছে নিতাইয়ের দ্বিতীয় প্রেম—কামনার ধুলো-মাটি-মাখা নগ্ন আদিম প্রেমের মধ্য দিয়ে।

এখন লেখকের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি।

প্রথমে বলতে হয় তাঁর আশ্চর্য পর্যবেক্ষণশক্তির কথা। যে জীবনকে তিনি তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন, যে অঞ্চল ও যে সমাজকে তিনি তার পটভূমি

করেছেন, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় তিনি অভ্রান্ত নিপুণতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন এবং ততোধিক কুশলতার সঙ্গে তাকে ভাষার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করে তুলেছেন। ক্ষুদ্র এবং গৌণ ব্যাপারেও তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় এই উপন্যাসে মেলে। তার নিদর্শনস্বরূপ চলন্ত ট্রেনের একটি বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি,

"ঘং-ঘং গম্‌-গম্‌ শব্দে ট্রেনখানা ধ্রুপদ ধামারে গান ধরিয়া দিল। নদীর পুল। গেরুয়ারঙের জলে সাদা সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লাল জল থৈ থৈ করিতেছে। জল ঘুরপাক খাইতেছে, আবার তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। দুপাশে কাশের ঝাড়, ঘন সবুজ। অজয়! অজয় নদী! ...এইবার বোলপুর—তারপর কোপাই, তারপর, তারপর জংশন; ছোট লাইন। ঘটো-ঘটো ঘটো-ঘটো ঘং-ঘং ঘং-ঘং। সর্ব্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীর চলন।"

এই উপন্যাসে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের অভাব নেই। সেগুলির মধ্যে লেখকের সচেতন প্রচেষ্টার কোন নিদর্শন মেলে না, ঝর্ণার জলস্রোতে যেমন আপনার থেকে ফেনা জাগে, তেম্‌নি এগুলি বর্ণনার স্রোতে আপনিই সৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি উপমা-উৎপ্রেক্ষা এত সরল যে তা মনের গভীরে গেঁথে যায়। এর দুটি নিদর্শন দিই,

"আকাশে পাতলা মেঘের আভাস দেখা দিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণের আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে।"

"বসন্তের ওই ক্ষীণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোট দুইটির কোলে-কোলে লাল কালির কলমে টানা রেখার মত রক্তের টকটকে রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

এই উপন্যাসে ভাব ও ভাষার যে অঙ্গাঙ্গী মিলন সংঘটিত হয়েছে, তার তুলনা বিরল। এরকম স্বচ্ছ, সরস এবং বিষয়বস্তুর সর্বাংশে উপযোগী ভাষা বাংলা উপন্যাসে খুব কমই দেখা যায়। এ ভাষার মধ্যে এমন একটি সারল্য আছে যে মনে হয় লেখক যেন প্রাণের গভীরতম প্রদেশের ভাষাকে লেখনীর মুখে নিঃসৃত করতে পেরেছেন। এর সৌন্দর্য স্বাভাবিক, অনায়াসলব্ধ। উপরে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকেই তার পরিচয় মিলবে। বর্ণনাতে যেমন, তেম্‌নি সংলাপ রচনাতেও লেখকের আশ্চর্য দক্ষতা দেখা যায়। যে স্তরের নরনারীর কথা এই উপন্যাসে

লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের মুখের কথাকে লেখক উচ্চারণের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য, এমনকি মুদ্রাদোষ সমেত অবিকলভাবে ধরে দিয়েছেন। এই সংলাপ চরিত্র-গুলিকে জীবন্ত করে তুলতে সবচেয়ে সাহায্য করেছে। নিতাইয়ের "এমন দব্য আছে কি ভো-মণ্ডলে ?" মাসীর "এই 'নাইনেই' থাকবে বাবা ?" বসন্তের "ন্যাকার মত আমার ছামুতে তব্ দাঁড়িয়ে। কেনে, কেনে, কেনে ?" প্রভৃতি উক্তিতে মানুষগুলির চেহারাই যেন আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনের অনুরোধে দু'এক জায়গায় বর্ণনার ভাষা গুরুগম্ভীর হয়েছে। এই ধরনের ভাষাতেও লেখকের দক্ষতা সুপরিস্ফুট হয়েছে। এর কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি,

"রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সে এক বীভৎস দৃশ্য। নিতাইয়ের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। মেলা উৎসবের আলোকোজ্জ্বল সমারোহের একটি বিপরীত দিক আছে। সে দিকটি সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। আলোকের বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলার সরীসৃপের মত মানুষের বকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে। অবশ্য নিতাইয়ের যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম, সে পারিপার্শ্বিকও অবস্থাপন্ন সভ্যসমাজের ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিক। সভ্যসমাজের আবর্জনা ফেলার স্থান। সেখানেও অনাবিষ্কৃত চির-অন্ধকার—ঝিঁকলোকের মত চির-অন্ধকার।"

'কবি' উপন্যাসের আগাগোড়াই একটি সুষম সামঞ্জস্য, স্বাভাবিকতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মাত্র দু'এক জায়গায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের মোহান্তর সঙ্গে নিতাই যেন একটু বেশী মার্জিত ভাষায় কথা বলেছে। বসন্তের মৃত্যুর দৃশ্যটি যেন একটু নাটকীয় ধরনের হয়ে গিয়েছে। সপ্তদশ পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে এবং এতে অনেক দিনের ঘটনা—নিতাইয়ের ঝুমুরদলে অবস্থানের প্রায় সমগ্র পর্বটি বর্ণিত হয়েছে ; এটিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করলে ভাল হত বলে মনে হয়। কিন্তু এ সমস্ত ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। প্রতিভার সবগুলি উপাদান একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য লাভ করলে তবেই এ ধরনের একটি সার্থক উপন্যাস লেখা সম্ভব। এই সামঞ্জস্য প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের ভাগেও কদাচিৎ ঘটে, তাই তারাশঙ্কর 'কবি'র মত দ্বিতীয় একখানি উপন্যাস আর লিখতে পারেননি।

*

'কবি' উপন্যাসের বস্তু-অংশ খুবই সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল। এর কাহিনী, চরিত্রচিত্রণ, বর্ণনা, সংলাপ একান্তভাবে বাস্তবনিষ্ঠ এবং তার মধ্যে লেখকের বিস্তীর্ণ ও গভীর অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং অভ্রান্ত পরিবেশসৃজন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবতাই এই উপন্যাসের চরম কথা নয়। তা যদি হত, তাহলে উপন্যাসখানি ডকুমেণ্টারী রচনার পর্যায়ে পড়ত। এর মধ্যে বস্তুপুঞ্জের সমাবেশের ফাঁকে ফাঁকে লেখকের অপার্থিব উপলব্ধি সর্বক্ষণ নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে, মানবদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডের মত। আর গানের সুরের মত একটি বিচিত্র রাগিণী সমস্ত বস্তুপুঞ্জকে প্লাবিত করে উপন্যাসটিতে ছড়িয়ে আছে। তার ফলে উপন্যাসটিতে বস্তুরসের চাইতে সেই রসই প্রধান হয়ে উঠেছে, যা অমর্ত, অপার্থিব, অবাঙ্‌মনসগোচর।

এই রসকে পরিস্ফুট করে তুলতে উপন্যাসের গানগুলি কম সাহায্য করেনি। মোহিতলাল লিখেছেন, "উপন্যাসখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে পারি, আমরা একটা নূতন ভাবমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছি; সেই ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে কবিয়াল নিতাইয়ের ঐ গানগুলি; সেই গানের অন্তর্নিহিত সুরই সর্বত্র অন্তঃশীলা হইয়া বহিতেছে।" এই গানগুলি যে শুধু 'কবি' উপন্যাসের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে তাই নয়, উপন্যাসের বক্তব্যের অনেকখানি এদের মধ্য দিয়েই প্রকাশলাভ করেছে, যা হাজার বর্ণনার মধ্য দিয়েও সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কবিতাগুলির মত 'কবি'র গানগুলিও উপন্যাসেরই অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সত্য এদের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে। এদের কাব্যগুণও অসামান্য। একদিকে অনুভূতির গভীরতা ও অকৃত্রিমতা, অপরদিকে ভাষার গ্রাম্যতা এই গানগুলিকে একটি অভিনব লাবণ্যে মণ্ডিত করেছে * "কালো যদি মন্দ কেনে", "ও আমার মনের মানুষ গো", "করিল কে ভুল হায় রে", "চাঁদ তুমি আকাশে থাক", "ভালবেসে এই বুঝেছি" প্রভৃতি গানের তুলনা হয় না। নিতাইয়ের বাণীতে

* এই গানগুলি এতখানি স্বাভাবিক হয়েছে যে আমাদের মনে হয়, এগুলি যেন সত্যই একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য তথাকথিত 'নিম্নজাতীয়' কবিয়ালের লেখা! আসলে যে এগুলি শিক্ষিত অভিজাত ব্রাহ্মণ লেখকের লেখনীপ্রসূত, তা যেন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না! এই গানগুলি তারাশঙ্করের সৃষ্টি-প্রতিভার বিজয়-কেতন।

রচিত 'বারমেশে' গানটিতে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সমস্ত সুধা যেন উজাড করে ঢেলে দেওয়া হযেছে। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেযে উল্লেখযোগ্য নিতাইযের খেদ-জানানো গানখানি। গানটিতে কবি-প্রেমিকের হৃদযের যে হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে,—তাতে আমাদের মন যেমন ভরে যায, তেমনি প্রেমের বেদনার একটি নতুন দিক আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয। ব্যর্থ প্রেমেই শুধু ট্র্যাজেডি থাকে না, সার্থক প্রেমেও থাকে। নিতাইয়ের প্রেম ব্যর্থ নয়, কারণ সে প্রেমের প্রতিদানে প্রেম পেযেছে। তবুও সে প্রেমের পরিণামে এসেছে ট্র্যাজেডি, কারণ জীবন ছোট, বডই ছোট। কবিযালের এই আক্ষেপের মধ্যে যুগ-যুগান্তবের অসংখ্য প্রেমিকের হৃদয়ের ক্ষোভ ভাষা পেয়েছে,

এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায, জীবন এত ছোট কেনে ?

বনফুলের 'জঙ্গম'

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে একদল শক্তিশালী তরুণ লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের প্রায় সকলেই এখন স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এদের অন্যতম ডক্টর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ওরফে 'বনফুল'। তাঁর সবপ্রধান পরিচয়, তিনি একজন বৈচিত্র্যবিলাসী সাহিত্যিক। গল্প-উপন্যাস-নাটক কবিতা সমস্ত কিছুই তিনি লিখেছেন। অবশ্য তাঁর খ্যাতি প্রধানত কথাসাহিত্যিক হিসাবেই। তার গল্প-উপন্যাসের মধ্যে বিষয়বস্তু ও টেক্‌নিকের বৈচিত্র্য অপরিসীম। অসংখ্য রকমের বিষয়বস্তু ও টেক্‌নিক্ নিয়ে বনফুল পরীক্ষা করেছেন, এখনও করছেন।

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে আধুনিক যুগের অনেক কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে বনফুলের একটা পার্থক্য আছে। ঐ সব কথাসাহিত্যিক নীতি-দুর্নীতি সম্বন্ধে চিরপ্রচলিত আদর্শকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু বনফুল তা করেননি। বনফুল সম্পূর্ণভাবে নীতিবাদী ঔপন্যাসিক। অবশ্য গল্প-উপন্যাসে মানুষের দুর্নীতির বিশদ বর্ণনা দিতে তার কোন আপত্তি নেই। তার অনেক গল্প ও উপন্যাসেই দুর্নীতির উজ্জ্বল আলেখ্য পাওয়া যায়। মানুষের সর্বগ্রাসী লালসার ছবি আঁকতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এমনকি, ব্যভিচারবিহ্বল নরনারীর পঙ্কিল জীবনযাত্রার বর্ণনাও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু বনফুল দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি এতটুকুও সহানুভূতি দেখাননি। তাঁর এই সব ছবি আঁকার উদ্দেশ্য, এইগুলির মধ্য দিয়ে সুস্থ মানুষকে সতর্ক করে ঠিক পথে চালানো। বনফুল চিকিৎসাজীবী, তাই তাঁর অনেক উপন্যাসেরই নায়ক ডাক্তার। শুধু তাই নয়, তার অধিকাংশ উপন্যাস পড়লেই মনে হয় যে উপন্যাসগুলিতে লেখকের ভিষক্-মনোবৃত্তিই সবচেয়ে বেশী সক্রিয়।

বনফুলের উপন্যাসগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে সেইসব উপন্যাস, যেগুলির মধ্যে কাহিনীটি সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কাহিনীর সাবলীল গতির মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বনফুলের এই জাতীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে 'নির্মোক' ও 'কিছুক্ষণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি আরও এক শ্রেণীর

উপন্যাস লিখেছেন, যাদের মধ্যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে একটি বহু যত্নে গঠিত অনন্যসাধারণ আঙ্গিকের মাধ্যমে; এই সব উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেও লেখক অতিসূক্ষ্ম বিচারের নিক্তি এবং ছেনি দিয়ে মেপে জুকে কেটে ছেঁটে পালিশ করে হিসাবমত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজন দিয়েছেন। বনফুলের অধিকাংশ উপন্যাসই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

*

এখন প্রশ্ন এই—'জঙ্গম'-এর স্থান এই দু'টি শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টিতে? এ সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। যাঁরা একে প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী, তাঁরা বলবেন, "এই উপন্যাসের আঙ্গিকের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। স্বাভাবিকভাবে গল্পটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা গতিতে বলে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া উপন্যাসটির ভাষাও সরল ও স্বচ্ছ।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটি শেষোক্ত শ্রেণীরই অন্তর্গত। এই উপন্যাসের আয়তনের অসাধারণ বিশালতা লেখকের সযত্ন প্রচেষ্টার ফল। আমাদের মনে রাখতে হবে, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি তাদের চমকপ্রদ হ্রস্বতার জন্যেই বিখ্যাত। সুতরাং এই অতিদীর্ঘ উপন্যাসটি রচনার জন্যে লেখককে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করতে হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'জঙ্গম'-এর টেক্‌নিক্‌কে আপাতদৃষ্টিতে সরল বলে মনে হলেও তা মোটেই সরল নয়। এই উপন্যাসে লেখক বর্ণনার জালকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত পরিসর জুড়ে ছড়িয়েছেন এবং সময়মত তা গুটিয়ে নিয়েছেন। এইখানেই আর পাঁচটা উপন্যাসের টেক্‌নিকের সঙ্গে 'জঙ্গম'-এর পার্থক্য।

এই উপন্যাসের নাম থেকে প্রমাণিত হয়, লেখক এর মধ্যে জীবনের গতিশীল রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি নায়ক শঙ্করের জীবনকাহিনীকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। শঙ্করের জঙ্গমতার প্রতীক এই উপন্যাসের প্রথম বাক্য "শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ চলিতেছিল" এবং শেষ বাক্য "সে দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল"। উপন্যাসের মধ্যে শুধু শঙ্করের নয়, সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই জঙ্গমত্ব দেখা যায়। সুতরাং এই উপন্যাসের নামকরণ যে সার্থক হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শঙ্কর এই উপন্যাসের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র। সুতরাং উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে তার যোগ থাকা দরকার। কিন্তু উপন্যাসের অনেক

স্থানেই এই যোগ রাখা হয়নি। শঙ্করের চোখের আড়ালে, এমনকি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই উপন্যাসের বহু ঘটনা ঘটেছে। শঙ্করকে এদের মধ্যে কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত দেখতে পাই, কিন্তু কীভাবে সে এগুলি জানল, তার কোন ব্যাখ্যা লেখক দেননি। মুকুজ্যেমশাই যে মুক্তানন্দের গুরু, তা শঙ্করের জানবার কথা নয় এবং অচিনবাবুর 'ম্যানেজারবাবু'কে তার চেনবার কথা নয়; তবু লেখক এই বিষয়গুলি শঙ্করের গোচর করেছেন। মোটের উপর, শঙ্করের কাহিনীর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিভিন্নমুখী খণ্ডকাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করতে তিনি সব জায়গায় সফল হননি।

এই উপন্যাসে লেখক জীবনের বিশালতা ও গতিশীলতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পরিবেশের দিক দিয়ে তিনি খুব বেশী বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস পাননি। শঙ্করের যত কিছু অভিজ্ঞতা তা মাত্র দুটি জায়গায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। একটি কলকাতা, অপরটি তার নিজের দেশ। আরও নানা স্থানের পরিবেশের অবতারণা করলে লেখকের উদ্দেশ্য অধিকতর সার্থকভাবে সাধিত হত বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসে আরও কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বহু জায়গায় আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভন্টুর সঙ্গে 'কালপেঁচা' দার্জিল বিয়ে যখন প্রায় অবশ্যম্ভাবী, তখন কোথা থেকে ভন্টুর অফিসের বড়বাবু আবির্ভূত হয়ে তাকে 'অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা' দান করে ফেললেন, পাঠকও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শঙ্কর বেচারার প্রাণ জীবিকার অভাবে ওষ্ঠাগত, তাই ভাগ্যদেবতা যেন যেচে এসে মাতালের বেশে তাকে চাকরী দিয়ে গেলেন। এই রকম একখানি বাস্তবধর্মী উপন্যাসে এই জাতীয় ঘটনার অবতারণা শোভন হয়নি। বাস্তব জীবনে হয়ত এরকম আকস্মিক ঘটনা কোন কোন সময়ে ঘটে; কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে এমন কোন ঘটনার অবতারণা করা উচিত নয়, যার মধ্যে কার্যকারণপরম্পরা নেই।

তারপর, এই বইয়ের অসংখ্য চরিত্রের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বা পরিচয় যেভাবে দেখানো হয়েছে, তার ভিতরেও অনেক জায়গায় আকস্মিকতা অনুভব না করে পারা যায় না। যেভাবে প্রায়ই এক চরিত্রের সঙ্গে আর এক চরিত্রের সম্পর্ক হঠাৎ বার হয়ে পড়েছে, তাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসের আর একটি ত্রুটি সম্বন্ধে এইবারে আলোচনা করছি। লেখকের আদর্শবাদের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগ এই উপন্যাসের শিল্পধর্মকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে শঙ্করকে লেখা সুরমার চিঠিগুলি থেকে আমাদের মনে ধারণা জন্মায় যে সুরমার বিবাহিতজীবনে একটা বড রকমের ফাঁক আছে; উৎপলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনশ্রুতি সেই ধারণাকে দৃঢ় করে। সুরমার এই ট্র্যাজেডিটিকে লেখক কখন সুপরিস্ফুট করে তুলবেন, আমরা তারই প্রতীক্ষা করতে থাকি। কিন্তু উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় যে সুরমার ব্যাপারটি আগাগোডাই একটি প্রহসন এবং এর পিছনে আছে উৎপলের কৌতুকপ্রীতি। এইভাবে বনফুল এই ক্ষেত্রে শুচিতার অনুরোধে শিল্পকে বলি দিয়েছেন। তা ছাড়া, তিনি এই উপন্যাসে এমন কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যারা বিশুদ্ধ আদর্শবাদের বাহন। মুকুজ্যেমশাই, হরিশবাবু, কুন্তলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র। লেখক এই সমস্ত চরিত্রকে শুধু উপন্যাসে স্থান দেননি, তিনি তাদের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্যও নিবেদন করেছেন। কুণ্ডলার সনাতন হিন্দু আদর্শের প্রতি অন্ধ নিষ্ঠা আমাদের কাছে হাস্যকর লাগে, কিন্তু লেখক তাকে হাস্যকর করে আঁকেননি, বরং তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের গৌরব ও আভিজাত্য ফুটিযে তুলেছেন। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর দরুণ 'জঙ্গম'-এর উৎকর্ষ অনেকখানি খর্ব হয়েছে।

'জঙ্গম' উপন্যাসটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রথম অধ্যায়টিই শ্রেষ্ঠ বলে আমার মনে হয; এর মধ্যে বহু ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনাই অসার্থক হয়নি, অনেকগুলি চরিত্র এতে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু কোন চরিত্রই নিষ্প্রাণ হয়নি। তা ছাড়া এই অধ্যাযটিব মধ্যে একটি তীব্র গতি রয়েছে, যা সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু অন্যান্য অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। উপন্যাসটিতে দ্বিতীয অধ্যায়ের মাঝখান থেকে কাহিনীর গতি শ্লথ হয়ে পডেছে; মূল কাহিনীটি নানা শাখা-কাহিনীর ভিডে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হযে পডেছে, শাখাকাহিনীগুলি অনেক-ক্ষেত্রে মূল কাহিনীর সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ হতে পারেনি, চরিত্রগুলিও প্রাণহীন উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পডেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সজীব গ্রাম্যচিত্রের অবতারণা করে লেখক খানিকটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন;

কিন্তু ঔপন্যাসিকের ব্যর্থতা চিত্রশিল্পী ঢাকতে পারেননি। এই উপন্যাসের সর্বশেষ অংশে যিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি ঔপন্যাসিকও নন, চিত্রশিল্পীও নন, ডাক্তার ; তাই এই অংশ প্রেসক্রপশনে প্রেসক্রপশনে কণ্টকিত। সর্বশেষ পরিচ্ছেদ ক'টিতে লেখক জনসেবকদের উদ্দেশে একটি দীর্ঘ উপদেশ-বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে জনসেবকদের কতটা সুবিধা হবে জানি না, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে মোটেই সুবিধা হয়নি।

*

এখন 'জঙ্গম'-এর চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। নায়ক শঙ্করের কথাই প্রথমে ধরা যাক্। তার মধ্যে লেখক কমনীয়তা এবং দৃঢ়তার, কর্মনিষ্ঠা এবং হৃদয়বত্তার চরম মাত্রার সমন্বয় সাধন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে উপন্যাসে তার প্রথম আবির্ভাব, তার পরে সে ধীরে ধীরে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও আরোহ-অবরোহের মধ্য দিয়ে এমন একটি ঋজু মেরুদণ্ড লাভ করল যে সরল গ্রাম্য জনসাধারণ তাকে 'দেবতা' বলে মনে করতে লাগল আর 'ভদ্র-লোক'-সমাজের কাছে সে খাটি মানুষ বলে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা লাভ করল। পূর্বোক্ত ঘাত-প্রতিঘাত ও আরোহ-অবরোহগুলি মোটেই সাধারণ স্তরের নয়। জীবনে প্রণয়িনীর পর প্রণয়িনীর আবির্ভাব, মিষ্টিদিদির পাল্লায় পড়ে পদ-স্খলন, সুরাসক্তি, গণিকাসঙ্গ, সাহিত্যিক-জীবনের নানা দুর্নীতি, কর্মজীবনের রাশি রাশি প্রলোভন, 'ম্যানেজারবাবু'র কি একটা দুর্নীতিকর প্রেরণা,—যেসমস্ত বিষয় আর পাঁচজনকে নরকের অন্ধকারে টেনে নামাত, তাদের মধ্য দিয়ে চলেও শঙ্কর শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বার হয়ে এল। কিন্তু আসতে সে পারল গ্রন্থকার আগাগোড়া তার হাতটি ধরে রেখেছিলেন বলেই। যে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের চরিত্র জীবন্ত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, শঙ্করের চরিত্রে তার বিশেষ কোন নিদর্শন মেলে না। চরিত্রটির মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও প্রাণস্পন্দনের একান্ত অভাব। উপন্যাসটি আদ্যন্ত পড়লে মনে হয় যে শঙ্করের উপরে জোর করে মহত্ত্ব ও অসাধারণতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভন্টু চরিত্রটি একসময়ে পাঠকসমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার ব্যবহৃত "মৌলিক" শব্দগুলি ('লদ্‌কালদ্‌কি', 'বিড়্‌ডিকার' প্রভৃতি) সে

সময়ে সকলের মুখে মুখে ফিরত। এই চরিত্রটি একদিকে যেমন অত্যন্ত সবল, অপরদিকে তেমনি নিরতিশয় সরল। তার জন্যে চরিত্রটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। কিন্তু এত বিচিত্র একটি চরিত্রের সজীবতা এরকম একটি বৃহৎ উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখা বেশ দুরূহ ব্যাপার। বনফুল এই কঠিন কার্যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। উপন্যাসের শেষ অংশে ভন্টুর চরিত্র একঘেয়ে হয়ে পড়েছে; এই অংশে তার রসিকতাগুলিও বিরক্তিকর বলে মনে হয়; দার্জিলিং (একটি মেয়ের নাম)-কে "Summer Capital of Bengal" বলা, চিংড়ী মাছ কিনতে যাওয়াকে "লবষ্টারিং" বলা এই জাতীয় রসিকতার দৃষ্টান্ত। তার সর্বশেষ পরিণতি এতই অপ্রত্যাশিত যে, আমাদের মন তাকে মেনে নিতে পারে না। এই শেষ পরিণতি দেখে মনে হয় যে, এই চরিত্রটি যেন নানা কসরৎ দেখাবার জন্যই উপন্যাসের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল, তাই বিদায় নেবার সময় সে একটি প্রকাণ্ড ডিগ্‌বাজী দিয়ে গেল।

এই উপন্যাসে ভন্টুর বৌদিদির চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে নিছক মাধুর্য সঞ্চারের জন্য। অবশ্য এরকম স্মিতাননা মাধুর্যময়ী বৌদিদির চরিত্র এর আগেও বাংলা কথাসাহিত্যে দেখা গিয়েছে। এই উপন্যাসের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র বেলা মল্লিক। উপন্যাসে তার প্রথম আবির্ভাবের সময় তাকে পুরুষ-শিকারিণী ফ্লার্ট মেয়ে বলে মনে হয়, কিন্তু ক্রমশ তার পুরুষবিমুখ মনের পরিচয় পেয়ে সে ভুল ভাঙতে দেরী হয় না। উপন্যাসের শেষ দিকে দেখি সে বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। শঙ্করের সঙ্গে বেলা মল্লিকের সম্পর্ক নিষ্কাম শুভ্র বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বেলা মল্লিকের চরিত্র যে বেশ অস্বাভাবিক হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পত্নীপ্রেমিক মৃন্ময়ের চরিত্রটি অস্বাভাবিক হলেও অভিনবত্বের জন্য কতকটা আকর্ষণীয় হয়েছে। উৎপলের চরিত্রও মন্দ হয়নি। তার সঙ্গে বনফুলের 'মৃগয়া' উপন্যাসের বড়বাবু এবং 'দ্বৈরথ' উপন্যাসের চন্দ্রকান্তের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এই উপন্যাসের আর একটি অদ্ভুত চরিত্র জ্যোতিষী করালীচরণ বক্সী। ক্ষীণ আলোয় হতশ্রী পরিবেশে বাস, সৃষ্টিছাড়া বন্ধু ও বান্ধবীর (মোস্তাক ও পানউলী) সঙ্গ, সুরার নেশা, অলৌকিক শাস্ত্রগ্রন্থের চর্চা এবং নির্ভুল জ্যোতিষ-জ্ঞান এই সবের মধ্য দিয়ে চরিত্রটি রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই

অ-সাংসারিক মানুষটিকে লেখক কেন একটি বৈষয়িক কর্মের (শঙ্করের বাবার উইল অনুসারে তাঁর সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা) ভার দিয়ে বসলেন, তা বোঝা যায় না। আশ্চর্যের বিষয়, করালীচরণ শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুই করেননি। যাহোক, করালীচরণের চরিত্রটি অসাধারণত্ব সত্ত্বেও সৃষ্টি হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি।

মকুজ্যেমশাই-এর চরিত্রে আদর্শবাদের প্রাধান্য সম্বন্ধে আগেই মন্তব্য করা হয়েছে। চরিত্রটিতে বাস্তবতার মর্যাদা মোটেই রক্ষা করা হয়নি। তিনি শুধু মহাপুরুষ নন, সেই সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; যার জন্য নরহন্তা পাগল লাঠি হাতে ছুটে আসার পর তাঁকে দেখে প্রণাম করে চলে যায়।।

এই ক'টি মুখ্য চরিত্র ভিন্ন আরও অনেকগুলি চরিত্র এই উপন্যাসে আছে। এই সব চরিত্রের মধ্যে মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, মক্কো, ওরিজিনাল, প্রোটোটাইপ, বাকু, মুক্তানন্দ, অচিনবাবু, যতীন হাজরা, হাসি, চুনচুন্, লোকনাথ ঘোষাল, নিপুদা, সুরমা, কুন্তলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সবগুলি চরিত্র যে স্বাভাবিক হয়েছে, তা নয়। তেমনি, সবগুলি চরিত্রের অবতারণা যে প্রাসঙ্গিক হয়েছে, সে কথাও বলা চলে না। তবে একখানি মাত্র উপন্যাসে এতগুলি চরিত্রকে পরিস্ফুট করে তোলার মধ্যে যে লেখকের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে, তা অস্বীকার করা চলে না।

*

'জঙ্গম' উপন্যাসখানির পর্যালোচনা করলে এই কথাই মনে হয় যে এই উপন্যাসের মধ্যে লেখকের সচেতন বৈচিত্র্যসৃষ্টি-প্রচেষ্টার নিদর্শন যতটা আছে, সৃষ্টিকুশলতার নিদর্শন ততটা নেই। এরকম বিরাট উপন্যাস রচনা বনফুলের প্রতিভার অনুকূল ক্ষেত্র নয় বলেই আমাদের ধারণা। ছোট গল্প রচনাতেই বনফুল সত্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'পাঠকের মৃত্যু', যুগল স্বপ্ন', 'দর্জি' প্রভৃতি ছোট গল্পগুলি সর্বদেশের ও সর্বকালের সাহিত্যের আসরে স্থানলাভের যোগ্য। বিরাট উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে সে কথা তো বলা যাবেই না, তাদের স্থায়ী মূল্য আদৌ আছে কিনা, সে সম্বন্ধেই আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পারি না।

বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা ঃ 'বাসুদেবচরিত'

যিনি বাংলা গদ্যকে "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা"র প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাকে একদিকে শিল্পসমৃদ্ধ, অপরদিকে সবজনব্যবহার্য করে তুলেছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখক জীবন সুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, যে কলেজের আদি পর্বের কর্মীদের রচনার মধ্য দিয়ে সার্থক বাংলা গদ্যের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। এই যোগাযোগ সত্যিই আশ্চর্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদ লাভের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের সূচনা হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পদ লাভ করেন। ঐ কলেজের পূর্ববর্তী শিক্ষকদের মত তিনিও কলেজের ইংরেজ ছাত্রদের জন্য বাংলা বই লেখেন। যতদূর জানা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য তিনি কলেজ-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে দুটি বাংলা বই লিখেছিলেন। এদের মধ্যে একটি 'বাসুদেবচরিত', অপরটি 'বেতালপঞ্চবিংশতি'।

এদের ভিতরে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের নাম সর্বজনপরিচিত এবং বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী গ্রন্থগুলির মধ্যে এ বইটি অন্যতম। কিন্তু 'বাসুদেবচরিত' কোন দিনই প্রকাশিত হয়নি। এর পাণ্ডুলিপিও এখন আর পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে এই বইটির কথা জানা যায়

কিন্তু 'বাসুদেবচরিত'-এর সমস্ত চিহ্নই একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, এরকম ধারণা করাও ভুল। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের (১৮৯১) কয়েক বছর পরে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকারের লেখা দুটি বিদ্যাসাগর-জীবনী প্রকাশিত হয়।* এই দুটি জীবনী যখন রচিত হয়, তখনও বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে 'বাসুদেবচরিত'-এর পাণ্ডুলিপি ছিল। এই দু'জন জীবনী-রচয়িতা ঐ পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন এবং তার থেকে কিছু কিছু

* বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই দু'জন লেখকেরই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল

অংশ তাঁদের বইয়ে উদ্ধৃতও করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই অংশগুলি পুনরুদ্ধৃত করে এদের দিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিহারীলাল সরকার 'বাসুদেবচরিত'-এর এই অংশটি উদ্ধৃত করেছেন,

"এক দিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিযাছ, কোনও বিষযের অনুসন্ধান কর না ; এই যাবৎ গোপ ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন ; অতএব মহারাজ ! অতঃপর সাবধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলিযা দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন। কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বসুদেব-দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড় বন্ধনে রাখিল। অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিল এবং প্রলম্ব, বক, চাণুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত সৈন্যগণের সহিত পরামর্শ করিযা যদুবংশীয়দের উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাঁহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শাল্ব, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ আদি নানাদেশে প্রচ্ছন্ন বেশে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতানুযায়ী হইযা মথুরাতে অবস্থান করিলেন।

"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল বাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল, প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকরগীতে ও কোকিলকলকলে আমোদিত হইল এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বগণ গীতিস্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিতমনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।"

(বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬১-১৬২)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাসুদেবচরিত' থেকে এই দুটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন,

(১) "এক দিবস কৃষ্ণ বলরাম ও অন্য অন্য গোপবালকেরা একত্র মিলিয়া খেলা করিতেছিলেন ইতি মধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকটে গিয়া কহিল ওগো কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে আমবা বারণ করিলাম শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা অস্তব্যস্তে আসিযা কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জ্জন করিযা কহিলেন রে দুষ্ট, তুই মাটী খাইয়াছিস রহ আজ আমি তোকে মাটী খাওয়া ভাল কবিয়া শিখাইতেছি।"

(২) "এই রূপে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে দেবরাজের পূজা পরিত্যাগ করিযা বৃন্দাবনবাসীবা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অর্চ্চনার বিধি সংস্থাপন করিলেন এবং মূর্ত্তিমান দেব দর্শন করিযা পরস্পর কহিতে লাগিলেন দেখ ভাই আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রের পূজা করিযাছিলাম কখন দর্শন পাই নাই কিন্তু অদ্য একবার মাত্র অর্চ্চনা করিয়া গিরিদেবের দর্শন পাইলাম অতএব এতদিন আমরা এমন প্রত্যক্ষ দেবতাব উপেক্ষা করিযা বৃথা কালক্ষেপ কবিযাছি আজ কৃষ্ণ হইতে আমাদের ভ্রম নিবারণ হইল। কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদেব পিতামহ। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিযা কৃষ্ণ গুণগান কবিতে লাগিলেন এবং নৃত্যগীতাবসানে পুনবায পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।

ত্যজিযা ইন্দ্রের পূজা পর্ব্বতে পূজিল।
শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল॥"

(বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৩-১৬৪)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাযের উদ্ধৃত অংশে আমরা দু' ছত্র কবিতা দেখতে পাচ্ছি। এর থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগব 'বাসুদেবচবিত'-এর অধিকাংশ গদ্যে রচনা কবলেও মাঝে মাঝে পদ্যেব আশ্রয় নিযেছিলেন।

'বাসুদেবচরিত' বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা হলেও এর ভাষা আশ্চর্য রকমের সুন্দব। বিহারীলাল ও চণ্ডীচরণ যে অংশগুলি উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলির স্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণ আমাদের মুগ্ধ করে। এদের মধ্যে দুর্বোধ্য আভিধানিক শব্দ বা শ্রুতিকটু ধরনেব সমাসবদ্ধ পদ, ব্যবহারের যেমন নিদর্শন মেলে না, তেমনি "পণ্ডিতী" রীতি অনুযাযী বাক্যবিন্যাসেরও উদাহরণ

পাওয়া যায় না। এই অংশগুলির মধ্যে জড়তা বা আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। যে অপূর্ব ছন্দঃস্পন্দ বিদ্যাসাগরের গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তারও পরিপূর্ণ নিদর্শন আমরা বিহারীলাল ও চণ্ডীচরণের উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যেই পাই। এই বইখানি প্রকাশিত না হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের খুবই ক্ষতি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিহারীলাল সরকার সমগ্র 'বাসুদেবচরিত' গ্রন্থ পড়ে তার যে সমালোচনা করেছেন, তার থেকে এই বইটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

"'বাসুদেব-চরিত' শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত। 'বাসুদেব-চরিতে' শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত, কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষান্তরিত। ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক, লিপি-মাধুর্য্যে ও ভাষা-সৌন্দর্য্যে মূল সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের সমীপবর্ত্তী।

"'বাসুদেব-চরিত' বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের আদর্শস্থল। হিন্দু সন্তানের ইহা প্রকৃত পাঠ্য। ·

"'বাসুদেব-চরিতে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ লীলা প্রকটিত; পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ভগবদ্ভাবির্ভাবের পূর্ণ প্রকটন। বস্তুতঃ ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গ্রন্থ হইলেও অনুবাদের গুণে, ভাষার লালিত্য-মাধুর্য্যে, বর্ণনার বিকাশ-চাতুর্য্যে এবং ভাব সম্ভারের যথাযথ বিন্যাসে অতি আদরণীয়। ইহার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত এমন সুন্দর বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ আর ছিল না। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠার্থীদের জন্য বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন পাঠ্যই এমন সুপাঠ্য হয় নাই; ...কেবল 'ফোর্ট উইলিয়ম' কলেজের পাঠ্য কেন, যে সময় 'বাসুদেব-চরিত' রচিত হয়, সেই সময় এবং তাহার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানি ভাষা-পরিপাটিতে, বাসুদেব-চরিতের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না।...

"...'বাসুদেব-চরিতে' সংস্কৃত প্রণালীমতে দীর্ঘ সমাসযুক্ত শব্দপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই শব্দ বা বাক্য এমনই যথাভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা কোনরূপে শ্রুতিকটু হয় নাই; বরং তাহা মধুর

মৃদঙ্গনিনাদবৎ পাঠক ও শ্রোতার কর্ণমূলে এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অপূর্ব্ব সুখ-সঞ্চার করিয়া থাকে। লিপিপদ্ধতি একরূপ হইলেও বিষয়ের লঘুতা ও গুরুতা অনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলীতে ভাষা-প্রয়োগের সারল্য ও গাম্ভীর্য্যের তারতম্য বহুপ্রকারে দেখিতে পাইবে। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত শক্তি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় ব্যর্থ বাক্যপ্রয়োগ অতীব বিরল। তিনি যেখানে যে বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছেন, মনে হয়, তাহা তুলিয়া লইয়া তৎসমসংজ্ঞক অন্য বাক্য প্রয়োগ করা দুরূহ। এ শক্তির পরিচয় প্রথম হইতেই তাঁহার 'বাসুদেব চরিতে'।·

"অনুবাদ হউক, 'বাসুদেব-চরিতে' উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আছে। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কিরূপে অবিকল সুন্দর অনুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পথ দেখাইলেন। তবে 'বাসুদেব চরিতে'র অনুবাদের ভাষা ও লিপিভঙ্গী অপেক্ষা তাঁহার পরবর্ত্তী অনুবাদ ও পবন্ধাদির লিপিভঙ্গী যে অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।...

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদিনী আদ্যন্ত লীলা-কথা সম্বন্ধে এক হিন্দী প্রেমসাগর ভিন্ন বাঙ্গালায় এমন সুললিত গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই।"

(বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৯-১৮০ দ্রষ্টব্য।)

'বাসুদেবচরিত' কেন প্রকাশিত হয়নি, সে সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার লিখেছেন,

" 'বাসুদেব চরিত' ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। যে 'বাসুদেব-চরিতে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত, তাহা খৃষ্টান সাহেব সিবিলিয়ন কর্ত্তৃক যে অননুমোদিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?" এইভাবে "খৃষ্টান সাহেব সিবলিয়ন'-দের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা সাহিত্যকে একটি অমূল্য গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত করল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এরা বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'কেও প্রথমে পাঠ্য হিসাবে অনুমোদন করেননি। এ সম্বন্ধে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, " উক্ত গ্রন্থ রচনার পর উহা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে পাঠ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে প্রথম মন্তব্য প্রকাশের ভার পরলোকগত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার নিকট

উক্ত গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় তিনি আপত্তি করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শ্রীরামপুরের পাদ্‌রী সাহেব মহাশয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাদ্‌রী মার্স‌ম্যান সাহেব সে সময়ে প্রচলিত সমস্ত গদ্য গ্রন্থের মধ্যে উক্ত নবপ্রকাশিত বেতালপঞ্চবিংশতিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া এক প্রশংসা পত্র দিলেন।" এই প্রশংসাপত্রের জোরেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য হয়। বিদেশী পাদ্রী মার্স‌ম্যান এই বইয়ের মূল্য বুঝেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বদেশী পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তা বোঝেননি। কেন বোঝেননি, তা বলা শক্ত। বিদ্যাসাগর এই বইটিতে কৃষ্ণমোহনের চেয়ে বহুগুণে ভাল বাংলা লিখেছিলেন, এই কি তাঁর অপরাধ? 'বাসুদেবচরিত' যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি, এর পিছনেও খ্রীষ্টভক্ত কৃষ্ণমোহনের হাত থাকা অসম্ভব নয়।

'বাসুদেবচরিত' বিদ্যাসাগরের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পরে এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশের আগে অর্থাৎ ১৮৪১ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।

সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন 'বাসুদেবচরিত' সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মত প্রচার করেছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে (চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ২২) তিনি লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর প্রথমে 'বাসুদেবচরিত' বলিয়া একটি বই লিখিয়াছিলেন, এ কথা তাহার চরিতকারেরা বলিয়াছেন। এই উক্তিই একমাত্র প্রমাণ। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে পাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেটি কলেজের এক সিভিলিয়ান ছাত্র হেনরি সারজ্যাণ্টের লেখা, 'বাসুদেবচরিত'-জাতীয় কৃষ্ণলীলা বই। আমার মনে হয় এই রচনাটি লিখিবার সময়ে বিদ্যাসাগর—তখন তিনি বোধ করি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন—সারজ্যাণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই হইতেই বোধ হয় 'বাসুদেবচরিত' কিংবদন্তীর উৎপত্তি।"

ডঃ সুকুমার সেন একেবারে মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন, বিদ্যাসাগর রচিত 'বাসুদেবচরিতে'র অস্তিত্বেই তিনি অবিশ্বাস করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিদ্যাসাগর-জীবনী দু'টি পড়ে দেখেননি। ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে একটি সর্বজনবিদিত সত্যকে মিথ্যা বলে প্রচার করে ডঃ সুকুমার সেন যে কাণ্ড করেছেন, তার তুলনা

বিরল। হেন্‌রি সারজ্যাণ্টের "কৃষ্ণলীলা বই" এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'বাসুদেবচরিতে'র কোন সম্পর্কই নেই। আমরা এসিযাটিক সোসাইটিতে গিযে হেন্‌রি সারজ্যাণ্টের এই বইযেব পাণ্ডুলিপি* (এসিযাটিক সোসাইটির A. 41 নং পুঁথি) দেখেছি এবং বিহারীলাল সরকাব ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায কতৃক উদ্ধৃত 'বাসুদেবচবিতে'র অংশগুলিকে তার সঙ্গে মিলিযেছি। বিহারীলাল সরকাব 'বাসুদেবচরিতে'র যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বর্ণনা (পৃঃ ১৭৯ দ্রঃ)। হেন্‌রি সারজ্যাণ্টের বইতেও শ্রীকৃষ্ণেব জন্মেব বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনার ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। হেন্‌রি সাবজ্যাণ্টের বর্ণনাটি আমরা তাঁর পাণ্ডুলিপি (পৃঃ 5-7) থেকে নীচে উদ্ধৃত করলাম,

"সেই সময নারদ মুনি রাজসন্নিধানে আসিযা কহিলেন হে রাজন্ এখন তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত তুমি কিনিমিত্তে নিদ্রা যাইতেছ আপনি সম্প্রতি যে বালককে ত্যাগ করিলেন বুঝি ইনি তোমার হন্তা হইতে পারেন তখন মুনি এতত্ কথনানন্তর তথা হইতে গমন করিলেন অনন্তর নির্দয কংস পুনর্ব্বার সেই কুমারকে আনযন করিযা এবং আপন পিতামাতাব নিষেধ না শুনিযা অতি শীঘ্র বধ করিলেক। পরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইযা আপন পিতাকে বন্ধন করিলেন তদুত্তর লৌহনির্ম্মিত সপ্তদ্বারযুক্ত কারাগারের মধ্যে বসুদেব ও দেবকীকে দৃঢতর বদ্ধ করিযা রাখিলেন এবং কিযদ্দিনে ক্রমে ২ দেবকীব ছয সন্তান নষ্ট করিলেন॥—

"যখন দেবকী সপ্তম গর্ভ ধারণ করিলেন তখন এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিলেন এই আমার অগ্নি দেবকীর গর্ভ হইতে লইযা গোকুলে যাইযা রোহিণীর উদরে সংস্থাপন করহ এই হেতুক কংসের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবেক যখন সেই ভাগবতাগ্নি তৃতীয রাম কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবকী গর্ভ হইতে রোহিণী

---

* এই পাণ্ডুলিপিটিতে একটি নামপত্র ও ৬৫টি পৃষ্ঠা আছে, পৃষ্ঠাগুলির আযতন ১১ ২ '×৭' । বইটিব নামপত্রটি নীচে উদ্ধৃত হল।

'শীমদ্ভাগবত।—
শীশীনারাযণের অষ্টমাবতাব
শ্রীশীকৃষ্ণ তাঁহাব জন্ম ও বাল্যলীলা
এবং কংসবধেব উপাখ্যান। —
ভাষা সংগ্রহঃ।—
হেনেবি সাবজ্যাণ্ট্ শাহেবেন ক্রিতে॥— '

গর্ত্তে সংস্থিত হইলেন তখন দেবকী এইজ্ঞান করিয়া কহিলেন যে আমার গর্ত্তপাত হইল এই হেতু নগরস্থ লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিলেন। চিরদিবসান্তে দেবকী পুনশ্চ গর্ত্তবতী হইলেন তাহাতে ঈশ্বরের অত্যন্তাবির্ভাবদ্বারা তেজস্পুঞ্জা এবং উজ্জ্বল শরীরা হইলেন সেই উজ্জ্বলতাতে বসুদেবের মুখ অতিশয় উজ্জ্বল হইল কিয়দ্দিনের মধ্যে ব্রহ্মা ও সদাশিব পারিষদ দেবগণের সহিত সেস্থানে আগমন করিলেন এবং বসুদেব ও দেবকীর গুণের প্রশংসা গীত দ্বারা বিস্তারিত করিয়া কহিলেন যখন এই সতী হইতে সন্তান উৎপন্ন হইবেন তখন সর্ব্ব প্রাণীর আহ্লাদের সীমা থাকিবেক না। পরে দেবকীর গর্ত্তলক্ষণ প্রকাস হইলে নগরবাসী লোকেরা শুভ সম্বাদ অবগত হইলেন। কংস এই কথা শ্রবণ করিলেন যে ভগিনী ও ভগিনীপতির শরীরের অপূর্ব্ব দীপ্তি হইয়াছে ইহাতে আপন অন্তঃকরণে এই অবধারিত করিলেন যে এই সন্তান আমার সংহারকর্ত্তা হইবেন। অনন্তর মন্ত্রী ও পণ্ডিতবর্গের সহিত একত্র হইয়া বিবেচনা করিলেন দেবকীকে বধ করা কর্ত্তব্য পশ্চাত এই নিশ্চয় করিলেন যে গর্ব্বিণী স্ত্রী হত্যাকরণ অত্যন্ত অনুপযুক্ত হয় তদনন্তর অবধারিত করিলেন যখন ঐ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবেন ততক্ষণে আমি তাঁহাকে শাস্ত্র ছেদন করিব কিন্তু সেই মথুরাপতি দুরাত্মা সর্ব্বদা অন্তঃকরণে ভীত থাকিলেন যে এই অষ্টম পুত্র আমার হন্তা হইবেন এবং তাহার অপরাধের দণ্ডকর্ত্তা সদা সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতেই সমস্ত বুঝিলেন।—

"অনেক দিবস পরে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথীতে বুধবারে অর্দ্ধরাত্রিতে যখন পৃথিবী অনেক দুরাচার ও অধর্ম্মদ্বারা অনাথার ন্যায় হইলেন তখন স্বর্গ হইতে ঈশ্বরীয়াষ্টহস্তপ্রকাশিত আশ্চর্য্য সন্তান উৎপন্ন হইলেন যে সময় বসুদেব সেই বালককে সন্দর্শন করিয়া দিব্য চক্ষু পাইলেন তখন বুঝিলেন যে ইনি নিশ্চয় ঈশ্বর বটেন দেবকীরও তদ্রূপ জ্ঞান হইল দুইজনে অনেক প্রার্থনা করিলেন পরে নমস্কারানন্তর জগদীশ্বর পুনশ্চ বসুদেব ও দেবকীকে মায়াবৃত করিলেন তাহাতে তাঁহারা পুনশ্চ জ্ঞান করিলেন যে ইনি আমারদিগের পুত্র।—"

এর সঙ্গে ইতিপূর্বে-উদ্ধৃত 'বাসুদেবচরিতে'র সংশ্লিষ্ট অংশটির তুলনা করলে যে কোন পাঠক বুঝতে পারবেন, ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত কত অসার।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাসুদেবচরিতে'র যে অংশ দু'টি উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি হেনরি সার্জ্যান্টের বইতে পাওয়া যায় না। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসুদেব চরিতের হস্তলিখিত পুঁথি"র কোন কোন

পৃষ্ঠা থেকে এই অংশ দু'টি উদ্ধৃত করেছিলেন, তার নিদর্শনী দিয়েছেন। প্রথম অংশটি ("এক দিবস কৃষ্ণ বলরাম · মাটী খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।") ঐ পুঁথির ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে এবং দ্বিতীয় অংশটি ("এইরূপে কৃষ্ণের···শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল॥") তার ৬৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করেছেন বলে চণ্ডীচরণ জানিয়েছেন (বিদ্যাসাগব, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪)। হেনরি সারজ্যান্টের "কৃষ্ণলীলা বই"-এর পাণ্ডুলিপির ৩৩ ও ৬৪ পৃষ্ঠায় (অথবা অন্য কোথাও) এই দু'টি অংশেব নামগন্ধও পাওযা যায না।

ডঃ সুকুমার সেন শুধু বিদ্যাসাগর-রচিত 'বাসুদেবচরিতে'র অস্তিত্বেই অবিশ্বাস করেননি, তিনি বিদ্যাসাগরের চরিতকারদের আপ্তবাক্য-বিলাসী বলেছেন। তাঁরা একটা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে বিদ্যাসাগরকে 'বাসুদেবচরিতে'র রচযিতা বানিযেছেন, এই ডঃ সেনের অভিমত। কিন্তু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায ও বিহারীলাল সরকারের মত প্রামাণিক বিদ্যাসাগর-জীবনীকাররা কিংবদন্তী বা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন কিছু লেখার পাত্র ছিলেন না, পরিশ্রম সহকারে তথ্য-প্রমাণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ না করে কল্পনার সাহায্যে "সুকুমার গবেষণা"* করার পদ্ধতি তাঁবা জানতেন না। তাঁরা

* ডঃ সুকুমার সেনের "আকাশকুসুম" গবেষণার আরও দু'টি দৃষ্টান্ত আমরা দিচ্ছি। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-দ্বিতীয খণ্ড চতুর্থ সংস্করণে (পৃঃ ১৯২-১৯৪) তিনি লিখেছেন যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র রচযিতা কালীপ্রসন্ন সিংহ নন, তাঁব মতে এটি ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যাযের রচনা। তাঁর মতের স্বপক্ষে তিনি এইসব "প্রমাণ" দিযেছেন; (১) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র উৎসর্গপত্রে বইটিকে হুতোম প্যাঁচার "প্রথম রচনাকুসুম" বলা হযেছে, কিন্তু এই বইটি প্রকাশের আগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ "স্ব নামে কযেকখানি নাটক বাহির করিযাছিলেন।" (২) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' "শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুক চাঁদ শর্ম্মা"কে উৎসর্গীকৃত। ডঃ সুকুমার সেন বলেন "মুলুকের প্রতিশব্দ ভুবন, সুতরাং মুলুকচাঁদ=ভুবনচন্দ্র।" (৩) পরবর্তীকালে প্রকাশিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যাযের 'হরিদাসের গুপ্তকথা'ব সঙ্গে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচনারীতির দিক দিযে ঘনিষ্ঠ মিল আছে এবং এই বইটিব লেখক নিজেকে হুতোমের মতই "আশমান"-নিবাসী বলেছেন।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—(১) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রকাশের আগে কালীপ্রসন্ন নিজের নামে কযেকটি নাটক বার করেছিলেন, কিন্তু "হুতোম" হিসাবে এইটিই তাঁর প্রথম রচনা; সুতরাং এই বইটি কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা হযেও হুতোমের "প্রথম রচনাকুসুম" আখ্যায় সার্থকভাবে অভিহিত হতে পারে। (২) মুলুকচাঁদ শর্মা ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যাযের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে ডঃ সেনের অভিমত যদি সত্য (সত্য বলে মনে করার অবশ্য কোন কারণ নেই) হয়, তাহলে ভুবনচন্দ্র 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র

শুধু বিদ্যাসাগরের 'বাসুদেবচরিত' রচনা করার কথা বলেননি। 'বাসুদেবচরিতে'র অংশ উদ্ধৃত করে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে অকাট্য দলিলও তাঁরা পেশ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনের এই অমূলক অভিমত বিচারের কোন প্রয়োজন আমাদের হত না, যদি তাঁর বইখানি ছাত্রদের পাঠ্য না হত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর এই জাতীয় থিসিসগুলি নিরীহ ছাত্ররা বছরের পর বছর ধরে পড়তে বাধ্য হচ্ছে এবং এই জাতীয় বিষ গলাধঃকরণ করার ফলে তাদের মনে বহু ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

রচয়িতা হতে পারেন না, কারণ বইটি তাঁরই "শ্রীচরণে" উৎসর্গ করা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন এখানে "একই ব্যক্তি বেনামিতে দাতা ও গৃহীতা হইয়াছেন।" কল্পনার দৌড় যে এতদূর হতে পারে, তা আগে আমাদের জানা ছিল না। (৩) হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র মিল আছে, এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে ভুবনচন্দ্র হুতোমকে অনুকরণ করেছেন, এর জন্য তাঁকে হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা বলবার কোন হেতু নেই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের Calcutta Review এ প্রকাশিত Bengali Literature প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে (পৃঃ ৫২৮) এবং কালীপ্রসন্নের সমবয়স্ক বন্ধু ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম পর্যায়ে' (পৃঃ ৮৯-৯০) বলেছেন যে কালীপ্রসন্ন সিংহই 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র লেখক। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপনি দেখ' নামে একটি বই লিখে তাতে কালীপ্রসন্ন সিংহকে আক্রমণ করেন এবং কালীপ্রসন্নের কাছেই 'আপনার মুখ আপনি দেখ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য চান। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র দ্বিতীয় সংস্করণের 'গৌরচন্দ্রিকা'য় এই চিঠিটি ছাপা হয়েছে এবং বলা হয়েছে "ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁর সাহায্য করে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন"। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভূমিকাতেই হুতোম ও কালীপ্রসন্ন সিংহকে অভিন্ন বলা হয়েছে। এই সমস্ত অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ডঃ সুকুমার সেনের কল্পনাকে আমরা গ্রাহ্য করতে পারি না। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' যে কালীপ্রসন্ন সিংহেরই রচনা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তারপর, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে আলোচনার সময় ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "কমলাকান্তের দপ্তরে পূর্ণচন্দ্রের রচনা আছে।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৩৭) অথচ এ কথার সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ দেননি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'কমলাকান্ত'র 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন যে ঐ বইয়ের অন্তর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দু'টি রচনা বাদে আর সব রচনাই তাঁর নিজের লেখা। ডঃ সুকুমার সেনের কথা সত্য হলে বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যাবাদী ও চোর প্রতিপন্ন হন। আসলে ডঃ সুকুমার সেনের কথাই সর্বৈব মিথ্যা; 'কমলাকান্তের দপ্তরে' পূর্ণচন্দ্রের কোন রচনা নেই।